মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী

আইয়ুব হোসেন
চারু হক



ভূমিকা

ষড়ঋতুর এই দেশে অতুল আবহাওয়া-বৈচিত্র্য মানুষকে উদ্বেলিত করে। জল-মাটি-হাওয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করে। নবপ্রাণের সঞ্চার করে মানুষকে নতুন কর্মউদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে। পাহাড়, অরণ্য, নদী, উপত্যকার বেষ্টনে এই দেশে বিভিন্ন জাতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্তমান। অঞ্চলভেদে বাস করেন ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তা। তাদের রয়েছে আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আদিবাসী, উপজাতি বা পাহাড়ি বলে পরিচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলো যেমনি সহজ-সরল তেমনি নির্লোভ। প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বসবাস করে বলে প্রকৃতির মতো উদার চরিত্র। ব্যক্তিক মনোভাবের চেয়ে সামষ্টিক মনোভাবটাই প্রধান ওদের। ভূমি, পাহাড়, অরণ্যে ব্যক্তিমালিকানা বলে আগে কিছু ছিল না। এসব ছিল সমষ্টিগত সম্পদ। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকে আদিবাসী বা উপজাতীয় এলাকায় জুম চাষ ও জুম কৃষক ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। উৎসবে দলবদ্ধ হয়ে হাতে হাত বেঁধে তারা নাচে। তারপর একত্রে চোয়ানী বা পচানী পান করে সমবেতভাবে উল্লাস করে।

সংস্কৃতি ও অবস্থান দেশের মূলস্রোত থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হলেও জাতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলি থেকে কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন বরাবরই । সব জাগরণেও আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছে। ইতিবাচক অবদান সংযোজিত করেছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তারা পথ প্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করেছে।

গেল দশকের গোড়ার দিকে সংঘটিত রংপুর-দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন, নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের হাজং বা টংক-বিরোধী আন্দোলন এবং চাকমা বিদ্রোহ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কেবল তাই নয়, ব্রিটিশ শাসনামলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও সূচনা করেছিল আদিবাসী সম্প্রদায়। অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা বাংলা ভূখণ্ডসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ করে। শুরুতে এর চরিত্র ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক হলেও ক্রমান্বয়ে তা ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। আদিবাসী এ সকল বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন-বিরসা (মুণ্ডা), ভগিরথ (সাঁওতাল), যাত্রা (ওঁরাও), জাদোনাং ও গাইদেলু (নাগা), রাজমোহিনী দেবী ও নারায়ন সিং (গোঁদ)। সম্প্রদায় কেন্দ্রিক দাবি-দাওয়ার মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে ইংরেজ খেদাও ও স্বরাজ-এর শ্লোগানে তৎকালীন আদিবাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

বাঙালি জাতির সবচে' বড়ো অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছিল উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামে তারা শামিল হয়েছেন, সর্বস্ব খুইয়ে। আদিবাসী যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন অথবা দেশত্যাগ করেছিলেন তাদের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ লুট অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে ভিটে-মাটি ব্যতিরেকে আর কিছু পাননি। পরে আরো পরেও তারা পাননি

কিছুই। কোনো সরকারই তাদের খোঁজখবর নেয়নি। তাদের অবদান এখনো অবধি স্বীকৃত হয়নি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের তালিকায়ও তাদের বেশিরভাগ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। এ যাবত আদিবাসী বা উপজাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টিই বিস্ময়করভাবে অনালোকিত, অনালোচিত।

বর্তমান গ্রন্থে আদিবাসী যোদ্ধাদের ও তাদের তৎপরতার কিছু বিবরণ উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। প্রধানত বারোটি সম্প্রদায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণনা এখানে সংযোজিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- সাঁওতাল, গারো, মনিপুরি, মাহালী, রাজবংশী, মাহাতো, রাখাইন, চাকমা, মারমা ও মং। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তবে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি বলে এখানে তার বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক এক হিসেবে জানা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আদিবাসীর সংখ্যা সহস্রাধিক। যুদ্ধে শহীদ আদিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক অর্ধশত। আদিবাসী এই যোদ্ধা ও তাদের পরিবার বর্তমানে বিপন্ন, বিধ্বস্ত। তারা মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত। ক্রমাগত নিগ্রহ, বঞ্চনা ও অস্বীকৃতি তাদের সামাজিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে। গত তিন দশকে এদের অনেকে দেশান্তরিতও হয়েছেন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবদান সঙ্কলিত করার কথা আমরা প্রথম ভাবি এখন থেকে এক দশকেরও বেশিকাল আগে। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে কাজটি তখনই শুরু করা যায়নি। ১৯৯৯ সালে বেশ কয়েক জনের আলোচনার এক পর্যায়ে বিশিষ্ট লেখক ও এনজিও নেতা ডেনীস দীলিপ দত্ত প্রথম এ ব্যাপারে উৎসাহ ও সমর্থন দেন। তিনি স্থানীয় ও উত্তরাঞ্চলের কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এরপর কাজটি অংশত করার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রতিবেদনটিকে কেন্দ্র করে একটি সেমিনারের আয়োজন করে ২০০০ সালে । সেটি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় প্রচ্ছদ রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়। তারপর আবার ভাটা পড়ে। অবশেষে কাজটি সম্পন্ন করার তাগিদ নিয়ে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় সারাদেশে মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করা হয়। এরপর সমর্থন যোগায় বেসরকারি সংস্থা আর্থ ফাউন্ডেশন (সম্প্রতি বিলুপ্ত)। মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক টানা আট মাস তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করেন একে আজাদ, মুবিন খান ও চাবু হক।

আমরা অকপটে স্বীকার করে বলে নিতে চাই, প্রচুর সীমাবদ্ধতা ও অনভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ করতে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি। মূলত মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও পরে তা যাচাই-বাচাই করে সংকলিত করা হয়েছে। এরপরও তথ্যের বিভ্রান্তি থাকার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সেরকম তথ্য কারো নজরে এলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। কিছু কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং অসংখ্য আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার নিকট আমরা পৌছতে পারিনি। সময়ের স্বল্পতা, সনাক্ত করতে না পারা এবং পূর্ব স্থানে বসবাস না করার কারণে এই বিপত্তি হয়েছে। সেই বিচারে এটি এ বিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, অপূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও ইতিহাস। ভবিষ্যতে পুনরায় সুযোগ হলে এ গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপদানের আগ্রহ আমরা সাগ্রহে ব্যক্ত করছি। অনুসন্ধিৎসু অপর কেউও একাজে ব্যাপৃত হতে পারেন বলেও আমরা প্রত্যাশা করি। গবেষণাটি পরিচালনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নানাভাবে কুণ্ঠাহীন সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। এদের মধ্যে দিনাজপুরের গ্রাম

বিকাশ কেন্দ্রের মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজশাহীর রুলফাও-এর আফজাল হোসেন, আদিবাসী নেতা রবীন্দ্র সরেন, মিথুশিলাকে মুরমু, ডা. মতিউর রহমান, আমিরুল আরহাম, রাখাইন নেতা উসিত মং, মহেশখালী দ্বীপের শিক্ষার্থী ফ্লা মং, আমার দেশ-এর বান্দরবান প্রতিনিধি আব্দুল মালেক, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বান্দরবানের জেলা কমান্ডার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, খাগড়াছড়ির জেলা কমান্ডার ডা. মফিজুর রহমান, রাঙামাটির আইনজীবী বিধায়ক চাকমা উল্লেখযোগ্য।

আমরা উল্লিখিত সকলের নিকট সানন্দে, সকৃতজ্ঞতায় ঋণী হয়ে থাকলাম। রুচিবান প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য সাগ্রহে এ পুস্তকখানি প্রকাশের দায় বহন করেছে। সংস্থাটির কর্ণধার মো. আরিফুর রহমান নাইমকে কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নেই। কারণ তিনি বই নয়, বস্তুত বিষয় প্রকাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ গ্রন্থটি কিছুমাত্রও নতুন মাত্রা যোগ করলে আমরা আনন্দচিত্ত।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

আইয়ুব হোসেন
মোহাম্মদপুর
ঢাকা
ayubhoss@yahoo.com

সূচি

হাজার বছর ধরে

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল বেষ্টিত এই দেশ বাংলাদেশ। গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ আর সমতটের অযুতধারায় পলিবাহিত সদা-উর্বর সোনার বাংলা। এর ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধিতে লোভীরা হয়েছে লালায়িত। ভাবুকেরা ভাষাময়। আর এমনিতর বহুবিধ স্বাদ-বিস্বাদের বিমোহনে দেশটি বৈচিত্র্যময়। বাংলার শ্যামল ফসলের অবারিত প্রান্তর তার সন্তানদের দিয়েছে জীবনের নিরাপত্তা। বর্ণিল ঋতু-বৈচিত্র্য দিয়েছে জীবনের ছন্দ। লোকায়ত জীবন-দর্শন দিয়েছে সহজিয়া সংস্কৃতির ধারা। কাল পরম্পরায় প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশ দিয়েছে তাদের সংগ্রামমুখর মানসিকতা।

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো অধুনা আবাসিত নয় বাংলাদেশ। এর সোনালি রোদের ভেতর নিমজ্জমান চাষীদেরও অতীতে অস্তিত্ব ছিল যাযাবর জীবনে। সভ্যতার ইতিহাসে তা পুরনো পাথরের যুগ। এরপর মানুষ আর মানবসৃষ্ট সভ্যতার প্রগতিধর্ম উত্তরণ ঘটায় নতুন পাথরের যুগ। সেই যুগ তাকে কৃষিকাজ শেখায়। বুনো পশুকে পোষ মানাতে শেখায়। স্থাণু হয়ে বাসস্থান বানাতে শেখায়। আর সময়ের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এসকল তথ্যের প্রামাণিক নিদর্শন নিঃসন্দেহে এই দেশের প্রাচীনত্বের সত্যতা নিশ্চিত করে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহও তা প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে এদেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য আলোচনার দাবি রাখে। গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক থেকে এ দেশের (বাংলাদেশ) ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা (৭৫ মিলিয়ন বছর)
খ. প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান/চত্বর এলাকা (১ মিলিয়ন বছর)
গ. নবীন ভূ-তাত্ত্বিক যুগের প্লাবনভূমি এলাকা (২৫ হাজার বছর)

টারশিয়ারি পাহাড়ি এলাকা

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বাংশ, সিলেট জেলার উত্তর-পূর্বাংশ ও দক্ষিণাংশের পাহাড়সমূহ এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় এর অন্তর্গত। সৌন্দর্যের

সুনিপুণ বিস্তার এই পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এদের উচ্চতা ক্রমশ বেড়ে গেছে। গড় উচ্চতা ২ হাজার ফুট এবং সর্বোচ্চ চূড়া কেয়োক্রাডাং ৪০৪৩ ফুট উঁচু [(সম্প্রতি সর্বোচ্চ চূড়া হিসেবে কেয়োক্রাডাং নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে)]। অরণ্যে ঢাকা তখনকার পাহাড়গুলোর উপত্যকায় জুম প্রথায় চাষাবাদ হয়। অন্যদিকে, টারশিয়ারি পাহাড়ের বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি রয়েছে সিলেটের উত্তর ও দক্ষিণাংশে। এখানকার পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২০০ থেকে ১০২০ ফুটের মতো। আবার কুমিল্লার লালমাই-র গড় উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট।

প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর এলাকা

১০ লক্ষ বছর আগে শুরু হওয়া এই যুগ মহাদেশীয় বরফ আচ্ছাদনের জন্যে বিখ্যাত। উষ্ণযুগে আচ্ছাদিত বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় নদীগুলোর গতিমাত্রা কমে যেত। ফলে, বাংলাদেশের নদী উপত্যকায় জমেছিল প্রচুর তলানী। এভাবে দুটি বড়ো বড়ো পাললিক চত্বরের সৃষ্টি হয়, যার প্রথমটি বরেন্দ্রভূমি এবং দ্বিতীয়টি মধুপুর গড়। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এবং রাজশাহীর কিছু অংশ নিয়ে ৩৬০০ বর্গমাইলের বরেন্দ্রভূমি গঠিত। অন্যদিকে মধুপুর গড় বিস্তৃত হয়েছে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার প্রায় ১৬০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে।

নবীন ভূ-তাত্ত্বিক যুগের প্লাবনভূমি

ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানের উৎপত্তি হয়েছে এই যুগে। তিনটি বড়ো নদী ও অসংখ্য উপনদী-শাখা, নদী দিয়ে ঘেরা এই বিশাল পাললিক সমভূমির গড় উচ্চতা ৩০ ফুটের নিচে। রংপুর, দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চল হিমালয় পর্বত থেকে বাহিত পলি দিয়ে গঠিত।

তাছাড়া, রাজশাহী ও বগুড়ার কয়েকটি স্থানে ৩ থেকে ৪ হাজার ফুট নিচে প্রাপ্ত স্তরীভূত শিলা থেকে ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা– অন্ততপক্ষে ২৫ কোটি বছর আগে আদি অঙ্গার যুগে এ সমস্ত এলাকা ছিল গরম ও আর্দ্র। বালুস্তরে গাছ চাপা পড়ে অনেক কাল পর কয়লায় পরিণত হয়। বগুড়া ও রাজশাহীর বেশ কয়েকটি স্থানে এ ধরনের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বর্তমান বাংলাদেশের উৎপত্তি আনুমানিক তিন লক্ষ বছর আগে তৃতীয় হিমবাহের শেষ সময়ে। সে সময়ে হিমালয় পাহাড়ের প্রচণ্ড উৎক্ষেপণে এর সামনের দক্ষিণ অংশে একটি নিম্ন ভাঁজের সৃষ্টি হয়। তারপর গঙ্গা, মেঘনা প্রভৃতি নদীবাহিত পলি দিয়ে গড়ে ওঠে এই বিশাল বদ্বীপ। পানির নিম্নমুখিতায় উঁচু জায়গা থেকে নদীর স্রোতে ভেসে আসা প্রচুর পলি উর্বর করেছে এদেশের মাটি। তাই কৃষিপ্রধান সভ্যতা বহুকাল ধরে এদেশ ছিল মানুষের আকাঙ্ক্ষিত আবাসভূমি।

বহু নরগোষ্ঠীর বাংলাদেশ

নৃতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় মানবপ্রজাতি কয়েকটি উপ-বিভাগে বিভক্ত। নরগোষ্ঠী বা Race বলতে সেই সকল উপ-বিভাগকে বোঝায় যার সদস্যরা কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই Race বা নরগোষ্ঠী বিভাজনে সাধারণত মানুষের চামড়া, চুল, চোখের রং, চুলের রং ও প্রকৃতি, চোখের পাতা, নাক, ঠোঁট, থুতনি ও মাথার আকৃতি বিবেচনায় নেয়া হয়। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী F. A. Hobel তাঁর 'Anthropology' গ্রন্থে Race বা নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, A race is a human population that is sufficiently inbreed to reveal a distinctive genetic composition manifest in a distinctive combination of physical traits.*

'The World Book Encyclopedia.' তেও এই বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই আদি মানবধারার অন্তর্ভুক্ত। বিচিত্রধর্মী জলবায়ু, আবহাওয়া, তাপমাত্রা, ঋতু-পরিবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ইত্যাদি কারণে মানবজাতির এক একটি গোষ্ঠী পৃথিবীর একেক অঞ্চলে চুলের রং, গাত্রবর্ণ, নাক, ঠোঁক, মুখ, থুতনি ইত্যাদি ভিন্ন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ধরনের গড়ন বা গঠন নিয়ে বিকশিত হতে থাকে।

আবার, আদিকাল থেকে নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এমনভাবে ঘটে চলেছে যে, নরগোষ্ঠীর বিভাগের বেলায় তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া যায় না। যেসব উপাদানের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর বিভাগ করা হয় তা এক নরগোষ্ঠী থেকে অন্য নরগোষ্ঠীর যথাযথ পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না।*

এমনিতর বহুবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানীগণ সাধারণ মানবগোষ্ঠীর ৯টি পরিবারের কথা বলে থাকেন–

১. ইয়োরোপীয়

ক. উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপীয় : স্ক্যান্ডিনেভিয়া, উত্তর ফ্রান্স ও জার্মানি, নিম্ন অঞ্চলের দেশ, ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের জনগোষ্ঠী।

---

* E. A. Hobel, Anthropology, Page 208

* নৃবিজ্ঞান, সৈয়দ আলী নকী, মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, পৃষ্ঠা ৫৩।

খ. উত্তর-পূর্ব : পূর্ব বাল্টিক, রাশিয়া ও আধুনিক সাইবেরিয়ার জনগোষ্ঠী।

গ. আলপাইন : মধ্য ফ্রান্স, দক্ষিণ জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও উত্তর ইতালির জনগোষ্ঠী।

ঘ. মেডিটেরানিয়ান : এশিয়া মাইনর এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলবাসী।

২. ভারতীয়

ক. ইন্ডিক : ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের অধিবাসী।

খ. দ্রাবিড় : দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসী।

৩. এশীয়

ক. মঙ্গোলীয় : কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়ার জনগোষ্ঠী।

খ. উত্তর চীনাবাসী : মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনের অধিবাসী।

গ. তুর্কি : পশ্চিম চীন ও তুর্কিস্থানবাসী।

ঘ. তিব্বতীয় : তিব্বতের অধিবাসী।

ঙ. দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় : দক্ষিণ চীন, থাইল্যান্ড, বার্মা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার জনগোষ্ঠী।

চ. আইনু : জাপানের আদিম উপজাতীয় বসতি।

ছ. এস্কিমো : উত্তর আমেরিকা ও গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসী।

জ. লপ্ : স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ফিনল্যান্ডের অধিবাসী।

৪. মাইক্রোনোশীয়

ক. পশ্চিম মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী।

৫. মেলানেশীয়

ক. পাপুয়ান : নিউগিনির পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠী।

খ. মেলানেশীয় : নিউগিনির সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী।

৬. পলিনেশিয়

ক. পলিনেশিয়ান আদিম জাতি।

খ. নর- হাওয়াইন : ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পলিনেশীয়, ইয়োরোপীয় ও এশীয়দের মিশ্র জনগোষ্ঠী।

৭. আমেরিকান

ক. উত্তর আমেরিকান (ইন্ডিয়ান) : কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী।

খ. কেন্দ্রীয় আমেরিকান (ইন্ডিয়ান) : দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা, মেক্সিকো, কেন্দ্রীয় আমেরিকা থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

গ. দক্ষিণ আমেরিকান (ইন্ডিয়ান) : টিরাডেল ফিগো বাদে আর সব দক্ষিণ আমেরিকাবাসী।

ঘ. লেডিনো : ভূমধ্য সাগরীয়, কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ান, বন্ড নিগ্রো ও বান্টুদের মিশ্র মানবগোষ্ঠী নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসী।

ঙ. উত্তর আমেরিকান : অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপীয় ও আফ্রিকায় বসবাসরত মিশ্র জনগোষ্ঠী।

৮. আফ্রিকান

ক. পূর্ব আফ্রিকান : নাইলোটিক সুদান, ইথিওপিয়া ও পূর্ব আফ্রিকাবাসী।

খ. সুদানীয় : নাইলোটিক ছাড়া অন্যসব সুদানীয়।

গ. ফরেস্ট নিগ্রো : কঙ্গো ও পশ্চিম আফ্রিকার জনসমষ্টি।

ঘ. বান্টু : দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকার নিকটবর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠী।

৯. অস্ট্রেলিয়ান

ক. মুরাইন : দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনগোষ্ঠী।

খ. কার্পেন্টারিয়ান : কেন্দ্রীয় ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ার জনগোষ্ঠী। তাছাড়া, নিগ্রোবটু জনগোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নিউগিনিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

আবার, মানুষের গায়ের রং, নাক, ঠোঁট, চোয়ালের গড়ন, চুলের রং ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেও নরগোষ্ঠীর শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে।

ককেশীয়

এই শ্রেণীর মানুষদের গায়ের রংয়ে ভিন্নতা রয়েছে। এদের গায়ের রং সাদা থেকে কাল-বাদামি। মাথার চুল সোজা থেকে কোঁকড়ানো, নাকের আকৃতি সাধারণত খাড়া, ঠোঁট পাতলা এবং দৈহিক গড়ন লম্বা থেকে খর্বাকৃতির হতে পারে। বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে ককেশীয়দেরকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে– ১. পূর্বভারতীয় ২. ভূমধ্যসাগরীয় ৩. আলপাইন, ৪. আর্মেনয়েড, ৫. নর্ডিক ৬. দিনারীয় ৭. পূর্ব বাল্টিক ও ৮. পলিনেশীয়।

মঙ্গোলয়েড

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের গায়ের রং হলদে বাদামি। চুল খাড়া থেকে সোজা ও ঢেউ খেলানো হয়ে থাকে। ঠোঁট মাঝারি ধরনের। মঙ্গোলয়েডদের কয়েকটি

উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়– ১. এশীয় মঙ্গোলয়েড ২. ওশেনীয় মঙ্গোলয়েড ও ২. আমেরিকান মঙ্গলয়েড।

নিগ্রোয়েড

এদের গায়ের রং কালো থেকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। মাথার চুল কোঁকড়ানো থেকে পশমি। নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট মোটা ও পুরু। এদেরকে কয়েকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– ১. ফরেস্ট নিগ্রো ২. মেলানেশিয়ান নিগ্রবটু ৩. বুশম্যান ৪. বান্টু ও ৫. সুদানীয়।

কিন্তু পৃথিবীর পরম্পরাগত বাস্তবতায় মানব গোষ্ঠীর বিচরণ, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক মিলন ও সখ্য, শত শত বছর পাশাপাশি বসবাস, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নরগোষ্ঠীগুলোর স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ বর্তমানে বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠী একটি অবাস্তব ধারণা। অতিক্রান্ত তিন হাজার বছর বা তারও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মানবধারা পৃথিবীব্যাপী তাদের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া, একজাতি কর্তৃক অন্যজাতিকে পরাজিত ও নিপীড়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানুষের ধর্ম ও বিশ্বাসে ভাঙচুর প্রভৃতি কারণে আজ কোনো বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠীর অনুসন্ধান অবান্তর।

ভাষাগত বিবেচনায় বাংলাদেশের অধিবাসীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়– বাঙালি ও অবাঙালি। বসবাসের দিক থেকেও দুইভাগে ভাগ করা যায়– সমতলবাসী ও পাহাড়ি। তবে এদেশের সর্বত্রই বাঙালিদের বসবাস রয়েছে। বাঙালিদের একাংশ আবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বিহারে বসবাসরত। বাঙালিদের পাশাপাশি এদেশে বসবাস করে প্রায় ৪৪টির মতো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী। তাই এদের অধিবাসীদের কোনো সুনির্দিষ্ট নরগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাদের গায়ের রং কালো, বাদামি ও সাদা ; অনেকের নাক সামান্য চওড়া। বেশিরভাগের নাক গোল থেকে খাড়া। চোয়াল স্বাভাবিক। চোখের রং সাধারণত কালো। গায়ে চুলের পরিমাণ স্বাভাবিক। মাথা গোল থেকে লম্বা। এই সকল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অধিবাসীদের শংকর জাতের অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা হয়। কারণ, ধূসর ইতিহাসের দীর্ঘসূত্রী পরম্পরায় এই অঞ্চলে এসে মিশেছে বিভিন্ন জাতির বিবিধ ধারা। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ২০০০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আগত আর্যজাতি। যাযাবর বৃত্তির এই জাতিটি যুদ্ধাস্ত্রে দক্ষ এবং শারীরিকভাবেও শক্তিশালী ছিল। তবে তারা বহু চেষ্টা করেও বঙ্গ এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি।

বঙ্গের লোকদের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধও হয়েছিল। তাতে তারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে না পারায় বঙ্গের লোকদের ম্লেচ্ছ বলে উপহাস করত। এই আর্য

ও অন্যান্যদের আগমনের পূর্বেও ভারতবর্ষে সভ্য জাতির বসবাস ছিল। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়রা সিন্ধু অঞ্চলে এবং অস্ট্রিকরা ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করত। অনেকের মতে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে উৎখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত সভ্যতার নিদর্শন সভ্য দ্রাবিড়দের অবদান। ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার জানা যাযাবর হিংস্র আর্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করে দ্রাবিড়দের ধাওয়া করে। ফলে, এক সময় তারা পরাজয় স্বীকার করে বেছে নেয় নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থান। অর্থাৎ দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। সেই সময় কোল, ভিল, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মানুষরাও পাহাড়ে বসবাস করত। ঘন বনে ঢাকা পাহাড়-পর্বত পার হতে না পেরে আর্যরা আর এগোতে পারেনি। অন্যদিকে, দূরতিগম্য নিস্তরঙ্গ পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নেয়া জনমানুষরাও প্রগতিধর্মিতা ধরে রেখে সভ্যতার যথার্থ গতিতে পারেনি এগিয়ে যেতে। অনেক ইতিহাসতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীর মতে, এই পাহাড়-পর্বতে পড়ে থাকা মানুষরাই এই অঞ্চলের আদিবাসী বা পূর্বপুরুষ।

আর্যদের পরপরই এদেশে পারসিক ও শক জাতিরা এসেছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।* এরপর তুর্কি, পাঠান, মোঘল, মঙ্গল, আরবীয়রা এসেছে। আরো পরে এসেছে ওলন্দাজ, ইংরেজসহ ইয়োরোপীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। আর এভাবেই সময়ের বিবর্তনে দ্রাবিড়, মঙ্গল, আলপাইন, ককেশয়েড, প্লোটো অস্ট্রালয়েড, নিগ্রোয়েড প্রভৃতি বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক মিলন, একই জলবায়ু এলাকায় বিচরণ, একই রকম খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের অধিবাসীরা পরিণতি পেয়েছে এক সুন্দর শঙ্কর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিতে।

---

* নৃবিকান, সৈয়দ আলী নকী ও মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, পৃ. ৬৮

বাংলাদেশে অবাঙালি জনগোষ্ঠী

নৃতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়ায় বহুমুখিতা, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্নতা প্রচলিত ছিল। এ কারণে এই দেশের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে সঙ্গতির সমন্বয়ের চেয়ে সংস্কৃতির বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা অধিক প্রভাবিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙালি জাতি বলে যারা বিবেচনা করেন, তাঁরা বাংলার সংস্কৃতির বিভাজনের প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রক্রিয়া থেকে করে থাকেন। কিন্তু পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, কল্পনাশ্রয়ের মাধ্যমে সঠিক তথ্যের দ্বারা তা প্রমাণ করতে পারেন না। ইতিহাসের তথ্যাদি বঙ্গের সংস্কৃতির বিভাজন প্রক্রিয়া যে সকল পর্যায়ে সংস্কৃতির সমন্বয়ের চেয়ে অধিক প্রসারিত ও পরিপুষ্ট ছিল তার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি জাতির সংমিশ্রণে আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভব। এই জনগোষ্ঠীই বাংলাদেশের প্রধান একটি জনধারা। অন্যদিকে, অপ্রধান জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রায় অর্ধশত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য–১. চাকমা, ২. মারমা/মগ ৩. ত্রিপুরা ৪. সাঁওতাল ৫. ম্রো ৬. গারো ৭. রাখাইন ৮. তঞ্চংঙ্গা ৯. বম্ ১০. উঁসুই ১১. পাংখোয়া ১২. খুমী ১৩. খিয়াং/খ্যাং ১৪. লুসাই ১৫. চাক ১৬. কুকি ১৭. বনযোগী ১৮. মণিপুরী ১৯. রাজবংশী ২০. হাজং, ২১. হদি ২২. খাসিয়া ২৩. ওঁরাও ২৪. সেন্দুজ ২৫. লাউয়া ২৬. পাউন প্রভৃতি।

দেশের সমতল ও পাহাড়ি উভয় এলাকাতেই এদের বসবাস রয়েছে। তবে তুলনামূলক পাহাড়ি স্থানে ঘনত্ব বেশি। এখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে উল্লিখিত শব্দটি প্রচলিত হয় ইংরেজি Tribal People-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে। আর 'Tribe' ইংরেজি ভাষাতেও যথেষ্ট সুস্পষ্ট নয়। তাই সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক পরিসরে শব্দটিকে বাদ দেয়ার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মূলত 'Tribe' বা উপজাতি বলতে বোঝাত এমন জনগোষ্ঠী, যারা একটি দেশের মূল জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রহিত এবং অলিখিত পৃথক ভাষা রয়েছে এবং যাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ আদিম।

কিন্তু বর্তমান কাল বিচারে এবং তাদের শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনযাপন প্রণালি, চিন্তা-প্রগতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে তারা 'উপজাতি' অভিধার গণ্ডি পেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিকতার আলোয় ভেসে গিয়েছে আদিম অন্ধকার। যদিও প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই রয়ে গিয়েছে অনেক অকৃত্রিম সংস্কার।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের জাতিগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখন তুলে ধরা হল।

চাকমা (Chakma)

বাংলাদেশে বসবাসরত প্রান্তিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। এদের শতকরা ৯০ ভাগের বাস পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে। যথা, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। আবার ভারতের অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি দেশে চাকমাদের বসতি রয়েছে। নৃতত্ত্বের বিচারে চাকমা জাতি মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। 'চাকমা' জাতির ইতিহাস বেশ পুরনো। জানা যায়, আনুমানিক ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরি ও তাঁর সেনাপতি রাধামন খীসা রোয়াং রাজ্য (বর্তমান রামু), অক্সাদেশ (আরাকান সীমান্ত), খ্যয়ংদেশ, কাঞ্চন নগর (কাঞ্চন দেশ) ও কালঞ্জর (কুকি রাজ্য) প্রভৃতি রাজ্য জয় করলে এই খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য চাকমা রাজার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। এরপর ১৫২০ সালে পুনরায় তাদের রাজ্যসীমা নির্ধারিত হয়– পূর্বে নাম্রে (বর্তমান নাফ) নদী, পশ্চিমে সীতাকুণ্ড পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে চাঁইবাল পর্বতশ্রেণী।

১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পর্তুগিজ মানচিত্রপ্রণেতা লাভানহা অঙ্কিত বাংলার সর্বাপেক্ষা পুরনো ও এযাবৎ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের উল্লেখ রয়েছে। অন্য এক মতে–"ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন খ্যাতনামা পর্তুগিজ ইতিহাসবিদ Joa De Barros বঙ্গোসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলো সম্পর্কে 'Decispaco do Rino de Bengall' নামক একটি মানচিত্র তৈরি করেন। উক্ত মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর পূর্ববর্তী দুইটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে Chacomas নামক একটি স্থানের নাম পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা যায়, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে মাতামুহুরী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত এলাকার নাম ছিল চাকোমাস (Chacomas)। কক্সবাজার জেলার ৬ মাইল পূর্বে রামু বাজারের দু'মাইল পশ্চিমে চাকমাকুল নামক একটি ইউনিয়ন আছে। এ থেকে ধারণা করা হয়, চাকমারা ঐ সময় রামু পর্যন্ত বসতি স্থাপন করেছিল। ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে Gastaidi নামক একজন ইয়োরোপীয়ের প্রস্তুতকৃত Bengala

মানচিত্রেও চাকমাদের অবস্থানের সমর্থন মেলে। এছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকেও ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে বাকখালী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত চাকমাদের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল ৈত্রেন বা আলেখ্যাংডং। বর্তমানে বান্দরবান জেলায় ৈত্রেন একটি মৌজা রয়েছে এবং আলীকদম উপজেলার নাম আলেখ্যাংডং-এর বিকৃতি বলে বিবেচনা করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় চাকমা রাজতন্ত্রের বিভিন্ন উত্থান-পতন, বার্মা ও মোঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও সম্পর্কের কারণে চাকমাদের রাজধানী ও আবাসস্থল শঙ্খ নদীর তীরবর্তী হাঙ্গরকুল এবং চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া হয়ে উত্তর ও পূর্ব দিকের পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়।"*
তবে একথা স্বীকার্য যে, চাকমা জাতির উৎপত্তি, আদি নিবাস ও বাংলাদেশে অবস্থানকাল সম্পর্কে প্রামাণ্য কোনো ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া পায়নি। প্রচলিত কাহিনীসমূহ চম্পকনগর-বিজয়গিরি উপাখ্যান, সাক-চাকমা তত্ত্ব, আরাকান কাহিনী দেঙ্গাওয়াদি আরেদফুং, রাজা সিরিওমার কীর্তিগাথা, মইচাগিরি নগরীর বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয় এখনো গবেষণাসাপেক্ষ।

আবহমান কাল থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চাকমাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল জুম চাষ। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্টা ও বাঙালিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই হাল চাষে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া, ক্রমাগত জুম জমির পরিমাণ কমে যাওয়াও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। বেশিরভাগ পাহাড়ি জাতির মতো চাকমারাও মাটি হতে ৪-৬ ফুট উঁচুতে বাঁশ, বেত, কাঠ, ছন, কুরুক পাতা (এক ধরনের পাহাড়ি পাতা) প্রভৃতি দিয়ে ঘর তৈরি করে। এই ঘরে উঠতে সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। চাকমাদের ঘরের সামনের দিকে তিনদিক ঘেরা একটি খোলা মাচান থাকে। এই মাচানকে বলা হয় ইজর। ইজরে ধান, তুলা, কাপড় ইত্যাদি রৌদ্রে শুকানো এবং পানির কলসি ও অন্যান্য পাত্র রাখা হয়। তাঁরা ড্রয়িংরুমকে চানাহ্, অতিথি-বৃদ্ধ ও অবিবাহিত পুরুষদের শোবার ঘরকে সিংগবা, মেয়েদের বসার ঘরকে পিজোর এবং অবিবাহিত মেয়েদের শোবার ঘরকে ওজলেং বলে থাকে। অবশ্য অধুনা সময়ের বিবর্তনে তাদের বাড়ি-ঘর নির্মাণে আধুনিক শৈলী লক্ষ করা যায়।

গ্রামবাসী চাকমাদের অনেকেই নিজেদের তাঁত থেকে পোশাক তৈরি করে। তাদের পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম কই এবং খুবং, আর মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম পিনন এবং খাদি।

* রাঙামাটি বৈচিত্র্যের ঐকতান, পৃষ্ঠা ২৯-৩০

আদি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাতি চাকমারা। তবে বৌদ্ধ ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার বাইরেও অনেকে প্রকৃতি পূজায় বিশ্বাস স্থাপন করার নিদর্শন হিসেবে বুদ্ধ পূজার পাশাপাশি থানমানা, ধর্মকাম, ঐয়া, ভাতদ্যা, গাংপূজা ও জুমমারা ইত্যাদি পূজা পালন করে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং বৈশাখী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের স্মরণে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে থাকে। তবে 'বিঝু' উৎসব চাকমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রধান। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন এবং নববর্ষের প্রথমদিন মোট ৩দিন ধরে এই উৎসব চলে। বিঝু উৎসবের প্রথম দিনকে ফুল বিঝু দ্বিতীয় দিনকে মূল বিঝু এবং তৃতীয় দিনকে নুয়াবঝর বলা হয়। বিঝু উৎসব ছাড়াও চাকমারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। যেমন– নুয়া ভাত, চামনী অনা, ফানাচ বাত্তি উড়ানা, আহজার বাত্তি জ্বালানা, আহল পালনী, ব্যূহ চক্র, কঠিন চীবর দান, গাড়ি টানা, ওয়া ধারণা, ওয়া ভাঙানা ইত্যাদি। উদযাপিত এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঠের তৈরি বেলা, বাঁশ গিয়ে তৈরি খ্যাংগড়ং ; বাজি নামক এক রকম বাঁশি তৈরি করে তারা। এছাড়া বাঁশ দিয়ে তৈরি করে ধুধুক। নাচের অনুষ্ঠানে আবশ্যক আরেকটি যন্ত্রের নাম জান্দুরা। জান্দুরা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি। এদের প্রধান খাবার ভাত। বাঁশ কোড়ল, বাঁশের কচি ডগা কেউ কেউ শাক হিসেবে ব্যবহার করে। প্রিয় খাবার শুকনো মাছ, শূকরের মাংসও হরিণের মাংস ইত্যাদি। বাগর, ফুজি, শাবারাং নামক ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ চাকমারা জুম চাষের মাধ্যমে উৎপাদন করে তরকারি হিসেবে ব্যবহার করে। এসব তাদেরকে বিভিন্ন পাহাড়ি রোগ-বালাই থেকেও মুক্ত রাখে।

চাকমা জাতি তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত– চাকমা, তঞ্চংঙ্গা, দৈয়াংনক। মোট ৪৬টি গোজা এবং অনেক গুথি বা গোষ্ঠী রয়েছে। একটি গোজা বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পুরুষপ্রধান বা পিতৃপ্রধান সমাজ চাকমাদের। এদের মধ্যে মামাতো বোন, মাসতুতো বোন, দূর সম্পর্কের নানা-নাতনি'র বিয়ে সমাজসিদ্ধ। তবে চাচাতো বোন, মামা-ভাগ্নি, ফুফু-ভাইপো ও স্ত্রীর বড়ো বোনকে বিয়ে করা সিদ্ধ নয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙাল ভিন্ন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যে চাকমারা সবচেয়ে উন্নত। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা রয়েছে। রয়েছে ভাষার ইতিহাস। তবে কালক্রমে এ ভাষায় বাংলা, আরাকানি, থাই, অহমিয়া প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমাদের অধিকাংশ দ্বিভাষী। নিজ ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। চাকমা ভাষার লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। লোক-

সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত লোকগীতিকে বলা হয় উবগীদ। এটা এক ধরনের প্রেমের গান, হৃদয় বিনিময়কালে গাওয়া হয়। এছাড়া পালাগান, ধর্মীয় গীতিকা, বারমাসী গান, কবিতা, প্রবাদ বাক্য, ছড়া, ধাঁধা প্রভৃতি চাকমাদের উন্নত ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জাতির পরিচয়কে নির্দেশ করে।

মারমা (মর্মা/মগ) [Marma/Mugh]

মারমা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অবাঙালি নৃগোষ্ঠী। এদের অধিকাংশের বাস বান্দরবান জেলায়। তবে রাঙামাটির কাপ্তাই, রাজস্থলী, কাউখালী সদর উপজেলায় এবং খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি, মাটিরাঙা, মহালছড়ি ও সদর উপজেলায় এদের বসবাস রয়েছে। আবার কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলাতেও মারমাদের লক্ষ করা যায়। বর্তমানে সংখ্যায় মারমারা ২ লাখের ওপরে। দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিচারে এরা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

জানা যায়, স্বাধীন আরাকান রাজ্যকে ধ্বংস করে বর্মী সম্রাট বর্মী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর সকল অধিবাসীকে 'ম্রাইমা' নামে অভিহিত করেন। বাংলাদেশে এই সম্প্রদায় নিজেদেরকে বার্মা থেকে আগত হিসেবে দাবি করায় মারমা পদবিতে ভূষিত। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে মগ নামে পরিচয় দিলেও শিক্ষিত ও বর্তমান প্রজন্ম এই নামে লজ্জা ও কুণ্ঠাবোধ করে । কেননা, মগ বলতে প্রধানত আরাকানী মগ জলদস্যুদেরকে বোঝায়। আবার সমতলে বসবাসরত রাখাইন পরিচয় প্রদানকারি জনগোষ্ঠীও মারমা সম্প্রদায়ভুক্ত। মারমা ও মগদের প্রধান (রাজা) দু'জন : বোমাং এবং মং। বোমাং রাজা বান্দরবান, আর মং রাজা থাকেন খাগড়াছড়িতে।

বাংলাদেশে মারমাদের আগমনকাল এবং বিস্তৃতি নিয়ে একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। এক মতে, ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজার সেনাধিনায়ক মহা পিন্নাগি বার্মায় একটি আগ্রাসন পরিচালনা করলে সেখানে মারমা জনগোষ্ঠীর একাংশ বঙ্গীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। আরেক মতে, ১৭৮৪ সালে বার্মা কর্তৃক স্বাধীন আরাকান রাজ্যের পতন ঘটলে বার্মার রাজা বোদাওপা (১৭৮২-১৮১৯) এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। সে সময় আরাকানের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বঙ্গদেশে দেশান্তরিত হয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত মারমারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত, যেমন– রেগেসা বা খ্যাংসা, ককদাইংসা, মারেসা, ক্যাকফ্যাসা, ফারাংসা, লংগুদুসা, থংঘা ইত্যাদি। সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তবে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। তারা তাদের আদিম সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে সম্মান করেন। তাই এই সমাজে নারীরাও পুরুষের মতো পৈত্রিক সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারী হয়। তিন ধরনের বৈবাহিক ব্যবস্থা প্রচলিত মারমা সমাজে। যেমন– ১. বরের ঘরে বধূবরণ ২.

কনের ঘরে বর বরণ এবং ৩. বাবা-মায়ের অগোচরে বর-কনের পলায়ন। এই সমাজে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং প্রাক-বিবাহ ভালোবাসা সাধারণ ব্যাপার বলে বিবেচিত।

সাধারণত বাঁশ, কাঠ, ছন দিয়ে মারমাদের ঘর নির্মিত হয়। ঘরের মেঝে ৫-৬ ফুট উঁচু বাঁশের তৈরি মাচাং-এর ওপরেও। শোবার ঘরের সাথে সংযুক্ত করে রান্নাঘর (ফ্যাক) এবং লাকড়ি ঘর (যাং জাং) ও জল রাখার ঘর (রাজাং), বানানো হয়। আলাদাভাবে তৈরি প্রসূতি ঘর (মইংজাং) এবং ঢেঁকিশালা (মং দুরুং)। পথিকদের বিশ্রামের জন্যে তৈরি হয় বিশ্রামাগার (চরাইক)। বড়ো বড়ো মারমা গ্রামে ক্যাং (মন্দির) এবং সাংখাইং জং (আশ্রম) তৈরি করা হয়। এই ক্যাং-য়ে লেখাপড়া করে মারমাদের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা।

মারমা সমাজে পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে দেয়া (ধুতি), আংগী (শার্ট) ও গংবং (পাগড়ি)। মেয়েদের থাবিং (লুঙ্গি), বেদাই (ব্লাউজ), রাংগাই (বক্ষবন্ধনী)। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করে। তবে শহরে বসবাসকারী অনেক মারমা আধুনিক পোশাক ব্যবহার করে ।

প্রধান খাদ্য ভাত হলেও মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফলমূল ও শুটকি তাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে। তাদের প্রিয় পানীয় ঘরে তৈরি দেশী মদ। জুম চাষ তাদের প্রধান পেশা। এছাড়া তারা পশু-পাখি পালন, বয়নশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদিতে সংযুক্ত।

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি পূজাও উদযাপন করতে দেখা যায়। মাঘী পূর্ণিমা তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি ধর্মীয় উৎসব। এটি মারমা সমাজে তাবুংলারে নামে পরিচিত। তাদের গৃহদেবতা হল চুমুংলে। তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে মারমারা বিয়ের আগে জীবজন্তু বলিদান করে। মারমাদের বিশেষ বিশেষ উৎসব ও পার্বণগুলো হল– ফয়ারি, খ্যো পোহ্‌য়ে, কথিং, পোহ্‌য়ে, স্যায়ং প্রু পোহ্‌য়ে, পইংজ্রা পোহ্‌য়ে ইত্যাদি। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্যাংলুং (কুস্তি), ক্রাকখী যো, গুড্ডু, গিলা, পোছাইক খেলা, পাংথুং, জাইক, ক্যাপ্যা, বদু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উৎসব, পার্বণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মারমাগণ বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যগীতের আয়োজন রাখে। তাদের কিছু ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র হল– বুঙ (ছোটো ঢোল), পেহ (বড়ো ঢোল), বে (বাঁশি), পেতলা, মং, খারা, লাংখআ, দুংমাং ইত্যাদি। তবে তাদের বিখ্যাত উৎসবের নাম সাংগাই বা সাংগ্রাই। পুরাতন বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করা উপলক্ষে এ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এ সময় পানিখেলা বা জলোৎসব হয়ে থাকে। মারমা তরুণ-তরুণীদের কাছে এ অনুষ্ঠান অনাবিল আনন্দের জোয়ার এনে দেয়।

মারমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। মারমা ভাষা বর্মী ভাষার সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ও বাক্যগঠন রীতিতে উভয় ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্যও লক্ষণীয়। তাদের ভাষায় বর্ণমালার নাম ম্রাইমাজা। মারমা সমাজে তাদের নিজেদের রচিত রূপকথা, ছন্দছড়া, উপকাহিনী, পুরাকাহিনী প্রভৃতি প্রচলিত। মারমাদের প্রথাগত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা তিন স্তরবিশিষ্ট। গ্রাম পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রধান হলেন কারবারি। মৌজা পর্যায়ের প্রধান হেডম্যান এবং সার্কেল প্রধান রাজা।

শিক্ষা, সামাজিকও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উৎসাহ, আশাবাদ অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে মারমা সমাজে বেশকিছু উন্নয়নমূলক সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেমন– বাংলাদেশ মারমা সমিতি, বাংলাদেশ রাখাইন–মারমা সংঘ পরিষদ ইত্যাদি।

ত্রিপুরা (টিপ্‌রা/টিপারা) [Tripuri/Tipra/Tepperah]

ত্রিপুরা জাতি ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। বলতে গেলে, বিষ্ণু পুরাণে 'কিরাত' ভূমির উল্লেখ আছে– যা পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। একদা সেখানে ত্রিপুরা নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নামানুসারেই সেই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখা হয়েছে বলে কোনো কোনো ইতিহাসবিদের অভিমত। নৃতাত্ত্বিক বিচারে ত্রিপুরাগণ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তা বলেছেন, ত্রিপুরাদের পূর্ব পুরুষগণ প্রায় ৫ হাজার বছর আগে মঙ্গোলিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার তিব্বত ও সাইবেরিয়ার পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে এসেছিলেন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি অংশ Bodo বা Boro নামে পরিচিত ছিলেন। Boro-দের কিয়দংশ গঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে গোড়াপত্তন করেছিলেন। আর তারাই পরবর্তীতে ত্রিপুরা নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে এই জাতি দেশের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সর্বাধিক সংখ্যায় বাস করে। এছাড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা ও সিলেটের কিছু অঞ্চলে এদের উপস্থিতি রয়েছে। বাংলাদেশে ত্রিপুরাদের সংখ্যা ১ লাখের মতো।

ত্রিপুরা সমাজে দলকে বলা হয় দফা। কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে এক একটি দফা। ত্রিপুরাদের মোট ৩৬টি দফা। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬টি দফার উপস্থিতি রয়েছে। প্রত্যেক দফায় পৃথক ধরনের কথ্যরীতি, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার-অনুষ্ঠান রয়েছে। এদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের পুত্র সন্তানেরাই পিতার জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখলের অধিকারী হয়। অবশ্য গোত্রভেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। এই সমাজে সর্ব গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ। তবে রক্ত সম্পর্কীয় তিন পুরুষের মধ্যে বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ। প্রধানত শিব ও কালীর পূজারি বলে ত্রিপুরাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী শৈব বলা হয়। তবে তারা লক্ষ্মী, গঙ্গা, সরস্বতীসহ

আরও ১৪ জন দেব-দেবীর পূজা করে। এসব পূজা-পার্বণ উদযাপনে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও তান্ত্রিকাচার পালন করে। তবে, অধুনা কিছুসংখ্যক ত্রিপুরা খ্রিষ্টধর্ম মতে দীক্ষিত হয়েছে।

তাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব 'বিষু' উৎসব। একে বৈসুক বা বুইসুকও বলা হয়। বিষুসংক্রান্তি পালিত হয় বাংলা বছরের শেষ দুই দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিনে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই আয়োজিত হয় ২২ মুদ্রার ঐতিহ্যবাহী 'গায়রা' বা 'গরেয়া' নৃত্য। বিখ্যাত এই নৃত্যদলে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে পরপর তিন বছর নাচতে হয়।

বয়নশিল্পে খুবই উৎকর্ষতার প্রমাণ রয়েছে ত্রিপুরা সমাজে। এই সমাজের বিভিন্ন দফার নারীরা বিভিন্ন রঙের নক্‌শাসমৃদ্ধ পোশাক পরে। তাদের কাপড়ের নিচের অংশের নাম রিনাই এবং উপরের অংশের নাম রিসা। আর ত্রিপুরা পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক রুতি, গামছা ও মাথার পাগড়ি। সমাজের ত্রিপুরা রমণীরা কোমর তাঁতের মাধ্যমে এগুলো তৈরি করে। গ্রামে বসবাসকারী ত্রিপুরারা মাচাং তৈরি করে তার ওপর ঘর নির্মাণ করে। এ ধরনের ঘরকে তারা বলে 'নোক'। সাধারণত পাহাড়ের ওপরে ঘর করতে পছন্দ করে তারা।

প্রধান খাদ্য ভাত, তার সাথে শাক্-সব্‌জি ও শূকরের মাংস তাদের খুব প্রিয়। বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে ত্রিপুরারা নিজেদের ঘরে তৈরি মদ পান করে থাকে। অধিকাংশ ত্রিপুরা জীবিকা-নির্বাহে জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। কিছু সংখ্যক পশু-পালন ও হাল চাষ করে। আর খুবই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ত্রিপুরা বর্তমানে বিভিন্ন চাকরি ও ব্যবসাকার্যে নিয়োজিত। তবে বেশিরভাগ ত্রিপুরাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা ও কৃষিজমি না থাকায় দারিদ্রসীমায় বসবাস করে ।

একসময় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেশ সুনাম ছিল ত্রিপুরাদের। পাহাড়ি লতা-পাতা, বৃক্ষের ছাল-মূল থেকে তৈরি হত ওষুধ। কিন্তু বর্তমানে কাঁচামালের অভাব ও চর্চা কমে যাওয়ায় ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরাদের বিখ্যাত চিকিৎসা পদ্ধতি। ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষার নাম 'হাল্লামী'। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরাদের এই ভাষায় রচিত নানা রকমের ছড়া, রূপকথা, কাহিনীকাব্য, লোকগীতি, পালাগান, উপকথা খুবই সমৃদ্ধশালী, যা কেবল ত্রিপুরা সংস্কৃতিকেই নয়, বাংলার লোক সাহিত্যেও অনন্য সংযোজন।

ত্রিপুরা সমাজে কারো মৃত্যু ঘটলে একটি বিশেষ তালে ঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানানো হয়। এরপর কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে শবদেহ দাহ করা হয়। সমাজ কাঠামোতে মনোনীত গ্রাম প্রধানকে বলা হয় 'রোয়াজা'। এর পরে গ্রামবাসীরা ধাবেং ও মুরবুই নামক দুইজনকে মনোনীত করে। তারা ত্রিপুরাদের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও কোনো সমস্যার সমাধানকল্পে রোয়াজাকে সাহায্য করে।

রাখাইন (রাক্ষাইন) [Rakhaing]

এদেশের এক অবাঙালি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রাখাইন। বলা হয়ে থাকে, যারা তাদের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় জীবনযাত্রার নিজস্ব প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পালন করে তারাই রাখাইন। অর্থাৎ 'রাখাইন' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'রক্ষা' ও 'রাখাইন'-এ দুটো পালি শব্দ থেকে, যার সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি। অবশ্য এই 'রাখাইন' নামকরণে ভিন্ন মতও রয়েছে। দেহগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নৃতাত্ত্বিকরা রাখাইনদের মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত ভোটবর্মি জনগোষ্ঠীর ছোটো শাখা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারো কারো মতে, রাখাইনরা মারমা জাতির সমগোত্রীয়, বাংলাদেশে যারা মগ নামে পরিচিত।

পনেরো শতক থেকেই রাখাইনদের অংশবিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু ও সংলগ্ন এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন। আর বৃহত্তর অংশটি আসে আঠারো শতকে। সে সময় রাখাইনদের আদি বাসস্থান আরাকানে সংঘটিত রাজনৈতিক দুর্যোগ তাদেরকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করে। এ সময় তারা ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়, বরগুনা, পটুয়াখালী, রামু ও কক্সবাজারে ছড়িয়ে পড়ে।

রাখাইন মূলত কৃষিনির্ভর সম্প্রদায়। এছাড়াও তারা কাপড় বোনা, লবণ চাষ, পশুপাখি পালন ও ব্যবসার সাথে জড়িত। বর্তমানে অবশ্য কিছুসংখ্যক শিক্ষিত রাখাইন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে আত্মনিয়োগ করছে। রাখাইনদের পোশাক-আশাকে তেমন ব্যতিক্রম বা বৈচিত্র্য নেই। রাখাইন পুরুষরা সাধারণত লুঙ্গি-ফতুয়া এবং নারীরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরিধান করে ।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রাখাইনদের। কিন্তু পিতা পরিবার-প্রধান হলেও সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যার সমান অধিকার রয়েছে এই সমাজে। বিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক কর্তব্য বলে বিবেচিত। কিন্তু সেই বিয়েতে কোনো পণ বা যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই।

সাধারণত নদীর পাড় ও সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানের সমতলে বসতি গড়ে তোলে রাখাইনরা। ঘরগুলো তৈরি হয় মাটি থেকে উঁচু মাচার ওপরে। তাদের বাড়িঘরের সামনে বা পেছনে উঠোন বা বাগান থাকে না। তবে বেশ সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে রাখাইনরা। রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে কিছু আদিবাসীসুলভ সংস্কার রয়েছে। জাদুবিশ্বাস ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এর অন্যতম। ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গৌতমবুদ্ধের জন্মবার্ষিকী। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে বৈশাখী, মাঘী ও প্রবারণা পূর্ণিমা। আর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বসন্ত উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তিতে উদযাপিত হয় সাংগ্রেং। 'সাংগ্রেং' রাখাইনদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। এটি বাংলা নববর্ষের সময় ৩ দিন ধরে

পালিত হয়। এ সময় রাখাইন তরুণ-তরুণীরা 'পানি খেলা' নামক উৎসবে মেতে উঠে।

রাখাইনদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডার। জানা যায়, ব্রিটিশ শাসনামল থেকে স্বাধীনতার পর পর্যন্ত এই দেশের কক্সবাজারসহ কোনো কোনো অঞ্চলের রাখাইন অধ্যুষিত বিদ্যালয়গুলোতে রাখাইন ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাখাইনদের মাতৃভাষা ভোটবর্মি ভাষাগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় সকল রাখাইন শিশুই বৌদ্ধ পাঠশালায় (কিয়ং) তাদের শিক্ষাকর্ম শুরু করে। এখানে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ভাষাগত ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা হয়।

রাখাইন সমাজে মৃতদেহ সৎকারে দাহ করার রীতি প্রচলিত। শব দাহ করার পূর্বে বেশ কিছু সংস্কার পালন করা হয়। সে সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু (পুরোহিত) মৃতব্যক্তির মাথার পাগড়ি ধরে মন্ত্র পাঠ করে তার আত্মার শান্তি কামনা করেন। দাহ করার ৭ দিন পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় পিছিয়ে পড়া রাখাইনদের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে রাখাইন-সেবা সংস্থা। যেমন– রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, রাখাইন কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ মারমা-রাখাইন সংঘ পরিষদ ও পটুয়াখালী রাখাইন বৌদ্ধ যুব সংস্থা প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বসবাসরাত রাখাইনদের শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বম্ (বোম) [Bawm]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত এক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম বম। 'বম্' অর্থ বন্ধন। জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্মিলিতভাবে সম্পাদনের প্রয়াস থেকে এ নামের উৎপত্তি। বমরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি, সদর থানা এবং রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়িসহ মোট ৭০টি গ্রামে বম্দের বসবাস। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। তারা তিনটি গোত্রে বিভক্ত। যথা– শানক্লা, লসিং ও ডইট্রাং। বম্ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। পিতা পরিবারের প্রধান এবং তার সূত্র ধরেই সন্তানদের বংশ গণনা করা হয়। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির বৃহৎ অংশের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তাদের সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার-সালিশ এবং বিবাদ মীমাংসার জন্যে নিজস্ব সামাজিক রীতি রয়েছে। এই রীতির মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে তারা 'বম্ কাস্টমারি ল' গ্রন্থের নির্দেশিকা মেনে চলে।

তাদের প্রধান পেশা জুম চাষ। কিন্তু ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া জুম-জমির অভাব, বনভূমি উজার এবং খ্রিষ্টান মিশনারির প্রভাবে বম্রা অন্যান্য পেশায় ক্রমশ

আত্মনিয়োগ করছে। অনেকে মৎস্য চাষ, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

অতীতে বম্‌রা প্রকৃতি পূজারি ছিল। বর্তমানে খ্রিষ্টান মিশনারি ও ধর্মযাজকদের প্রভাব ও প্রলোভনে অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এখনো তাদের সমাজ-আবরণে রয়ে গেছে বেশ কিছু আদিম সংস্কৃতি। বাঁশ নৃত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। পরিবেশ থেকে নেয়া এই নৃত্যানুষ্ঠান বম্‌দের জীবনের অপরিহার্য অংশ। কোনো আনন্দ বা উৎসবের আয়োজন নয়, এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বম্ পরিবারের শোক ও দুঃখের দিনগুলোতে। সেই দিনগুলোতে পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা ও সাহস প্রদানের প্রধান রীতি হিসেবে আয়োজিত হয় বম্ নৃত্য। তবে ধর্মীয় উৎসবসহ অন্যান্য আনন্দের আয়োজন প্রচলিত আছে বম্ সমাজে।

নদী থেকে দূরে দুর্গম পাহাড়ের ওপরে ঘর করতে পছন্দ করে বম্‌রা। কিন্তু তেমন জায়গা বর্তমানে দুর্লভ। এখন তারা পাহাড়ের বুকে বাঁশ, খুঁটি দিয়ে মাচাং করে তার ওপর ঘর নির্মাণ করে।

বম্‌দের স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে। কিন্তু সেই ভাষার লেখ্যরূপ এখনো পাওয়া যায় নি। তবে তাদের ভাষায় মানুষেরও বজ্রের সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে উপকথা ও পুরাণ কাহিনী রয়েছে।

অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো বম্ সমাজেরও মৃতদেহ সৎকারে কিছু রীতিনীতি রয়েছে। এই সমাজে কোনো বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হলে মৃতদেহ স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। তারপর শবের মুখমণ্ডল রং করা হয়। চুলে গুঁজে দেওয়া হয় ভীমরাজ পাখির পালক। এরপর তাকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে কবরে দাফন করা হয়।

অন্যান্য নৃগোষ্ঠীদের থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে পড়া বম্‌রা বর্তমানে খ্রিষ্টান মিশনারির সহায়তায় আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠছে।

রাজবংশী [Rajbansi]

বাংলাদেশে বসবাসকারী ভোট-বর্মি গ্রুপের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রাজবংশী। নামকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তারা নিজেদেরকে রাজবংশ থেকে উদ্ভূত বলে অভিহিত করে। তবে এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আবার কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক ও ইতিহাসতাত্ত্বিক রাজবংশীদেরকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করলেও রাজবংশীরা তা মানতে নারাজ। এদেশে এদের বসবাস রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায়। জানা যায়, দূরাতীতকালে হিমালয় অঞ্চল বা বক্ষ্মপুত্র উপত্যকা থেকে তারা বাংলাদেশে এসেছিলেন।

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ স্যার রিজলির মতে, রাজবংশীদের দেহাবয়ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কিছুটা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হলেও এরা দ্রাবিড়ীয় ও বৃহত্তর বোডো (Bodo) জাতির অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ রাজবংশী বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। অনেকে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে এবং হিন্দু দেব-দেবী শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রমুখের পূজার পাশাপাশি প্রাচীন কৃষি-সংস্কৃতির প্রতীক 'বারিধারা' ব্রত কিংবা উর্বরতা ও প্রজননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রত বা অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। এরা প্রকৃতির উপাসকও বটে। পাহাড়, নদী, অরণ্য ও মৃত্তিকার পূজা করে। আবার ঘর-সংসারের মঙ্গল কামনায় বাস্তু দেবতা 'বাহাস্তো' এবং শস্য রোপনের পূর্বে বলিভদ্র ঠাকুরের পূজা করেন। এদের প্রধান উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– বৃষ্টি কামনায় 'হুদুমা', হেমন্তকালে ধান রোপনের সময় 'গোচরপনা' এবং নতুন ফসল তোলার সময় 'নবন খাওয়া' ও 'ধানের ফুল দেখা'। রাজবংশীদের উৎসব ও পূজা-পার্বণে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যগীতোৎসব আদিবাসীসুলভ সামাজিক প্রথারূপে ব্যাপক আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়।

রাজবংশীদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কপিল, গৌতম, কৌশিক, পরাশর ও শাণ্ডিল্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রাজবংশীদের। পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুত্র সন্তান।

এই সমাজে জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন চাষাবাদ ও মাছ ধরা। অধুনা শিক্ষার সম্প্রসারণে কেউ কেউ বিভিন্ন চাকুরিতে নিয়োজিত হয়েছে। এছাড়া রাজবংশী মেয়েরা হস্ত ও কুটির শিল্পে অবদান রাখছে। এদের বিবাহ ব্যবস্থায় সাঁওতাল ও ওঁরাওদের বিবাহরীতির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিধবা বিবাহ, পুনর্বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজে প্রচলিত। তবে বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে দেবরের দাবি অগ্রগণ্য।

বিকৃত বাংলায় কথা বলে রাজবংশীরা। এ ভাষা মূলত স্থানিক তথা আঞ্চলিক ভাষার এক মিশ্ররূপ। নিজেদের ভাষায় রচিত নানা রকম কাহিনী, উপকথা, ছড়া, ধাঁধা, লোকসংগীত ও নৃত্যগীতের প্রচলন রয়েছে সমাজে।

সামাজিক প্রথানুসারে শবদেহ সংকারে দাহ করার রীতি প্রচলিত রাজবংশী সমাজে। দাহ করার মাসখানেক পরে শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তবে কলেরা কিংবা বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মৃতদেহ কবর কিংবা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত।

হাজং [Hajang]

মঙ্গোলয়েড প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এক নৃগোষ্ঠী হাজং। 'হা' অর্থাৎ-পর্বত, 'জো' অর্থাৎ ব্যবহার এবং 'ং' অর্থাৎ অধিবাসী অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী অর্থে হাজং শব্দটির উদ্ভব। পর্বতরাজ্য আসামের প্রাচীন অধিবাসী হাজংরা কয়েক

শত বছর আগে বাংলাদেশে আসে এবং গারো পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে এদেশে তাদের বাস ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায়। এছাড়া, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আসাম রাজ্যে তাদের বসবাস রয়েছে।

বাংলাদেশে বসবাসকারী হাজংরা প্রধানত দুটি গোত্রে বিভক্ত–পরমার্থী ও ব্যায়্যাবছড়ি। সামাজিক মর্যাদায় পরমার্থীরা উচ্চাসীন, হিন্দু বৈষ্ণবদের সাথে তুলনীয়। তারা গরু, শূকরের গোশত ও মদ স্পর্শ করেন না। অন্যদিকে, ব্যায়্যাবছড়িরা শক্ত শ্রেণীর সাথে তুল্য। সামাজিক রীতিনীতি, আহার্য ও পানীয়ে তারা গারোদের পর্যায়ভুক্ত।

ধর্মবিশ্বাসে হাজংরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন শিব ঠাকুর। এর পরে স্থান দুর্গা দেবীর। পূর্বে হাজংরা ঋগ্‌বেদের ঋষিকে প্রধান দেবতা বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করতেন। এই ঋষি ও তার স্ত্রী চরিপাক স্বর্গে বাস করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে সেই ঋষি ও স্ত্রী চরিপাক কালক্রমে শিব ও দুর্গায় পরিণত হয়েছেন বলে কারো কারো অভিমত। হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো প্রাপ্তবয়স্ক সকল হাজং পুরুষ পৈতা ব্যবহার করেন। এরা পুনঃজন্মে বিশ্বাসী। বৎসরান্তে ফুল-চন্দন দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদকে পূজা করা ও তাতে স্নান করে পবিত্র হওয়া তাদের অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের বাইরেও হাজংরা বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রথানুষ্ঠান পালন করে। এসব অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যগীতের আয়োজন থাকে। বর্তমান বাস্তবতায় কোনো কোনো দরিদ্র হাজং খ্রিষ্টান মিশনারির প্ররোচনায় ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হাজংদের। পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার কেবল পুত্র সন্তানদের। কন্যাদের বিয়ের সময় কিছু ঐচ্ছিক সামগ্রী দেয়া হয়ে থাকে। বিয়ে ব্যবস্থায় ব্যায়াবছড়ি ও পরমার্থী উভয় গ্রোত্রের মধ্যে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। বিয়ের পর মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরে। বাল্যবিবাহ ও প্রাক-বিবাহ যৌন সম্পর্ক প্রায় অনুপস্থিত হাজং সমাজে। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত। এদের বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি অনেকটা সাঁওতাল ও মুরংদের মতো।

খুবই সহজ-সরল জীবনধারায় অভ্যস্ত হাজং সম্প্রদায়। তেমনি সহজ ও সারল্য তাদের বসতবাড়ি। অধিকাংশ হাজংদের ঘর ছনের তৈরি এবং একটু অবস্থাসম্পন্নদের ঘর টিন অথবা ইটের তৈরি। তবে সব হাজংদের বাড়ি-ঘরেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লক্ষণীয়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদও অতি সাধারণ। পুরুষের ইতিহ্যবাহী প্রধান পরিচ্ছদ একখণ্ড ধুতি। আর হাজং মেয়েরা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান

টুকরো কাপড় কোমরে জড়ায় এবং গামছার মতো কাপড় দিয়ে বুক বেঁধে তার ওপর ব্লাউজ পড়ে। অধিকাংশ হাজং নিজেদের তৈরি কাপড়ই ব্যবহার করে।

বেশিরভাগ আদিবাসীদের মতো হাজংদেরও প্রধান পেশা কৃষি। ধানও অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি তারা কার্পাসও চাষ করে থাকে। এছাড়াও জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ এবং কাঠ পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করার রেওয়াজও রয়েছে তাদের মধ্যে। তবে অর্থনৈতিক কাঠামো তেমন মজবুত নয়।

হাজংদের নিজস্ব ভাষা আছে ; তবে নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তাদের ভাষাকে টিবেটু বর্মন ভাষা বলে অভিহিত করেছেন ড. গ্রিয়ারসন। বাংলাদেশে বসবাসরত হাজংদের ভাষায় অহমিয়া ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। রয়েছে আঞ্চলিক বা স্থানিক ভাষার প্রভাব। বর্তমানে হাজংদের কেউ কেউ আধুনিক শিক্ষায় আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং শিক্ষাগ্রহণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হচ্ছেন।

আদিবাসীসুলভ সারল্য, সততা, অতিথি পরায়ণতা হাজং সমাজে প্রবল। শঠতা, ভণ্ডামি, মিথ্যচার ইত্যাদি বিরল। তাই এর বিরুদ্ধে হাজংরা ইতিহাসের অনেককাল ধরে অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে। হাতিখেদা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন তার সাক্ষ্য বহন করে।

গারো (Garo)

মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত এক আদিবাসী নৃগোষ্ঠী গারো। বাংলাদেশে এদের বসবাস প্রধানত ময়মনসিংহ গারো পাহাড় এলাকায়। এছাড়া ঢাকা, রংপুর, জামালপুর, সিলেট, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার ও বগুড়া জেলায় গারোদের কিছু অংশের উপস্থিতি রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, গারো পাহাড়ের নামানুসারে সেখানকার আদিবাসীদের নাম গারো হয়েছে। আবার নৃবিজ্ঞানী বোনার্জিসহ অনেকের মতো 'গারো জনগোষ্ঠীর নামানুসারেই গারো পাহাড়ের নাম ; গারো পাহাড়ের নামানুসারে গারোদের নাম নয়।' গারো পাহাড়ের মোট আয়তন ৩ হাজার বর্গমাইল। পূর্বে এটি বঙ্গ ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল। ব্রিটিশদের বিভাজন নীতিতে এটি পরবর্তীতে ভারতের আসাম প্রদেশের সাথে সংযুক্ত হয়। আর তাই বর্তমান বাংলাদেশী গারোদের একটি বিরাট অংশের বাস আসাম প্রদেশে।

বসবাসকৃত স্থানের ধরনের ওপর ভিত্তি করে গারো জাতিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ; যথা– ক. আচ্ছিক খ. লামদানী। যারা সাধারণত পাহাড়ের পাদদেশে ও সমতল ভূমিতে বাস করে তাদেরকে বলা হয় লামদানী গারো। অন্যদিকে, যারা পাহাড়ের গরিব অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চলে বাস করে তাদেরকে আচ্ছিক গারো বলে। উভয় শ্রেণীর মধ্যে আবার একাধিক গোত্র বিভক্তি রয়েছে।

ছায়াঘেরা, মায়াময়, সবুজবেষ্টিত আদিম অরণ্যসঙ্কুল নিসর্গ ভূমির গারোদের আদিম পেশা ছিল জুম চাষ ও পশুপালন। ১৯৫০ সালের সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে জুম চাষের বদলে হাল চাষে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তারা। ধানসহ বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি ফলমূল ও শাক-সবজির চাষ করে গারোরা। কেউ কেউ ফলমূল ও কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অধুনা কুটির শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে তাদের কেউ কেউ। সুপ্রাচীন সময় থেকে গারো সম্প্রদায় বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ের অভ্যন্তরে নিজস্ব ভৌগোলিক বলয়ে স্বপ্রথা শাসিত সমাজে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করত। সেই সমাজ ছিল রাজাহীন, গোত্রনিয়ন্ত্রিত ও গোত্রপতি শাসিত। কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের পরবর্তী সময়ে এই সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে ব্যক্তি মালিকানা প্রথা ও মুদ্রা বাজার অর্থনীতির। ফলে, সমাজে পারস্পরিক অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে।

গারো পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক নেংটি, ধুতি ও পাগড়ি। সাধারণত কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে গোষ্ঠী প্রধানরা পাগড়ি পরে থাকেন। আর মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক লুঙ্গিসদৃশ কাপড় ও ব্লাউজ। কেউ কেউ অবশ্য শাড়ি, সেলোয়ার-কামিজ পরে। পছন্দের খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে প্রধান ভাত, মাংস ও নিজেদের তৈরি মদ। জানা যায়, এক সময় তারা কলাগাছের বাকল পুড়িয়ে এর ছাই সাবান ও লবণের কাজে ব্যবহার করত। আজো কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ খাবারে ছাই ব্যবহার করে থাকে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গারোদের। পরিবারের সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী স্ত্রী। তাদের বংশধারায় সম্পত্তি প্রাপ্তি থেকে শুরু করে সবকিছু মাতার কাছ থেকে মেয়েতে বর্তায়। তবে স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হলেও স্বামী তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন। স্ত্রী বা সন্তানের মা তার বলিষ্ঠ কন্যা বা মনোনীত অন্য কন্যাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেন। তাকে বলা হয় 'নকমা' বা 'নক্রম'। প্রচলিত রীতি অনুসারে পরিণত বয়সে 'নকমা'কে তার আপন মামাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তবে এই সমাজে সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ, তাদের মতে, সমগোত্রের যুবক-যুবতিরা পরস্পরের ভাইবোন। উল্লেখ্য, গারো সমাজে ১০টি গোত্র রয়েছে। প্রথা ভঙ্গ করে কেউ বিয়ে করলে সে সম্পত্তি থেকে বেওয়ারিশ ও গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়। বিয়ের পর স্বামীকে স্ত্রীর ঘরে বসবাস করতে হয়।

গারো সমাজে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত। তবে, পণ বা যৌতুক প্রথা ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার নেই।

পারিবারিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে গারোরা। এর মধ্যে পাহাড়ি বা আচ্ছিক গারোদের ঘরগুলো মাচাং-য়ের ওপর নির্মিত হয়। সমতলভূমি গারোদের ঘরগুলো মাটির দেয়ালবেষ্টিত কাঠ, বাঁশ ও ছন দিয়ে তৈরি করা হয়। অবস্থাসম্পন্ন কেউ কেউ টিন অথবা ইটের তৈরি ঘরও নির্মাণ করে থাকে।

'সাংসারেক' গারোদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও সংস্কারসমৃদ্ধ কৃষিভিত্তিক ধর্মের নাম। তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। কিন্তু পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের কোনো বালাই নেই। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ফসল সংরক্ষণ, রোগ-জরা ও আত্মার কল্যাণে তারা বারো মাসে তেরো কিংবা তারও বেশি ব্রত ও পর্ব-পার্বণ পালন করে। রয়েছে তন্ত্রমন্ত্র ও ইন্দ্রজালের প্রভাব। যারা এইসব অলৌকিক বিষয়ে দক্ষ তারা সমাজে সম্মানের সাথে সমাসীন। সর্বপ্রাণবাদিতার লক্ষণও গারোদের মধ্যে লক্ষণীয়। তাই তারা চন্দ্র, সূর্য, বৃষ্টি, নদী, ফসল প্রভৃতিতে প্রাণ আরোপ করে দেবতা জ্ঞান করে থাকে।

ফসল ঘিরে গারোদের বেশিরভাগ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদি পালিত হয়। যেমন– আগাল মাকা, গিচিপং, মিচিল তাতা, রংচুগালা, ওয়াংগালা ইত্যাদি। তবে অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও উৎসবমুখর অনুষ্ঠান 'ওয়াংগালা' বা 'ওয়াংলা'। মুখ্যত দুটি উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই উৎসব– ১. এই পূজায় ফসলাদি পঙ্গপাল ও কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা পায় ; ২. জরা, ব্যাধি ও মহামারী থেকে নিজেদের সুরক্ষা হয়। এই অনুষ্ঠান উদযাপনের সময় সমগ্র গারো সমাজ আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

গারোদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ সব ধরনের অনুষ্ঠানেই বাদ্য-নৃত্যগীত অপরিহার্য। একেক অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয় একেক ধরনের নৃত্য। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নৃত্য হল– দেকেরু সুয়া, আষাঢ়ে রুরুয়া, কিলপুয়া, দোরে পাতা, রোদিলা, দালাং রুরুয়া ইত্যাদি। এদের গানের সুর অনেকটা বাংলা লোক-সংগীতের অনুরূপ। নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দলবদ্ধ হয়ে নাচগান করে গারোরা। কেউ কেউ গারোদের নাচ-গানের ধরনকে মালয়েশিয়ার পার্বত্য আদিবাসী ওরাং আসলিদের নাচ-গানের সাথে অদ্ভুত মিল রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

গারো জাতির ভাষার নাম মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা। এই ভাষা দুইভাগে বিভক্ত ; যথা–১, অচ্ছিক কুচিক ২.মান্দি কুচিক। পাহাড়ি গারোদের ভাষা অচ্ছিক কুচিক, আর সমতলী গারোদের ভাষা মান্দি কুচিক। উভয় ধরনের ভাষাতেই প্রচলিত রয়েছে গারোদের নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচন, শ্লোক-ধাঁধা, ছড়া-গান, উপকথা-পুরাকথা প্রভৃতি। রয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকার মতো পালাগান। অধিকাংশ গারোই দ্বিভাষী, মাতৃভাষার বাইরে বাংলায় কথা বলতে সক্ষম। আসামে বসবাসরত ভারতীয় গারোরা রোমান হরফে লিখে থাকে। বাংলাদেশে বসবাসকারী গারোদের মধ্যেও খ্রিষ্টান মিশনারিগুলো রোমান হরফ প্রবর্তনের প্ররোচনা করেছিল। কিন্তু গারোরা বর্তমানে বাংলা অক্ষরে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করছে।

জাতি হিসেবে নিজেদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার কঠোর প্রয়াস লক্ষণীয় গারোদের মধ্যে। বহু লোভ-লালসার পরও শতাধিক বছরের ঐকান্তিক প্রয়াসেও গারো সমাজে খ্রিষ্টান ধর্মের বিস্তার ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার দরুন তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হলে অভাবি,

দরিদ্র অধিকাংশ গারোই আর্থিক সুবিধার জন্যে খ্রিষ্টান ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশী গারোদের মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশই খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু এরপর নতুন ধর্মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে না গারো আদিবাসীরা। কয়েক প্রজন্ম পর আজও তারা মহান শ্রদ্ধায় পালন করে পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য অর্জিত আচার-অনুষ্ঠানসমূহ।

শ্রেণীহীন আদিম সাম্যবাদী গারো সমাজে চাষাবাদ হত সমবায় পদ্ধতিতে, কেনা-বেচা হত বিনিময় প্রথায়। ব্রিটিশ শোষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সমাজে সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা কার্যকর হয়। বেড়ে যায় সামাজিক বৈষম্য। এই সময়ে আবার সূত্রপাত পুঁজিবাদী প্রথার। মালিকানা ছাড়া অথবা মালিকের অনুমতি ছাড়া জমিতে চাষ করা অসম্ভব। তখনই ধর্মের ফাঁদে ফেলা হয় আদিবাসী গারোদের। অর্থাৎ খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করলেই তার নামে অঢেল জমি দলিল করা সম্ভব। অবশ্য খ্রিষ্টান মিশনারির সহায়তাতেই গারো সমাজে আজ প্রশংসনীয় শিক্ষার হার। আর আধুনিক বিস্তার ও ব্যাপকতায় গারো সমাজ গ্রহণ করেছে কৃষিতে নতুন পদ্ধতি, জীবিকায় বাজার অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের স্বীকৃতি– যা গারোদের বর্তমান বিশ্বের সাথে টিকে থাকতে ও সমৃদ্ধি সাধনে সাহস যোগায়।

ওঁরাও (ওরাং) [Oraon/Urao/Urong]

বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়াও রাজশাহীতে বসবাসকারী এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওঁরাও। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এরা আদি-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর উত্তর-পুরুষ। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, বাংলাদেশে ওঁরাওদের আগমন মুঘল মুসলিমদের আমলে। এদের একটি বিরাট অংশের বাস ভারতের ছোট নাগপুরে। কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত ওঁরাও সমাজ। যেমন–টিরকি, ইখার, কিরপুত, লাকরার, কুঁজরা, গোধিয়ার, খাখার, মিনজি, কেরকেটা ইত্যাদি। কৃষিকর্মই তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন ওঁরাও নারী-পুরুষ ক্ষেতমজুর বা কুলি-কামিন হিসেবেও কাজ করে। অতি সাধারণ পোশাকেই পরিবৃত্ত থাকে তারা। নারীরা শাড়ি-ব্লাউজ এবং পুরুষরা নেংটি, গামছা, ধুতি ও লুঙ্গি পরিধান করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উল্কি চিহ্নও ধারণ করে সৌন্দর্য প্রিয়তার অংশ হিসেবে।

ওঁরাওরা সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি উপাসক। তবে সেই উপাসনায় প্রথম স্থান পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান 'ধরমেশ'-এর। তাঁর অবস্থান সূর্যে হওয়ায় সূর্যকে ঘিরে পালিত হয় বিভিন্ন পূজা-অর্চনা। প্রধান দেবতা ছাড়াও রয়েছে গ্রাম দেবতা, গার্হস্থ্যদেবতা, ফসলের দেবতা, অরণ্য দেবতা, রোগ-বালাইর দেবতা প্রমুখ। তাদের সম্মানেও পূজা পালিত হয়ে থাকে। ওঁরাওদের কোনো কোনো ধর্মীয়

অনুষ্ঠান হিন্দুদের পূজা প্রথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরেও ওঁরাও সমাজে কোনো কিছু ব্রতানুষ্ঠান ও উৎসব প্রতিপালিত হয়ে থাকে। যেমন–ওঁরাও নারীদের বারোমাসী বা বারোমাস্যা, অনাবৃষ্টিতে উদযাপিত 'সরহুল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ব্রতের প্রচলন রয়েছে এই সমাজে।

নৃত্যগীতবাদ্যের প্রবল অনুরাগী ওঁরাও সম্প্রদায়। কেবল বিনোদন নয়, এ যেন জীবনেরই অঙ্গ। আর তাই প্রায় সব ধরনের ব্রত ও উৎসব আয়োজনেই নৃত্যগীতের সহযোগ থাকে। ঝুমুর গানে ওঁরাওদের ভক্তিবাদিতার পাশাপাশি যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ ফুটে ওঠে। ফুঠে ওঠে লৌকিক প্রেমাকাঙ্ক্ষাও। সাঁওতালদের 'আখড়া' বা গারোদের 'দেকাবাঙ'র মতো ওঁরাও সমাজে রয়েছে 'ধুমকুরিয়া'। কয়েকদিন একত্র বসবাসের ব্যবস্থা সম্বলিত এই জায়গায় তরুণ-তরুণীরা পরস্পর মেলামেশার সুযোগ পায় এবং তখন থেকেই তারা তাদের ভবিষ্যত জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করে। এদের বিবাহ পদ্ধতি অনেকটা সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের বিবাহ ব্যবস্থার মতোই। ওঁরাও সমাজে বিধবা বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, একাধিক বিবাহ প্রচলিত। কিন্তু পরবর্তী বিয়েতে বরপণের পরিমাণ অনেক বেশি। তবে একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখার রীতি নেই। রীতি নেই বাল্যবিবাহ ও জোরজবরদস্তিমূলক বিবাহের।

নিজস্ব ভাষা রয়েছে ওঁরাওদের। সেই ভাষার নাম 'কুরুখ' ভাষা। স্থানিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এ ভাষায় বাংলা ভাষার বহু শব্দ ও বাক্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রাচীন প্রথায় বহুদিন আবদ্ধ থাকায় পিছিয়ে পড়া ওঁরাও সমাজ পেরুতে চায় সেই পুরনো পরিক্রমা। সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছেন আধুনিক শিক্ষা ও জীবন ব্যবস্থার প্রতি। সভা-সমিতি ও উন্নয়নমূলক সংস্থা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তার প্রয়াস পাচ্ছে ওঁরাও আদিবাসীরা।

সাঁওতাল (Santal)

বাংলাদেশের অবাঙালি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী। এদেশে এদের বাস মূলত রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায়। এছাড়া ভারতের রাঢ়বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় রয়েছে সাঁওতালদের এক বৃহৎ অংশের বাস। কারো কারো মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী সাঁওতালদের সংখ্যা ৩ লাখের ওপরে। মত পার্থক্য রয়েছে তাদের নামকরণ নিয়ে। স্ক্রেফস্রাডের মতে, 'সাঁওতাল' কথাটির উদ্ভব ঘটেছে, 'সুঁতার' (Soontar) শব্দ থেকে। আবার কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক মনে করেন– তারা দীর্ঘদিন সাঁওত বা সামন্তভূমিতে বসবাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল।

দেহগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী সাঁওতালদের প্রি-দ্রাবিড়িয়ান বলে চিহ্নিত করেন। আবার কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী আদি-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর উত্তর-পুরুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা। একই সাথে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষিসংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে স্বীকৃত সাঁওতালরা।

সাঁওতালরা সাধারণত ছোটো ছোটো মাটির ঘর তৈরি করে বসবাস করে। ঘরগুলো বেশিরভাগই এক দরজা বিশিষ্ট। তবে অন্যান্য এলাকায় ঘরগুলোতে জানালা না থাকলেও রাজশাহী এলাকায় তাদের নির্মিত ঘরে জানালা থাকে। তবে তাদের ঘরদোর, বাড়ির আঙিনা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। ঘরগুলোর ছাউনিতে দেয়া হয় খড় ও ছন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টালি, এবং অধুনা শিক্ষিত ও ধনী সাঁওতালদের বাড়িতে টিনের ঘর ও ইটের দালান দেখা যায়।

কৃষিভিত্তিক সমাজ আদিবাসী সাঁওতালদের। এটাই তাদের জীবিকা-নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কিছু আর্থ-সামাজিক কারণে বর্তমানে দারিদ্র্য অধিকাংশ সাঁওতালদের নিত্যসঙ্গী। অধিকাংশই এখন ভূমিহীন সাঁওতাল কৃষক। তাই তারা বাধ্য হয়ে অল্প অর্থের বিনিময়ে চা-বাগান বা অন্যত্র শ্রম বিক্রয় করে। তাদের কেউ কেউ মাটি কাটা, মোট বহন বা অনুরূপ দিনমজুরির কাজে নিজেদের নিযুক্ত করছে। এরা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত।

যাপিত জীবনের মতোই সহজ-সাধারণ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। সাঁওতাল নারীরা খাটো মোটা রং-বেরঙের শাড়ি পরে। মাথায় খোঁপায় ফুল গোঁজে এবং বিচিত্র অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে পছন্দ করে। আর পুরুষেরা পরে ধুতি বা গামছা। অবশ্য শিক্ষিত সাঁওতালরা সব ধরনের আধুনিক পোশাকে আকৃষ্ট থাকে।

ধর্মবিশ্বাসের, দিক দিয়ে সাঁওতালরা মূলত সর্বপ্রাণবাদী। অবশ্য 'ঠাকুর জিউ'কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করে তারা। তাদের প্রধান দেবতা সূর্য (সিংবোঙ্গা)। এরপর উপাস্য পর্বত দেবতা মারাংবুরু। তাদের বিশ্বাস, আত্মা অমর এবং সেই অনৈসর্গিক আত্মাই (বোঙ্গা) সব ঐহিক ভালোমন্দ নির্ধারণ করে। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো সাঁওতালরাও উৎসবপ্রিয় জাতি। প্রায় প্রতি ঋতুতেই রয়েছে নৃত্যগীত সহযোগে পার্বণ বা উৎসব। যেমন–ফাল্গুনে উদযাপিত হয় স্যালসেই উৎসব, চৈত্র মাসে বোঙ্গাবোঙ্গি, বৈশাখে জোম, পৌষে সোহরাই উৎসব। এর মধ্যে 'সোহরাই' তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এর প্রধান উদ্দেশ্য। তাদের আরেকটি উৎসবের নাম 'পহা' বা ফুলকোটার উৎসব। প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই থাকে বাদ্যযন্ত্র গীত ও সাঁওতালদের দলীয় নৃত্য।

সকল সাঁওতাল সমাজেই 'আখড়া' নামক একটি ব্যবস্থা থাকে, সেখানে সাঁওতাল তরুণ-তরুণী বিবাহ-পূর্বে স্বাধীন মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে পরস্পরের জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে পারে। সমাজে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত। তবে সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, সাঁওতাল সমাজে ১২টি গোত্র বিভাগ রয়েছে।

এখনো ঐতিহ্যবাহী পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত সাঁওতাল সমাজে। পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হয় 'মাঝি হাড়াম'। তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী এবং সাঁওতাল সমাজের নিয়ন্ত্রক। বিচারকার্য পরিচালনা ছাড়াও তিনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্বণিক অনুষ্ঠানের পরিচালনা বা সহায়তা করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সাঁওতালদের। তবে নারীরাও এখানে প্রায় সমান মর্যাদায় সমাসীন।

অস্ট্রিক বা অস্ট্রো এশিয়াটিক গোত্রের ভাষা সাঁওতালদের। অনেক দিন বাঙালিদের সাথে বসবাস করায় বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রভাব বিরাজমান। অধিকাংশ সাঁওতাল বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। ভাষাগত সংস্কৃতি বিধায় লিখিত সাহিত্যের বিকাশ না ঘটলেও লোকগীতি, লোককাহিনীসহ অন্যান্য সমৃদ্ধ মৌখিক সাহিত্য রয়েছে। এর প্রধান কারণ– সাঁওতাল ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা না থাকা। বর্তমানে খ্রিষ্টান মিশনারি ও বিশেষত বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় সাঁওতাল সমাজে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটছে। এখন অনেকেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরিসহ বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করে নিজেদের সমাজ এগিয়ে নিতে তৎপর হচ্ছে।

মণিপুরী (Manipuri)

ঐতিহ্য লালিত এক অনন্য জাতিগত সম্প্রদায় মণিপুরী। এক সময় ঢাকার তেজগাঁ, মীরপুর, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেটে বসবাস ছিল মুণিপুরীদের। মীরপুরের 'মণিপুরী পাড়া' তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু কালক্রমে তাদের বাস বৃহত্তর সিলেটে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় বাস করে মণিপুরীগণ। এছাড়াও ভারতের মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, আগরতলাসহ বার্মাতেও মণিপুরীদের এক বিরাট অংশের উপস্থিতি রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মণিপুরীদের আদি নিবাসে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত যুদ্ধ-সংগ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে মণিপুরীদের একাংশ বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে অভিবাসিত হয়। প্রথম সেই অভিবাসন শুরু হয় রাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময় (১৭৬৪-১৭৮৯) থেকে।

বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীদের সমাজ দুটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত– ১, মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া ও ২. মণিপুরী মৈতৈ। বলা হয়ে থাকে– এদের মধ্যে মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়ারা ককেশীয়, অর্থাৎ ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত ; অন্যদিকে মণিপুরী মৈতৈরা

মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। আবার কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানীর মতে, মণিপুরীরা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর তিব্বতি-বর্মি পরিবারের কুকি-চীন গোত্রভুক্ত। তবে তাদের মধ্যে আর্য ও অন্যান্য রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে।

সমতলবাসী হওয়ায় অধিকাংশ মণিপুরীর প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এছাড়াও কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, দিনমজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরিতেও মণিপুরীদের অনেকে আত্মনিয়োগ করেছে। তাদের বাড়ি-ঘরের ধরন সাধারণ বাঙালি অধিবাসীদের ঘরবাড়ির মতোই। সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান। পিতৃতান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত মণিপুরী সমাজে। পিতাই পরিবারের প্রধান এবং তার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছেলে সন্তানদের। অবশ্য পুত্র সন্তান না থাকলে সে ক্ষেত্রে মেয়েরাই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়।

জীবনযাপন পদ্ধতির মতোই সহজ-সরল পরিচ্ছদ মণিপুরীদের। অধিকাংশ মণিপুরী নিজেদের তাঁতে উৎপন্ন পোশাকই পরিধান করে। সাধারণত পুরুষেরা ধুতি, পাঞ্জাবি, পাহাতি এবং মেয়েরা ঘাগড়াসদৃশ লাহিং ও ব্লাউজসদৃশ আহিং ও ওড়না পরে। কেউ কেউ সালোয়ার কামিজ ও সাধারণ শাড়ি পরতে পছন্দ করে। তবে নারী-পুরুষ উভয়ই বহিরাঙ্গণে চলাফেরার সময় আধুনিক পোশাকাদি ব্যবহার করে। সাধারণ আহার্যের মধ্যে একমাত্র মাংস ছাড়া সবই খায় মণিপুরীরা।

বিবাহ ব্যবস্থায় সাধারণত অভিভাবকদের প্রাধান্য অনেকটা প্রবল মণিপুরী সমাজে। এই সমাজে অন্তর্বিবাহ প্রচলিত : বহির্বিবাহ স্বীকৃত নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈদের মধ্যে বিবাহের চল্ আছে। নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহের সময় পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষকে অবশ্যই অনাত্মীয় হওয়ার বিষয়টি খেয়ালে রাখা হয় ; রক্তগত বা বংশগত আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। যৌতুক বা পণপ্রথার প্রচলন নেই এই সমাজে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমিত হয়ে থাকে। তবে মণিপুরীদের বিবাহ রীতির লিখিত কোনো দলিল না থাকায় হিন্দু আইনের বিধিবিধান পালিত হয়ে থাকে। বিধবা বিবাহ স্বীকৃত এই সমাজে।

ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে মণিপুরীদের অধিকাংশ সনাতন ধর্মের চৈতন্য ধারার প্রতি বিশ্বাসী। অবশ্য ১৮ শতকে সনাতন ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তারা 'অপকপা' ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাদের কিছু অংশ আবার মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তবে ধর্মান্তরিত মণিপুরীরা তাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়নি। তাই তারা নবীন ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি পূর্বধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে থাকে। নিত্যকার ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনে গ্রাম-ভিত্তিক মন্দির ও মসজিদ রয়েছে মণিপুরী সমাজে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুমহান অধিকারী মণিপুরী সমাজে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' রীতিকে ঘিরে বছরের বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত হয় বিভিন্ন পর্ব-পার্বণ ও উল্লাস-উৎসব। সর্বাপেক্ষা বড়ো ও আনন্দমুখর উৎসব কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়

রাসোৎসব। এছাড়া রথযাত্রা, পৌষ সংক্রান্তি, হোলি উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি বা বিষ্ণু পার্বণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মণিপুরী সংস্কৃতির সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা মণিপুরী নৃত্য (মণিপুরী ভাষা 'জাগই')। এই নৃত্যে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার মাধ্যমে বৃত্ত বা উপ-বৃত্ত সৃষ্টি করা হয়। নানা ধরনের মণিপুরী নৃত্য রয়েছে ; এগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়– ১, ফোক বা লোক নৃত্য ও ২. ক্লাসিক বা ধ্রুপদী নৃত্য। লোকনৃত্যের মধ্যে রয়েছে লাইহারাওবা, খাম্বা-থইবি, মেইবি-জাগই, লেইশাম জাগই ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, রাসা নৃত্য হচ্ছে গোষ্ঠ লীলা, উদূখল, মৃদঙ্গ ইত্যাদি ধ্রুপদী শ্রেণীর নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে মণিপুরী সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন রাসা নৃত্য। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র (১৭৬৪-১৭৮৯) রাসা নৃত্য উদ্ভাবন করেন এবং ১৭৭৯ সালের কার্তিকের পূর্ণিমায় এটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। কোমলতা ও নম্রতা মণিপুরী নৃত্যের প্রধান বিশেষত্ব। রুচিশীল শারীরিক ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে নর্তক-নর্তকী ফুটিয়ে তোলে সৌন্দর্যের ও নিবেদনের আকুতি। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে মণিপুরী নৃত্যের অবদান অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, মণিপুরীদের ভাষা মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের তিব্বতি-বর্মি উপ-পরিবারভুক্ত এবং কুকি-চীনা দলভুক্ত। ভাষার মতোই প্রাচীন এদের সাহিত্য। এযাবৎ প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য নিদর্শন 'ঔগরি' নামক একটি গীতি কবিতা। এর রচনাকাল ৩৩ সাল। প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া গিয়েছে অষ্টম শতকের একটি তামার পাত্রে। পরবর্তীকালে বিপুল বিস্তার ও চর্চার কারণে সাহিত্য একাডেমিসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে মণিপুরী সাহিত্য। হোমার, সফোক্লিস, শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাহিত্যের পাশাপাশি এ ভাষায় অনূদিত হয়েছে মহাভারত, গীতা, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থাবলি। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মণিপুরী সাহিত্য নতুন যাত্রা লাভ করে। পরবর্তীতে আরো একাধিক সাহিত্য সংগঠন আত্মপ্রকাশিত হয়ে মণিপুরী সাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি মণিপুরী সাহিত্য পত্রিকা উল্লেখের দাবি রাখে, যেমন–দীপন ভিটা, মেইরা, ইপম, সাজিবু, মিটকাপথোপকা ইত্যাদি। এছাড়া কবিতাসহ সাহিত্যের অন্যান্য শাখা নিয়েও কাজ করছে মণিপুরী সাহিত্য সংগঠনগুলো। প্রাচীন মণিপুরী হরফ বা বর্ণমালারও মণিপুরী সাহিত্যের মতো বিশেষত্ব ও স্বকীয়তা রয়েছে। তাদের প্রতিটি অক্ষরের নামকরণ করা হয়েছে মানবদেহের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সাদৃশ্য রেখে। কিন্তু ১৮ শতকে রাজা গরিব নেওয়াজের আমলে বঙ্গদেশে নবপ্রবর্তিত সনাতন চৈতন্যবাদের সঙ্গে মণিপুরীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মণিপুরী হরফ বা অক্ষরে বাংলা বর্ণমালায় প্রতিস্থাপিত হয়। সমৃদ্ধি ও প্রাচীনত্বে অনন্য মণিপুরী ভাষা ভারতের সংবিধানে লাভ করেছে একটি জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা।

বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো অনেকটা পিছিয়ে থাকা মণিপুরী সম্প্রদায় আধুনিক বিশ্বের সাথে সংযোগ গড়ে তুলতে নিজেদের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন গড়ে তুলেছে। মণিপুরী সমাজের বিভিন্ন সংস্কার সাধন ও সঠিক নির্দেশনায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে সংগঠনগুলো বর্তমানে প্রশংসার দাবিদার হয়ে উঠছে।

বিদ্রোহীসত্ত্বা যুগে যুগে

সভ্যতার আদিম অবস্থায় যখন সমাজ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটেনি তখনো ব্যক্তি মানুষের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল। এই আদর্শের নির্মিতিতে ভূমিকা রেখেছে আবেগ-অনুভূতি। বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, একইসাথে যা তাকে দিয়েছে সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্টতার মহিমা। এরপর মানুষের আদর্শের সাথে তার একাত্মতায় জন্ম নেয় এক আবেগ মহাসমুদ্রের। আর তার সেই আবেগের ধ্বনিত রূপই ভাষা। "এই হল ভাষা যার সাথে মানুষের মনের ও মস্তিষ্কের গভীর সংযোগ। এক একটি পরিবেশে মন ও মস্তিষ্কের কাঠামোগত বিভিন্নতার কারণে ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। তাই দেখা দিয়েছে একই দেশে একাধিক ভাষা। কিন্তু এক দেশে একাধিক ভাষা সত্ত্বেও একজাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। এর দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় অসংখ্য। আমাদের পাশের দেশ ভারত এর বৃহত্তম দৃষ্টান্ত।"*

ভাষাগত দিক বিবেচনায় বাঙালি জাতি এই দেশের সবচেয়ে বড়ো জাতি। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীদের এক তৃতীয়াংশ ভারতের বাসিন্দা ; তারা নিজেদেরকে ভারতীয় জাতিসত্তার অঙ্গীভূত বলে গর্ববোধ করে, যদিও সেখানে ভাষাগত বিবেচনায় তারা অপ্রধান।

তেমনিভাবে এইদেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী ভিন্ন ভাষাভাষীর অধিকারী হলেও এই গোষ্ঠীর জাতিসত্তায় তাদের চেতনার অংশগ্রহণ রয়েছে।

নদী-নালা বিধৌত বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ রাষ্ট্র। সমৃদ্ধ সমতল ভূমি ছাড়াও খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট ময়মনসিংহে রয়েছে ছোটো ও বড়ো পাহাড় ও পাহাড়ি ভূমি। ভূমিগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও এই ভিন্ন দুই এলাকার অধিবাসীদের জীবন-যাপন প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ এবং আরও বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ উভয় এলাকায় বসবাসরত ছোটো ছোটো নৃগোষ্ঠীদের জীবনাচরণ। আর তাই তাঁদের

---

* ভাষা বনাম জাতিসত্তা, আবদুল মান্নান তালিব, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংকলন, ভাষাদিবস সংখ্যা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক আ. জ. ম. ওবায়দুল্লাহ। পৃষ্ঠা ৭৬।

সামগ্রিক সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশের ইতিহাসও সেভাবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখতে পারে।

কেবল ঐতিহাসিক নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সমৃদ্ধতর সুজলা-সুফলা এই দেশের প্রতি বিশ্বের আগ্রাসী বিভিন্ন জাতির বিশেষ আকর্ষণ ছিল, যার পরিণতিতে নানাবিধ উপলক্ষে এখানে তাদের আগমন বা আগ্রাসন। ইতিহাসতত্ত্ববিদদের মতে এভাবেই আসীন ঘটে দ্রাবিড়, আর্য, শক, হুন, আরব, পাঠান, মোঘল ও ইয়োরোপীয়দের। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়, আর্য, হুন, শক, মোঘল, পাঠান, আরব, তুর্কি, ইরানি প্রভৃতিরা এদেশবাসীর সাথে নানা সূত্রে মিশে গিয়েছেন। অন্যদিকে, ধর্মান্ধতা হোক, জাত্যাভিমান হোক বা শোষণের সুবিস্তৃত পরিকল্পনাই হোক ইয়োরোপীয়রা এদেশকে কখনো শোষণযন্ত্রের বাইরে কিছু ভাবে নি। আর তাই এদের বিরুদ্ধেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এদেশের সকল জাতিগোষ্ঠীর বিবেক।

বাংলাদেশে বসবাসরত চাক্‌মা, মারমা, চাক্ প্রভৃতি ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর উৎপত্তিগত ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে। কারো কারো মতে, সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনমানুষরা ছিলেন এদেশের আদি অধিবাসী বা পূর্বপুরুষ। পক্ষান্তরে, পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রায় সবাই বহিরাগত উদ্বাস্তু। আবার কারো কারো মতে, বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কেউই এদেশের আদিম অধিবাসী নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মা, ভারত, চীন থেকে তাড়া খাওয়া বা অভিমানে চলে আসা মানুষ তারা। নিঃসন্দেহে এ ধরনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য তাদের ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ যোগায়। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধতা নিয়েও জাতিগোষ্ঠীগুলোর যে ইতিহাস প্রচলিত রয়েছে, তাতে তাদের যে সাধারণ পরিচয়টি অসাধারণত্ব নিয়ে ফুটে ওঠে তা তাদের লালিত সংগ্রামী চেতনা।

বাংলাদেশের ছোটো ছোটো নরগোষ্ঠীগুলোর বসবাসের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি)। অংশটি আয়তনে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ হলেও জনসংখ্যার হিসেবে সেখানে মাত্র দুই শতাংশ লোক বাস করে এবং তার মধ্যে ৪০ ভাগ বাঙালি এবং বাকি ৬০ ভাগ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী।

সম্পদ, সম্ভাবনা আর ভৌগোলিক তাৎপর্যের কারণে সুদূর অতীত থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল শাসকদের একটি বিবাদের বিষয়। এ কারণে এ অঞ্চলের আধিপত্যে বারবার হাতবদল হয়। এক মতানুসারে, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা যুজা রূপা (বিরা রাজা) ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাকে পরাজিত করে রাঙামাটিতে রাজধানী স্থাপন করেন। মাঝের শতকগুলোতে আরো

কয়েকবার ক্ষমতা বদলের পর পুনরায় ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা আসীন হন আধিপত্যে। এরপর বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রবর্তনে এই অঞ্চলও মুসলিম সালতানাতের অধিভুক্ত হয়। মূলত পনেরো শতকে মোঘল শাসনামলে প্রথম এই অঞ্চলের সাথে সভ্য জগতের যোগাযোগ ঘটে।

সপ্তদশ শতক তখন এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন চাকমা রাজা ধামানা। সে সময় তার পুত্র যুবরাজ ধরস্যার সাথে মোঘল যুবরাজ শাহ সুজাউদ্‌দৌলার কন্যার বিয়ে হয়। জনশ্রুতি রয়েছে– সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধে আওরঙ্গজেব বিজয়ী হয়ে সিংহাসন দখল করলে যুবরাজ শাহ সুজাউদ্‌দৌলা আত্মরক্ষার্থে সদলবলে আরাকানের দিকে এসে চাকমা রাজা ধামানার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সখ্য স্থাপনের নিদর্শন স্বরূপই সুজার কন্যার সাথে ধামানার পুত্রের বিয়ে দেয়া হয়। ১৬৬১ সালে পিতার মৃত্যু হলে তিনিই রাজা হন। মোঘল কন্যার গর্ভজাত সন্তান বিধায় স্বামী ও স্ত্রীর সম্মতিক্রমে ধরম্যার পুত্রের নাম রাখা হয় মঙ্গল্যা। মঙ্গল্যার মা মোঘল হওয়ায় সে সময় চাকমা নারীদের মৃতদেহ দাহ করার পরিবর্তে ইসলামী রীতি অনুসারে কবর দেয়া হত এবং চাকমা মেয়েদের নামের শেষে 'বিবি' শব্দের বিকৃতি 'বী' যোগ করা হত।

সেই থেকেই চাকমা সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুসলিম নাম গ্রহণ করা শুরু করেন। আর সেই রীতি অনুসারে রাজা মঙ্গল্যার দুই পুত্রের নাম রাখা হয় জুবল খাঁ ও জল্লাল খাঁ। ১৭১২ সালে রাজা মঙ্গল্যার মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুবল খাঁ। জুবল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জল্লাল খাঁ রাজা হন। তিনি রাজা হওয়ার পর ১৭১৪ সালে সমতলবাসীদের সাথে পার্বত্যবাসীদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে মোঘল প্রশাসককে ১১ মণ কার্পাস তুলা দিতে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু মোঘল প্রশাসকগণ পার্বত্য অঞ্চলকে তাঁদের নিজেদের অধীনস্থ অঞ্চল হিসেবে 'কার্পাস মহল' নাম দিয়ে কর আদায় করতে চাইলে চাকমা রাজা কর দিতে অস্বীকার করে মোঘল নবাবদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে চাকমা রাজা দুটি বড়ো কামানসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেন। ১৭১৫ সালে জল্লাল খাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ ফতে খাঁ মোঘল নবাবদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৩৭ সালে ফতে খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শেরমুস্ত খাঁ রাজা হন। তাঁর রাজ্যসীমা উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে শঙ্খ নদীর মধ্যবর্তী স্থান, পূর্বে লুসাই পাহাড় (কুকিরাজ্য) ও পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা-ট্রাঙ্ক রোড) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন মোঘল আমলের শেষ রাজা। ১৭৫৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিতে লালায়িত বেনিয়াদের মধ্যে ইয়োরোপীয় পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা'র ১৪৯৭ সালে কালিকী বন্দরে পৌছানোর মধ্য

দিয়ে এই উপমহাদেশের উচ্ছলতায় ঘুণপোকার আবির্ভাব ঘটে। শর্তাধীন ব্যবসার অনুমতি নিয়ে তারা চালাতে থাকে শতবর্ষব্যাপী একচেটিয়া বাণিজ্য ও লুণ্ঠনযজ্ঞ। তাদের দেখাদেখি লুণ্ঠনকর্মে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়ে একে একে আগমন ঘটে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি, জার্মানি প্রভৃতি জাতির, যাদের মধ্যে শক্তিতে সেরা ছিল ফরাসিরা। আর বুদ্ধি ও চাতুর্যে ইংরেজরা। তাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বেনিয়াদের দ্বারাই সূচিত হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক মর্মস্পর্শী অধ্যায়।

জানা যায়, ১৬৪৪ সালে দক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সম্রাট শাহজাহানের এক কন্যার পরনের কাপড়ে হঠাৎ আগুন ধরে গিয়ে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ব্যথিত সম্রাট দেশের সকল নামি চিকিৎসকদের ব্যর্থতার পর ইংরেজ কুটিরের এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক ছিলেন ইংরেজ বাণিজ্য পোত। Hope well'র সার্জন মি. গ্যাব্রিল বাউটন। তাঁর চিকিৎসায় শাহজাদী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করায় গুণমুগ্ধ সম্রাট ইংরেজি বণিকদেরকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার দিয়ে এদেশে তাদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেন। অচিরেই সে সুযোগ পরিণতি পায় মোঘলদের সমূহ বিনাশে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্র কাননে ঘটে সেই ঐতিহাসিক বিনাশলীলা।

১৭৫৭ তে-ই মারা যান চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁ। নতুন রাজা দমেণ্ডক-পুত্র শুকদেব। তাঁর আমলে ১৭৬১ সালে মোঘল নবাব মীর কাশিম এই অঞ্চলের শাসনভার ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করেন। নিছক ব্যবসার উদ্দেশে এদেশে আসা শোষক ইংরেজরা এরপর এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর আরোপ করতে থাকে করের বোঝা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অত্যাচার। এরই পরিণতিতে ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষ, যার করাল গ্রাসে প্রাণ হারায় এদেশের এক-তৃতীয়াংশ অভুক্ত মানুষ। অন্যদিকে, সহজ-সরল দেশবাসীর নির্বাক বোধে জাগে রুদ্রের কঠোরতা। যার ঐতিহাসিক প্রকাশ ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন, শমশের গাজী বিদ্রোহ (ত্রিপুরা), মসলিন কারিগর বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ প্রভৃতি।

মোঘল সাম্রাজের অধীনে চাকমাসহ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় এক রকম স্বাধীন-ই ছিলেন। সে সময় অবাঙালি প্রধান পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজারা মোঘল সম্রাটকে বাৎসরিক খাজনা হিসেবে সামান্য তুলা প্রদান করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু ইংরেজ অধিগ্রহণের পরেই পাল্টে যায় দৃশ্যপট।

ইংরেজ বেনিয়ারা এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্জন করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের কার্পাস মহল বাইরের লোকের কাছে ইজারা দেয়। ইজারাদাররা তাদের অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলে চাষীদের শোষণ করতে থাকে। বাজার কাঠামোয় প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করে ইজারদাররা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর তুলা চাষীদের কাছ থেকে কয়েকগুণ বেশি তুলা রাজস্ব হিসেবে আদায়

করে, যা প্রায় লুণ্ঠনের সমপর্যায়ে পড়ে। রাজস্ব হিসেবে এই মাত্রাতিরিক্ত তুলা আদায় চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন করে তোলে। কেননা, রাজস্ব হিসেবে দেয় তুলার পরিমাণ উৎপাদনের তুলনায় এত বেশি ছিল যে, উদ্বৃত্ত তুলার বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা সম্ভব হত না। এভাবেই ব্রিটিশ বেনিয়া, কোম্পানির অসৎ কর্মচারী, ফড়িয়া শ্রেণী, মধ্যসত্ত্বভোগী দালালদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে রুখে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষ। ১৭৭৬ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা দৌলত খাঁ, তাঁর বিচক্ষণ ও সাহসী সেনাপতি রনু খাঁ ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার না করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৭৭ সালে ব্রিটিশরা ক্যাপ্টেন লেনের নেতৃত্বে প্রথমবার এবং ১৭৮০ সালে ক্যাপ্টেন টারমারের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার চাকমা রাজ্য আক্রমণ করে এবং বলাবাহুল্য, দু'বারই সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনারা সহজ-সরল অশিক্ষিত নরগোষ্ঠীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপর আরো সূক্ষ্মভাবে সুচতুর ব্রিটিশরা নিপীড়ন চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

আবার জেগে ওঠে সহজ মানুষদের সুপ্ত শক্তি। সেই শক্তির নিশানা উড়িয়ে এরপর দৌলত খাঁর সুপুত্র জানবক্স খাঁ। ১৭৮২ সালে দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তিনিই হন রাজা। পিতার মতোই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে শোষণের প্রতিকার খুঁজতে ইংরেজদের সাথে তিনবার (১৭৮৩, ১৭৮৪, ১৭৮৫) যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে পরপর দুবার পরাজিত হয় ইংরেজরা, যা অত্যাচারী শাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৮৩২ সালে রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪৪ সালে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন রানি কালিন্দী। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তিনিও ছিলেন খড়গহস্ত। কথিত আছে, তৎকালীন শাসনকর্তা ক্যাপ্টেন লুইন রানির সাথে পর পর দুবার দেখা করতে চাইলেও রানি অসম্মতি জ্ঞাপন ও অপমান করেছেন। ব্রিটিশ শাসনকর্তা ক্যাপ্টেন লুইনের সাথে চাকমা রানি কালিন্দীর খারাপ ব্যবহারের সূত্র ধরে বিভক্ত হয় বৃহৎ চাকমা রাজ্য। তাঁর দর্প ও অহঙ্কার চূর্ণ করে ক্ষমতা খর্ব করার অভিপ্রায়ে ১৮৭০ সালে চাকমা রাজ্যের উত্তরাংশ পৃথক করে পৃথক মং সার্কেল এবং দক্ষিণাংশ পৃথক করে পৃথক বোমাং সার্কেল সৃষ্টি করেন। কালিন্দী ক্যাপ্টেন লুইনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলে তা নাকচ করা হয়। ১৮৭১ সালে লুইন কর্ণফুলী নদীর জলকর দাবি করেন। ১৮৭৩ সালে পরিবার প্রতি ৪ টাকা জুমকর নির্ধারণ করা হয়। ১৮৭৫ সালে সমতলভূমিতে চাষের কর চালু হয়। এভাবেই ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে পার্বত্য আদিবাসীদের স্বাধীনতা, ক্রমশ আদিবাসীদের সহজ-সরল আদিম সাম্যবাদী সমাজে ঢুকে যায় অমানবিক সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী পচা আবর্জনা, যার স্পর্শে নষ্ট হয় আদিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক গতিধারা। এর প্রভাবে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্বে ভাঙন ঘটে। শক্তিশালী

সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে যায়। সামাজিক অস্থিরতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও ব্রিটিশদের জটিল আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে সরল আদিবাসীরা তাঁদের জমি-জমা হারান, অর্থনৈতিকভাবে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েন।

মোঘল শাসনামলে চাকমা রাজারা রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাই সে সময়ে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হলেও তা থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ইস্যুতে কোনো বড়ো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু অনিবার্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হল ব্রিটিশ আমলে। সে সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে ব্রিটিশদের সাথে চাকমাদের মোট ৫ বার যুদ্ধ বাঁধে। তখন চাকমাসহ অন্যান্য আদিবাসীদের প্রবল চাপে পড়ে এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে সুচতুর ইংরেজরা আদিবাসী পাহাড়িদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট 'CHTS Regulation 1900 Act' জারি করে। চাকমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের পর ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রথম সংগঠন 'চাকমা যুবক সমিতি'। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের উন্নতিকল্পে গঠিত হলেও এ থেকেই অঙ্কুরিত হয় জাতীয় জাগরণের বীজ। ১৯১৮ সালে গঠিত হয় 'চাকমা যুবক সংঘ'। রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এর অবদানও অসীম।

তৎকালীন চাকমা নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ১৯২০ সালে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'। দীর্ঘ ১৯ বছর কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জড়িত থাকার পর ১৯৩৯ সালে এতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাইলফলক স্বরূপ। এই সংগঠনই সর্বপ্রথম তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির বিপরীতে নব্য-শিক্ষিতদের প্রগতিশীল রাজনীতিতে সংগঠিত করার শুভ সূচনার সূত্রপাত ঘটায়। এমনকি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চাকমাদের সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'ই সামন্ত প্রভু, তাঁবেদার ব্রিটিশ সরকার ও বুর্জোয়াদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে সহজ-সরল আদিবাসী জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে থাকে।

ব্রিটিশদের বিষাক্ত ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত বাংলার এক নিভৃত নিসর্গময় গ্যারো পাহাড়ও জ্বলে উঠেছিল সেদিন বিপুল বিদ্রোহে পার্বত্যবাসী চাকমাদের মতন, অথবা তার চেয়েও বেশি। সেখানেই বাস গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের। ইতিহাসবিদদের বিচারে তারাই ছিলেন এই এলাকার মূল অধিবাসী বা আদিবাসী। ধীরে ধীরে প্রবেশ বাঙালির, তারও পরে শোষক সম্প্রদায় ইংরেজদের। আর এই শেষোক্ত প্রজাতির অনুপ্রবেশেই অবিরাম বয়ে চলা সহজ-সরল আদিবাসী জীবনযাত্রায় প্রকটিত হতে থাকে অসদাচার ও

মানবীয় বিপর্যয়। প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহীসত্তা সেদিন সহজ-সারল্য ভেদ করে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল পরিণামে প্রায় একশো বছর ধরে। পাগল বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, হাতিখেদা বিদ্রোহ প্রভৃতি নামে পরিচিত সেসব।

ইংরেজ-পূর্ব আমল পর্যন্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শাসক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অনুকূল অবস্থাতেই ছিলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতির পরিণতি ঘটে ইংরেজ শোষক সম্প্রদায়ের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে। তখন এই অঞ্চলে জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হত। আর তুলা ছিল চাষীদের প্রধান উৎপাদিত ফসল। ক্রমশ তুলার পাশাপাশি ধানের চাষ প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রচলন ছিল না মুদ্রা ব্যবস্থার। তাই অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্যে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের বিনিময়-প্রথার শরণাপন্ন হতে হত। আর এর সুযোগ নিত স্থানীয় মহাজন ও জমিদার শ্রেণীর লোকজন। প্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রী নিতে গেলে মহাজন বা ব্যবসায়ীকে দিতে হত তার চেয়ে বহুগুণ মূল্যের তুলা বা ধান। প্রথমদিকে বোধোদয় না ঘটলেও ক্রমশ আদিবাসীরা বুঝতে পারে তারা প্রতারিত ও শোষিত হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা বন্ধ করার জন্যে পোষা হত পাইক-পেয়াদা, যারা প্রতিবাদীর কঠোর শাস্তি বিধানের নিমিত্তে নিয়োজিত থাকত। এছাড়াও বিভিন্ন অবৈধ করারোপ করত ইংরেজ প্রভুভক্ত জমিদাররা। তার মধ্যে একটি হল– রাস্তা চলাচলের জন্যে কর প্রদান। জমিদারের লোকেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে আদিবাসী জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করত। সেই সময়ের এক পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে করম শাহ নামক এক ফকিরের। সময়টা ১৭৭৫ সাল। উদার মানবতাবাদী করম শাহ ইংরেজ জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে একত্র-সন্নিবেশ ঘটান আদিবাসীদের।

গারো পাহাড় অঞ্চলের একটি স্থানের নাম সুসং দুর্গাপুর। গারো ছাড়াও সেখানে হাজংরা বাস করেন। সেই এলাকার জমিদারদের একটি বড়ো ব্যবসা ছিল হাতিধরা। যে ফাঁদ পেতে হাতি ধরত তাঁরা তাকে বলা হত খেদা। অত্যন্ত লাভজনক এই পেশায় ব্যবহার করা হত স্থানীয় হাজংদের। নিতান্ত বাধ্য হয়ে খেদায় কাজ করতে গিয়ে অনেক হাজং হাতির সাথে লড়াই করে মারা যেত। এই করুণ বাধ্যবাধকতা থেকে জন্ম হয় বিদ্রোহের। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মনা সর্দার। তার ডাকে হাজংদের পাশে এসে দাঁড়ায় আদিবাসী গারোরা। শুরু হয় প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ, লড়াই। জমিদাররা এই বিদ্রোহকে স্তিমিত করার জন্যে মনা সর্দারকে হাতির পায়ের নিচে ফেলে হত্যা করে। কিন্তু না, এতে কাটা ঘায়ে লবণের ছিটার মতন বিদ্রোহের আগুনে যোগ হয় বদলা নেওয়ার বিক্রমতা। নেতার হত্যার জবাব দিতে গারো ও হাজংরা বারমারির মাঠে জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে, স্বজাতিদের সমর্থনে জমিদারদের হাজং মাহুতরা হাতি ছেড়ে দেয়। উভমুখি প্রতিকূলতায় জমিদারের বাহিনী পালিয়ে যায়।

এই জয় বিদ্রোহীদের মনোবল আরো বাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা আক্রমণ করে সুসং দুর্গাপুরের জমিদার বাড়িতে। সেখানেও জমিদারদের পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জয়লাভ ঘটে বিদ্রোহী আদিবাসীদের। এই হাতিখেদা বিদ্রোহের আগুন এমনি করে জ্বলেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর। জীবন দিয়েছে বেতগড়া গ্রামের রাতিয়া হাজং, খেনকির মঙ্গলা, লেগুনীর বিহারি, হদিপাড়ার বাঘা, কান্দা গ্রামের জগ ও বিজয়পুরের মোল্লা হাজং। তাঁদের রক্তের মহিমায় গারো পাহাড় অঞ্চলের হাজং আদিবাসীরা সেদিন পেয়েছিলেন মুক্তির মন্ত্রণা।

অন্যদিকে, গারো পরগণায় বাৎসরিক পনেরো হাজার একশত ছিয়াশি টাকার পরিবর্তে ৪০ হাজার টাকা কর ধার্য করা হয়। এই বাড়তি কর আদায়ে অমানুষিক আচরণ করা হয় গারোদের সাথে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে প্রকাশিত হয় বিদ্রোহে। সেই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন করম শাহের শিষ্য টিপু। ১৮২৫ সালে তার নেতৃত্ব ও পরামর্শে গারোরা কুড় প্রতি (এক কুড় = ৩ বিঘা) ৪ আনার বেশি খাজনা দিতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় গড়দড়িপা নামের একটি গ্রামে গারো প্রজাদের মুখোমুখি হয় জমিদার বাহিনী। জমিদার বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এরপর বিদ্রোহীরা শেরপুর এলাকা দখল করে। বিদ্রোহীদের এই বিজয়ে বিচলিত হয়ে যায় ইংরেজ শাসকরা। তাই তারা জমিদারদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। জমিদার ও ইংরেজ উভয় বাহিনীর সাথে লড়াই করে বিদ্রোহী গারোরা প্রতিটিতেই জিতে যায়। অবস্থা খারাপ দেখে ইংরেজ শাসক আরো বেশি সৈন্য মোতায়েন করে। ফলে, পরবর্তী যুদ্ধে হার হয় গারোদের। দীর্ঘ ২ বছর নিয়ন্ত্রণে থাকা শেরপুর এলাকা পুনরায় জমিদারদের দখলীভূত হয় ১৮২৭ সালে। একইসাথে ধরা পড়েন গারো নেতা টিপু। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত টিপু ১৮৫২ সালে জেলেই মারা যান। তারপরও হাল ছেড়ে দেননি আদিবাসী গারোরা। টিপুর জেলে থাকা অবস্থায়ই ১৮৩৩ সালে গুমানু সরকার ও উজির সরকার নামে টিপুর দুজন শিষ্যের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহের সেই আগুন নেভাতে গ্রেপ্তার করা হয় গুমানুকে। কিন্তু আন্দোলনের চাপে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার। ছাড়া পেয়ে গুমানু উজিরকে নিয়ে বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে কৃষকরা জমিদারের কর ও পাট্টা দেয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে, অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘর্ষ। সংঘর্ষে হেরে গিয়ে পালিয়ে যায় জমিদারের লোকজন।

এরপর গারো বিদ্রোহে নতুন নেতৃত্বের আগমন ঘটে। এগিয়ে আসেন জামুক পাথর ও দোবরাজ পাথর। জামুক-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহী গারোরা শেরপুর, কড়ৈবাতি ও নালিতাবাড়ির জমিদার বাড়ি আক্রমণ করেন। বিদ্রোহ দমনে শেরপুরে পাঠানো হয় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট গ্যারেটকে। বিদ্রোহীরা তার বাংলো আক্রমণ করলে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচেন তিনি। এই ব্যর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ

জমিদার ও ইংরেজরা নতুন উদ্যোগে বিরাট পুলিশ ও বরকন্দাজ বাহিনী পাঠায় নালিতাবাড়িতে। সেটা ছিল বিদ্রোহীদের অন্যতম ঘাঁটি। খবর পেয়ে বিদ্রোহীরা আড়ালে চলে যান এবং সুযোগ বুঝে হঠাৎ আক্রমণ করেন। এতে সরকারি বাহিনীর অনেক সৈন্য মারা যায় এবং অনেকে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ইংরেজরা দিশেহারা হয়ে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেনাবাহিনী পাঠায়।

১৮৬৬ সালের কথা। বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনাবাহিনী। কোনোভাবেই কুলোতে না পেরে ইংরেজরা নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারা জামুক ও দোবরাজসহ কয়েকজন নেতার বাড়িতে আগুন দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। কাজ হয় এতে। গরিব বিদ্রোহী নেতাদের অনেকে আত্মসমর্পণ করে ইংরেজদের নিকট। তবে জামুক ও দোবরাজের আর খোঁজ মেলেনি।

বিদ্রোহীদের এই পরাজয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে শোষক সম্প্রদায়। তারা পুনরায় আগের চেয়ে বেশি কঠোর হয়ে ওঠে গরিব প্রজাদের প্রতি। গারোদের ওপর ধার্য করা বাড়তি কর আদায়ে শাসকরা যেকোনো ধরনের অত্যাচার ও কূটকৌশলের শরণাপন্ন হতে থাকে। আবার শুরু হয় প্রতিবাদ। এক সময় গারোদের নেতা সরকারের পক্ষ নিলে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীরা তাকে সপরিবারে হত্যা করে এবং কর দেয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর ইংরেজ সেনাবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে বিদ্রোহীরা জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহীদের ধরতে না পেরে ইংরেজ সৈন্যরা তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ১৮৬৬ সালে সুসং জমিদার নতুন খাজনা ধার্য করে। বিদ্রোহীরা সেই সাধ্যাতীত খাজনা দিতে অস্বীকার করলে আবারও যুদ্ধ বাঁধে। বিদ্রোহীরা জমিদারদের ঘাটিতে আগুন জ্বালায়। আবার আসে ইংরেজ সৈন্য। সাথে পাঠানো হয় এক কুচক্রী কর্মচারী উইলিয়ামসনকে। সে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গারোদের একটি দলকে নিজের দলে টেনে নেয়। ফলে, পরবর্তী বিদ্রোহগুলোতে পরাজিত হতে থাকে বিদ্রোহী গারোরা। কিন্তু তারপরও তাদের সত্ত্বায় সুপ্ত দ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে পরবর্তী প্রজন্মের রক্তে, পরবর্তী ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে।

'হাজং বিদ্রোহ' নামক বিখ্যাত কবিতার জন্ম এখানেই, এই গারো পাহাড় এলাকায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হাজংরা ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী জমিদারদের ভগবানের মতোই ভক্তি করতেন। মেনে চলতেন মেনে নেয়ার মতো সবকিছুই। কিন্তু না, এক সময় তা আর মেনে নেয়া সম্ভব হয় না, বরং প্রতিবাদী স্বর জেগে ওঠে। ফসলি জমিতে নতুন প্রবর্তিত করের প্রতিবাদ করে তারা। পূর্বে এই জমিতে কর দিতে হত না। কিন্তু নতুন আইনে একর প্রতি এক টাকা থেকে তিন টাকা পর্যন্ত কর ধার্য করা হয়। লোকসংখ্যার তুলনায় এই এলাকায় জমির পরিমাণ ছিল

অনেক বেশি। তাই চারদিক থেকে অনেক মানুষ আসতে থাকে জমি সংগ্রহের উদ্দেশে। তাদের মতো মোটা সেলামি দিয়ে জমি নেওয়া সম্ভব ছিল না গরিব হাজংদের পক্ষে। তাই তাদের জন্যে 'টংক প্রথা' নামক নতুন প্রথা প্রবর্তিত হয়। খাজনা বা কর নয়, ফসল দিতে হবে বিনিময়ে। আর জমির মালিকানা থাকবে জমিদারের। একরপ্রতি ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দিতে হবে জমিদারকে, এমনকি জমিতে ফসল না ফললেও। আবার জমিদার চাইলে যেকোনো সময় জমি অন্যকে হস্তান্তর করতে। গরিব হাজং চাষীদের জন্যে এই প্রথা শোষণেরই নামান্তর। ইতোপূর্বে ১৮৯০ সালে অন্যায় খাজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন হাজংরা। দীর্ঘ দুই বছর পরে পরাজিত হয় হাজংরা। নিহত হয় কয়েকজন হাজং নেতা। গ্রেপ্তার হন প্রধান নেতা গোরাচাঁদ হাজংসহ চারজন নেতা। পরবর্তীতে তাঁদের তিনজনের মুক্তি মিললেও গোরাচাঁদ নিখোঁজ থাকেন। ১৯৩৮ সালে জেগে ওঠা টংক-বিদ্রোহ সেই অতীত সংগ্রামেরই নতুন বহিঃপ্রকাশ।

আদিবাসী হাজংদের টংক আন্দোলনের দাবিগুলো ছিল–

ক. টংক প্রথার উচ্ছেদ ;

খ. টংক জমিতে চাষীদের মালিকানা ;

গ. জমির গুণগতমান বিচার করে জমির খাজনা নির্ধারণ ;

ঘ. বকেয়া টংক মওকুফ ;

ঙ. জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং

চ. সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ।

ইতিহাসখ্যাত এই টংক আন্দোলনের নেতা ছিলেন মনি সিংহ, ত্যাগী দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট। তাঁর নেতৃত্বে গারো পাহাড় এলাকার ৫টি থানার অধিকাংশ গ্রামের কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে টংক প্রথার প্রতিবাদ আয়োজনে। অন্যদিকে, শোষক শ্রেণীর প্রয়াস চলতে থাকে আন্দোলন স্তিমিত করতে। কিন্তু তাতে আরও ব্যাপকতা পায় আন্দোলন। এতে ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে ওঠে। ভয় কেবল বিদ্রোহী কৃষকদের নয়, নেতৃত্বদানকারী কমিউনিস্টদেরও ; কৃষকরা কমিউনিস্ট মানসিকতা পেতে পারে। তাই ইংরেজ সরকার টংকের হার অর্ধেকের কমে নামিয়ে আনে এবং পদ্ধতিগতভাবে জমির মালিক হওয়ারও ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই সংশোধিত ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে আবার সংগঠিত হতে থাকে টংক আন্দোলন। সুসং দুর্গাপুরের মাঠ ভরে যায় নিপীড়িত হাজংদের বিক্ষুব্ধ উপস্থিতিতে। পুলিশ তাদের ভণ্ডুল করতে চাইলে আদিবাসীদের চাপে নিজেরাই বিতাড়িত হয়। সেই মুক্তির মিছিলে হাজং নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৪৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পুলিশ বিরিশিরির বহেরাতলী গ্রামে হাজং পল্লীতে তল্লাশী চালায়। দা-বটি নিয়ে প্রতিবাদ জানায় হাজং নারীরা। পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ কুমুদিনী হাজং নামক এক আদিবাসী নারীকে ধরে নিয়ে

যেতে থাকলে রাশিমনি নামের একজন হাজং নারী তাকে ছাড়িয়ে আনতে যায়। সরকারি পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। তিনিই টংক বিরোধী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ। তার পরে সুরেন্দ্র নামের আরেক হাজং শহীদ হন। তবুও উল্টো হাজংদের নামে মামলা হয়। সাজানো মামলা। মামলায় টিপসই নিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয় কয়েকজন গারোকে। কিন্তু তবুও কোর্টে গিয়ে মিথ্যা বলতে পারেনি গারোরা। তাই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এরপর আন্দোলন ধীরে ধীরে আরো তীব্র হতে থাকে। অন্যদিকে, জমিদার ও সরকারি পুলিশের ধরপাকড় ও অত্যাচার বেড়ে দ্বিগুণ। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে আন্দোলন।

উপমহাদেশীয় ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের সমৃদ্ধ ইতিহাসে মণিপুরী বিদ্রোহ এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৮৯০ সাল, সমগ্র বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ সূর্য দোর্দণ্ড প্রতাপে দেদীপ্যমান, ব্রিটিশ সিংহের আগ্রাসী থাবায় ক্ষত-বিক্ষত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ। কিন্তু তখনও বাংলার বাইরে পর্বত বেষ্টিত ক্ষুদ্র রাজ্য মণিপুর রক্ষা করে রেখেছে তার স্বাধীনসত্তা। যদিও ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টিতে ছিল রাজ্যটি। ব্রিটিশদের সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ এনে দেয় মণিপুর রাজ পরিবারের অন্তর্কলহ।

শূরচন্দ্র তখন রাজা। রাজার পক্ষপাতমূলক আচরণ ও অন্যান্য ব্যর্থতায় বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে রাজানুজদের মধ্যে। রাজপরিবারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা রাজকুমার ছিলেন টিকেন্দ্রজিৎ। তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত এক সফল বিদ্রোহের পরিণতিতে তিন সহোদরকে নিয়ে পালিয়ে যান রাজা শূরচন্দ্র। তাকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে বিতাড়নের অভিযোগ তুলে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য কামনা করে আবেদন জানায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ফলে, ব্রিটিশ খুঁজে পায় তার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ। রাজার পদে তখন আসীন ছিলেন রাজার বৈমাত্রেয় ভাই কূলন্দ্র এবং যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত হন টিকেন্দ্রজিৎ। সুযোগ পেয়ে ব্রিটিশ সরকার আসামের চীফ কমিশনারকে মণিপুরে পাঠায় যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে জীবিত, মৃত বা বন্দি করতে। আনুগত্য স্বীকারের শর্তে রাজা কূলচন্দ্রকে স্বীকৃতিদান, অন্যথায় বন্দি। সাথে ছিল লে. কর্নেল স্কীনের নেতৃত্বাধীন এক বিশাল গোর্খা বাহিনী। তারা ১৮৯১-র ২২ মার্চ মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছে। প্রথমদিকে রাজা চীফের সাথে আনুগত্যসূচক আচরণ করলেও পরবর্তীতে চীফের দাম্ভিক আচরণে তিনি প্রতিকূল আচরণ করেন। ফলে, এক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘর্ষ। ২৪ মার্চ সকালে ব্রিটিশ বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে টিকেন্দ্রজিতের বাসভবন। আগ্রাসী ব্রিটিশ বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে প্রাণ হারায় নারী, শিশুসহ অনেক মানুষ। ধ্বংস হয় পবিত্র মন্দিরের মূর্তি। এই আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব মণিপুরী সেনারা ব্রিটিশদের নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রচণ্ড পরাক্রমে দিনভর যুদ্ধ করে হটিয়ে দেয়

আগ্রাসী সৈন্যদের। এরপর তারা ব্রিটিশ রেসিডেন্সি ঘেরাও করে। রাত ৮টায় ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব আসলে তা কার্যকর করা হয়। একটু পরেই বিনা নোটিশে রাজপ্রাসাদে চলে আসে চীফ কমিশনার কুইন্টন, পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রিমউড, লে. কর্নেল স্কীন, লে. সিম্পসন ও এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কসিন্স। ব্যর্থ হয় তাঁদের আলোচনা। রাজা ও পর্ষদবর্গ চলে যান প্রাসাদাভ্যন্তরে। ব্রিটিশ কর্মকর্তারাও ফিরে যান রেসিডেন্সি অভিমুখে। কিন্তু ভবন-গেটের কাছে যেতেই সেখানে সমবেত ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধকামী মণিপুরীরা অতর্কিতে আক্রমণ করে বন্দি করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। এরই সাথে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্ম হয়। কয়েকদিনের অবিরত সংঘর্ষে পরাজিত ব্রিটিশবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় মণিপুর থেকে।

অস্তহীন সূর্যের ন্যায় শক্তিশালী ব্রিটিশ সিংহের সাথে অতিশয় ক্ষুদ্র শক্তির মণিপুরীদের এই বিষম আচরণ সহ্য করা সম্ভব হয়নি। শুরু হয় প্রবল শক্তির উন্মত্ত প্রদর্শন। এবার ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালিত হয়। দুর্জয় মনোবল ও অসীম সাহসিকতা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে পরাজিত হয় আদিবাসী মণিপুরীরা। পতন ঘটে মণিপুরী রাজধানী ইম্ফলের। রাজা কূলচন্দ্র, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ, সেনাপ্রধান জেনারেল থাঙ্গালসহ প্রধান অমাত্যবর্গ আত্মগোপন করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, মণিপুরী মীরজাফরখ্যাত খেলেন্দ্র সুবেদারের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁরা ধরা পড়েন। প্রহসনের বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে রাজা কূলচন্দ্রকে নির্বাসন আর টিকেন্দ্রজিৎ ও জেনারেল থাঙ্গালসহ কয়েকজনকে মৃত্যদণ্ড দেয়া হয়। ঘৃণা আর কলঙ্কসমৃদ্ধ ব্রিটিশ শাসনের সেই দিন ছিল ১৮৯১ সালের ১৩ আগস্ট।

উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে মণিপুরী পুরুষদের পাশাপাশি সমভাবে এগিয়ে এসেছিলেন মণিপুরী নারীরাও। কোমল হাতে উঠে এসেছিল কঠিন-কঠোর যুদ্ধাস্ত্র। মণিপুরী সমাজে প্রথম নারী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে ১৯০৪ সালে। ঐ বছরের ১৫ মার্চ তারিখে কে বা কারা রাতের আঁধারে আগুন লাগিয়ে দেয় এসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট'র বাংলো বাড়িতে। একইভাবে ৪ আগস্ট ভস্মীভূত হয় এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট'র বাংলো। ফলে, নির্দেশ জারি করা হয় আশপাশের ৪ গ্রামের সকল মণিপুরী পরিবারের পুরুষ প্রধানকে নিজস্ব সম্পদ ও শ্রম দিয়ে ভস্মীভূত বাংলো বাড়ি পুনঃনির্মাণের। মণিপুরী সমাজের প্রথানুসারে ব্রাহ্মণ ও রাজবংশাধিকারীরা কোনো কায়িক শ্রমে অংশ নেন না। কিন্তু ব্রিটিশদের এই নির্দেশে মুক্তি পাননি সেদিন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও রাজবংশের সদস্যরাও। ফলে, জনমনে ধূমায়িত হয়ে ওঠে তীব্র ক্ষোভ। নারীরাই প্রথম সেই ক্ষোভকে বিক্ষোভে পরিণত করে। সরকার তাদের দাবি-দাওয়া মেনে না নেওয়ায় চলতে থাকে খণ্ড খণ্ড সংঘাত ও সংঘর্ষ। এতে নেতৃত্ব দেন শামুহাত্তবী দেবি, মনিহাও'র

মা প্রমুখ। পরবর্তীতে মণিপুরী পুরুষরা যুক্ত হয় এই আন্দোলনে। পুলিশ ৫ জন পুরুষ নেতা ও ৭ জন নারী নেত্রীকে গ্রেপ্তার করলে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জিত হয় মণিপুরীদের। প্রথম সেই নারী বিদ্রোহের ৩৫ বছর পরে ঘটে দ্বিতীয় মণিপুরী নারী বিদ্রোহ। ১৯৩৯ সালে সংঘটিত সেই বিদ্রোহ 'নুপীলান' নামে খ্যাত।

১৯২৭ সাল। নতুন এক ধর্মমত নিয়ে আবির্ভূত হন যদুনাং নামের কাবুই সম্প্রদায়ের এক মানুষ। নতুন এই ধর্মমত নতুন প্রত্যাশা ভিড় জোগায় কাবুইদের স্বপ্নময় চোখে। তারা স্বপ্ন দেখতে থাকে– যদুনাং'র নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ব্রিটিশ বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হওয়ার। ফলে যদুনাং হয়ে ওঠেন অবিসম্বাদিত এক নেতা। তাঁর এই জনপ্রিয়তা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয় ব্রিটিশদের মনশ্চক্ষে। তাই রাজবিদ্রোহের অভিযোগ এনে বন্দি করা হয় যদুনাংকে। প্রহসনের সাজানো বিচারে ১৯৩১'র আগস্ট মাসে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু নেতার মৃত্যু হলেও নেভে না ধূমায়িত আগুন। নতুন নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন ১৯ বছরের কাবুই যুবতি যদুনাং'র শিষ্যা 'গাইদেলু'। তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ও আবেগঘন নেতৃত্বে ক্রমশ দুর্বার হয়ে ওঠে আন্দোলন। গাইদেলু পরিণত হন জনগণের রানি, আর শাসকদের দুঃস্বপ্ন। তাকে ধরতে অর্থসহ বিভিন্ন লোভনীয় পুরস্কার ঘোষিত হয়। ধরা পড়েন তিনি, জনরানি গাইদেলু। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তাঁর। কিন্তু তবুও কাবুইদের 'জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিত কিংবদন্তির এই রানির প্রভাব, প্রজ্ঞা ছড়িয়ে পড়ে নিপীড়িত সকল নারী-পুরুষের অন্তরে। ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের মণিপুরী নারীদের অন্তরেও। গাইদেলু'র চিরজাগ্রত সত্তার সংক্রমণে তারা প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন ১৯৩৫ সালের শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন। উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা দুটো মানস গঠনে সহায়ক হয়েছিল ১৯৩৯ সালের মণিপুরী-নারী আন্দোলনেও।

বিশ্বব্যাপী তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বাতাস। সেই মহাযুদ্ধের তপ্ত হলকায় দগ্ধ হয় মণিপুরের শ্যামল উপত্যকাও। প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে খাদ্যাভাব। কিন্তু সেই অবস্থায়ও যুদ্ধরত সেপাইদের জন্যে শাসক শক্তির নির্দেশে ধান, চাল মণিপুরের বাইরে পাঠানো হতে থাকে। আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভরে যায় মণিপুরীদের মনোজগত। নারীরাই প্রথম এগিয়ে আসে। ১২ ডিসেম্বর তারা সমাবেশ ও দরবার ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত নারীরা দরবার প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের দাবিনামা পেশ করে। প্রধান দাবি মণিপুর থেকে ধান-চাল পাঠানো তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। প্রেসিডেন্ট মি. শার্প তা মেনে নিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে তাঁকে টেলিগ্রাফ অফিসে আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে চতুর্থ আসাম রাইফেলস-র মেজর বুলফিল্ড এর নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈন্য টেলিগ্রাফ অফিসে এসে মি. শার্পকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। এতে অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘর্ষ। অসমসাহসী মণিপুরী

নারীরা অস্ত্রসমৃদ্ধ সেনাদের সাথে লড়ে যায় তাদের আদিম সব অস্ত্র নিয়ে। সেনাদের বন্দুকের বাঁটের আঘাতে আহত হয় অনেকে। গ্রেপ্তার করা হয় ১০ জন নারী নেত্রীকে। কিন্তু তবুও পিছু হটেনি তারা। প্রবল চাপের মুখে ইংরেজ শাসক তাদের দাবিনামা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বিজয় হয় মণিপুরী নারীদের। কিন্তু সেই বিজয় ছিল শুরুমাত্র। মণিপুরীদের জন্যে অপেক্ষা করছিল আরো বিপুল বিজয়। তাই আন্দোলন চলতে থাকে। বাকি দাবিসমূহ আদায় ও আটক নেতাদের মুক্তি কামনায় যথানিয়মে আন্দোলন চলতে থাকে এবং ক্রমশ তা রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে।

অন্যদিকে, আন্দোলনের ব্যাপ্তিতে ভীত হয়ে শাসকগোষ্ঠী বেছে নেয় দমন-পীড়নের পথ। ১৯৪০'র ৯ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় মণিপুরী নেতা হিজম ইরাবোৎ সিংহকে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মণিপুরীদের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। হাজার হাজার নারী-পুরুষের মিছিল ঘেরাও করে রাজপ্রাসাদ এবং রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি ও আন্দোলনের অবশিষ্ট দাবিনামা পূরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। প্রত্যুত্তরে সরকার পীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয় আরো ৯ জন বিশিষ্ট নেতাকে। কিন্তু তবুও ক্রমশ আরো বাড়তে থাকে আন্দোলনের ব্যাপ্তি। সীমানা পেরিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে। সেখানকার সচেতন জনগণ সভা-সমাবেশ এবং মিছিল করে মণিপুরী বিদ্রোহকে সমর্থন জানায় তারা নেতাদের মুক্তি ও দাবিনামা পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে আন্দোলনের সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাভব মানে শাসক সম্প্রদায়, মেনে নিতে বাধ্য হয় মণিপুরীদের দাবিনামা।

ব্যাপ্তি বিপ্লব অথবা বিদ্রোহের অন্যতম ধর্ম। তাই ভারতীয় মণিপুরীদের দোলা লাগে বাংলাদেশী মণিপুরীদের রক্তে। শত শত বছর পূর্বে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়ারা মণিপুর ত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে আসে। বাংলাদেশে তাদের বাস প্রধানত সিলেটের কমলগঞ্জ থানায়। থানার ভানুগাছের সবচেয়ে বড়ো তালুক ভানুবিলের বনজঙ্গল পরিষ্কার করে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। ভানুবিলের পশ্চিমে ঘোড়ামারা গ্রাম, দক্ষিণে তেতইগাঁও গ্রাম সেখানেও বাস মণিপুরীদের। তারা সবাই মণিপুরী বিষ্ণুপ্রয়া। ততদিন তারা নিজেদের তৈরি কৃষিক্ষেত করে খেয়ে-দেয়ে বাংলার চাষীদের মতনই আরাম-আয়েশে দিনতিপাত করছিল।

রীতিমতো খাজনা পরিশোধ করে আসছে ফী বছর। তবুও ঘটে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ। ব্যবসায়ী ব্রিটিশ সরকারের জমিদাররা অতিরিক্ত করের বোঝা চাপাতে থাকে গরিব কৃষকদের ওপর। তাও মেনে নিতে বাধ্য তারা। কিন্তু মানতে পারেনি প্রতারণা। ভানুবিলের জমিদার আলী আমজাদ খাঁর নায়েব ছিল রাসবিহারী। এই নায়েব প্রজাদের কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় খাজনা আদায় করত। কিন্তু অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই কোনো রসিদ দিত না। খাজনা আদায়ের রসিদ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে নিতান্তই উদাসীন ছিল গরিব নিরক্ষর সহজ-সরল কৃষকরা। রসিদ না থাকায় প্রজাদের জোত জমির প্রমাণ পেতে জমিদারের কাগজপত্রের ওপর নির্ভর করতে হত। জমিদার ইচ্ছা করলে এই কাগজপত্রগুলো বদলে দিতে পারতেন। কারো কিছু বলার থাকত না। এরই মাঝে চালাক নায়েব রাসবিহারী বহু প্রজার নামে খাজনা অনাদায়ী মামলা দায়ের করে। এতে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হয় না নিরীহ কৃষকদের। তারা জেগে উঠলে। সভায় শলা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হল– এই প্রতারণা সহ্য করা হবে না ; তারা আর খাজনা দেবে না। একজন মণিপুরীও খাজনা দিল না।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জমিদার আলী আমজাদ খাঁ একটি আপস রফা করার জন্যে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের ডাকলেন। শ্রীপঞ্চানন ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ শর্মা, মুসলিম মণিপুরী কাসেম আলী ছিলেন তাঁদের মধ্যে। জমিদারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হাওয়ায়, তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। কয়েদখানায় আটকে রেখে প্রচণ্ড মারধর করলেন কয়েকজন নেতাকে। কিন্তু তাতেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় সন্ধ্যায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন থেকে শুরু হয় প্রকৃত সংগ্রাম। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনপুষ্ট জমিদারের সৈন্য সাতোয়াল, অন্যদিকে ভানুবিলের সহজ-সরল মণিপুরী কৃষকপ্রজা। গভীর রাতের নিস্তব্দ্ধতা ভেঙে মণিপুরী গ্রামে হাতি নিয়ে ঢোকে জমিদারের সৈন্যদল। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে থাকে বাড়ির পর বাড়ি। কিন্তু তাতে দমে না মণিপুরীরা। লাঠি, মশাল, দা-বটি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা। ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ভানুবিলের জনগণের এই খণ্ডযুদ্ধে খুন হয় রাসবিহারী। তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। সেই যুদ্ধে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গ দিয়েছিল নিপীড়িতের।

১৯৩০ সাল। অবিভক্ত ভারতের এমনি এক সময়ে সিলেটের ভানুবিলে শুরু হয় কৃষক প্রজার বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের প্রাথমিক রূপ স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন হলেও পরবর্তীতে তা আর বিচ্ছিন্ন থাকে নি। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সংকটের প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদের স্বর জেগে উঠছিল উপমহাদেশের প্রতি প্রান্তরে। শতশত বছরব্যাপী প্রচলিত সামন্ত ব্যবস্থা ও পরবর্তী বিদেশী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতায় নিকৃষ্ট এক জীবে পরিণত হয়েছিল বাংলার কৃষক। কিন্তু তাদের জানা ছিলনা এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথের সন্ধান। ছিল না কোনো সংগ্রামী সংগঠন। ছিল না সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। ভানুবিলের কৃষক প্রজারাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন। অতিকষ্টের যাপিত জীবনে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল তাদের প্রাণ। কিন্তু তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার তাদের এই বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ভানুবিলে গারদ বসায়। ৭০০ জন সৈন্য অন্যান্য তালুক থেকে ৭০০ জন রায়ত এনে ১০টি হাতি নিয়ে প্রবেশ

করে ভানুবিলে। কৃষকের ঘর ভেঙে গারদ বসিয়ে পাশেই একটি পুকুর খোদাই করা হয়। এরপর কৃষকদের আরো ৪৭টি ঘর ভাঙা হয়। ক্ষেতের ফসল কাটতে বাধা দেয়া হয়। ক্ষেতের ফসল হাতি দিয়ে খাওয়ানো হয়। আবার কৃষকদের ধরার জন্যে সমন জারি করা হয়। যাকে পাওয়া গেল, তাকেই ধরে এনে হাত-পা বেঁধে বেত মারা হল। গরম জল ঢালা হল, তবুও পুলিশ ক্ষান্ত হল না।

অন্যদিকে, জমিদার আলী আমজাদ খাঁর মৃত্যুর পর রাজাসনে আসীন হল তার পুত্র আলী হায়দার খাঁ। জমিদারের আরেক ভাই আলী আসগর খাঁ, নতুন নায়েব প্রমোদ ধর। রাজ্য শাসনে পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নতুন রাজা ও তার নায়েব প্রজাদের সাথে চালাকি, হঠকারী, প্রতারণা শুরু করেন। বিপরীত দিকে কৃষক বিদ্রোহীদের নেতৃত্বেও আসে পরিবর্তন। মণিপুরী সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যুক্ত হন মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির মিছিলে। সংগ্রামীরাও তাদের নেতৃত্বে আরো সংঘবদ্ধ হয়, হয়ে ওঠে আরো বেগবান। দ্বিগুণ উৎসাহে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেয় তারা। কেননা, ভেতরে পুঞ্জীভূত অনেক ক্ষোভ ; চাষ করতে স্বাধীনতা নেই, জমি জমা বিক্রি, দানপত্র দেওয়া, বন্ধক দেয়া, গাছ পালা রোপণ ও তা কাটার কোনো অধিকারও নেই তাদের। জমিদারের অনুমতি ছাড়া কিছুই করার থাকত না। অথচ জমিদার যখন যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারতেন। ধরে ধরে বেগার খাটাতেন তাদের, লাঞ্ছিত হত তাদের নারীরা। তাই জমিদার বিরোধী সংগ্রামে সমবেত হতে থাকে নির্যাতিত সবাই। ঠিক সে সময়ই শুরু হয় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে 'অহিংস সত্যাগ্রহ' ও 'আইন অমান্য আন্দোলন'। ভানুবিলের মণিপুরীদের সাথে যোগাযোগ ঘটে কংগ্রেস পার্টির নেতৃবর্গের।

১৯৩১ সাল। সিলেটের মৌলভীবাজার মহকুমা সদরে আয়োজিত হয় 'জেলা কংগ্রেস শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট) সুরমা ভ্যালি যুব সম্মিলনী।' অনেক কংগ্রেস কর্মীসহ প্রখ্যাত নেতা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সে সময় বিদ্রোহীদের একটি দল ভানুবিল আন্দোলনের স্লোগান দিতে দিতে সম্মিলনীতে এসে পৌঁছায়। হাতে বিপ্লবী ফেস্টুন ও ফ্ল্যাগ, মুখে স্লোগান–'আমরা আমাদের অধিকার চাই আমরা কারো কৃপা চাই না'। সম্মিলনীতে ভানুবিলের কৃষক প্রজা আন্দোলনের কংগ্রেসের সক্রিয় সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তারপর বন্ধ হয়ে যায় সরকারের ট্যাক্স ও জমিদারের খাজনা। অন্যদিকে, জমিদার কিয়ার প্রতি আড়াই টাকা খাজনা আদায়ে বদ্ধপরিকর। জমিদারের এই আদেশ না মানায় তিনি ডিক্রি জারি করে আরো কয়েকজন কৃষকের ঘর উচ্ছেদ করেন। জেলে নেয়া হল বৈকুণ্ঠনাথ শর্মাসহ এগারোজন বিদ্রোহীকে। ভানুবিল আন্দোলন পরিচালনায় কংগ্রেসের সহযোগিতা নেয়ায় গ্রেপ্তার করা হয় শ্রীহট্টের (সিলেট) পূর্ণেন্দু কিশোর সেন ও গিরীন্দ্রমোহন সিংহকে। ভানুবিলের মণিপুরীদের আন্দোলনে আরো যারা

সহযোগিতা করেছিলেন তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রহসনের বিচারে অধিকাংশকে জেলে নেওয়া হয়- কাউকে শ্রীহট্ট জেলে, কাউকে মেদিনীপুর জেলে। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বিদ্রোহীদের মধ্যে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ ও জমিদার বাহিনীও বাড়িয়ে দেয় তাদের ধ্বংসযজ্ঞ। ১৯৩২'র মাঝামাঝি সময়ে প্রায় আড়াই হাজার সৈন্য হাতি নিয়ে ঢোকে ভানুবিলে। তারা কৃষকদের ঘরবাড়ি ভেঙে ক্যাম্প বসায়। এর প্রতিবাদে মণিপুরী সমাজের সকল নারী-পুরুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যেকোনো প্রতিকূলতা মেনে নিতে শপথ গ্রহণ করে।

এ দিকে শেষ হয়ে আসে ভানুবিল বিদ্রোহের নেতাদের শাস্তির মেয়াদ। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সভা আহ্বান করে তাদের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে। মণিপুরীরা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা মানতে থাকে। অন্যদিকে, বিদ্রোহীদের এই কর্মপরিকল্পনায় ভয় পেয়ে সরকার আবার বৈকুণ্ঠ শর্মা, নিকুঞ্জ গোস্বামীসহ ২৫ জন সভা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাতেও থামে না এমনকি মন্থর হয় না মণিপুরীদের বহুদিনের দাবি আদায়ের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে মণিপুরীদের সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতায় নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় জমিদার ও ব্রিটিশ সরকার। বিজয় লাভ করে মণিপুরীরা। ১৯৩৫ সালের শ্রীহট্ট (সিলেট) প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের ফসল পায় আইনী স্বীকৃতি। ন্যূনতম কর ধার্য করা হয় জমিতে। জমির মালিক হওয়ার অধিকার পায় আদিবাসী মণিপুরীরা।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বণিকদের কাছে ভারতবর্ষ ছিল এক স্বপ্নভূমি। আর ওদের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে ভারতবাসীর অবিরত স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে। তবুও নতুন স্বপ্নে বুক বেঁধেছে তারা পরদেশী প্রভু আর তার অনুচরদের প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করে। 'তেভাগা আন্দোলন' তেমনি এক সংগ্রামী সংগীতের নাম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী সাঁওতালদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সেই সংগ্রামকে দিয়েছিল এক অনন্য প্রাণ। ব্রিটিশ আরোপিত অতিরিক্ত করের বোঝা উত্তোলনের এক প্রয়াসের নাম বর্গাচাষ। এই পদ্ধতিতে জোতদার বা জমিদার কোনো শ্রম ও খরচ বহন না করেই পেত ফসলের অর্ধেক, আর বাকি অর্ধেক পেত চাষী। বিদ্যমান এই বর্গাপ্রথায় একজন চাষী তার শ্রম ও খরচের নির্বাহ শেষে যে অর্থ বা ফসল পেত তাতে তার আয় থাকত না বললেই বলে। বরং লোকসান হত। এরপর তাকে সেই লোকসান বা ঘাটতি পুষিয়ে নিতে শরণাপন্ন হতে হত জোতদার বা মহাজনের কাছে। পরবর্তীতে চড়া সুদের বোঝা বইতে না পেরে সে পরিণত হত এক সর্বস্বান্ত ক্ষেতমজুরে। এভাবেই অর্ধাহার, অনাহারে সময় পেরুতে পেরুতে এক সময় তাদের বোধোদয় হয়। তারা তাদের

বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী করে জমিদার ও জোতদার শ্রেণীকে। সংঘবদ্ধ হয়ে তারা সরকারের কাছে তাদের দাবিনামা পেশ করে। প্রধান দাবি– উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে কৃষক। সরকার এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করলে কৃষকরা সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিবাড়ি থেকে একজন করে ভলান্টিয়ার নিয়ে সকলে একসাথে সকল ধান কেটে আনবে। শুরু হয় ধান কাটার উৎসব। মহোৎসবের এই খবর পৌছে যায় পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে। শাসকদের কাছ থেকে আসে প্রবল প্রতিক্রিয়া। তারা আপস প্রস্তাব দেয়। শান্তিপ্রিয় কৃষক আপস বৈঠকে যোগ দেয় না। এরপর ১৪৪ ধারা জারি করলে জনগণের প্রবল চাপে তা ভেঙে যায়। অন্যদিকে, সমানে চলতে থাকে গ্রেফতার-নির্যাতন-নিপীড়ন। তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন এমনি এক সময় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি দিনাজপুরের তালপুকুর গ্রামে বিদ্রোহী কৃষকদের ধরে নিয়ে যেতে অভিযান চালায় পুলিশ। এলাকার হিন্দু, মুসলমান ও রাজবংশী আদিবাসীরা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ গুলি চালায়।

পুলিশের নির্বিচার গুলিতে প্রাণ হারান শিবরাম ও সমিরুদ্দিন নামের দুই ক্ষেতমজুর। এই ঘটনা দাবালনের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। শেষে প্রবল চাপের মুখে তেভাগার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। বিজয় লাভ করে তেভাগা আন্দোলন। তবে এটা ছিল তেভাগার আংশিক বিজয়। বাকি দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্যে পুনরায় সংঘটিত হতে থাকে কৃষক বিদ্রোহ। সরকার তা ঠেকাতে তার পুলিশ বাহিনী দিয়ে উচ্ছেদ, নির্যাতন, গ্রেপ্তার চালিয়ে যেতে থাকে। তখন কেবল দিনাজপুরেই আহত হয় ১০ হাজার কৃষক। গ্রেফতার হয় ১২ হাজার। ৮০ জন শহীদ হন। আর রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি এই চারটি জেলায় আন্দোলনের এই পর্বে ৫ হাজার ১শত জনকে গ্রেফতার করা হয়।

আন্দোলন চলাকালীন ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে রংপুর-দিনাজপুরের কৃষকদের অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা যেমন– ঠাকুরগাঁ, নীলফামারী, জলপাইগুড়িতে তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এসব এলাকার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে স্থানীয় আদিবাসী সাঁওতাল ও রাজবংশীরা। পুলিশের সাথে সংগঠিত কয়েকটি খণ্ড খণ্ড লড়াইয়ে বিজয় হয় তাদের। আদিবাসী সাঁওতাল নারী বিমলা মাঝিই প্রথম 'মহিলা সমিতি' গড়ে তোলে এবং তেভাগা আন্দোলনে নারীদের অবস্থান ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে জোরদার ও নিশ্চিত করে। তাঁর প্রাণময় ও প্রভাবশালী নেতৃত্বে ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিতে তেভাগা-আন্দোলন হয়ে ওঠে স্বাধীনতার এক স্ফুরিত অনুঘটক।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ আমাদের দেশে কিংবদন্তিতুল্য হয়ে আছে। এদেশের সকল জনজাগরণ, উত্থান ও বিদ্রোহে সাঁওতালদের বিভিন্ন সময়ের লড়াই এক অনুপম প্রেরণা যোগায়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার সাঁওতাল পরগণায় ১৮৫৫ সালে এক অসামান্য ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে সেটা মহাজাগরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেই বিদ্রোহ পর্বের নেতৃত্বে ছিলেন চার ভ্রাতা-সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। বিশেষত সিদু-কানু ভ্রাতৃদ্বয় তাদের ত্যাগ, অনমনীয়তা ও অবিচল প্রতিজ্ঞার জন্য বিদ্রোহীদের দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। সরল ও শিক্ষা-বঞ্চিত সাঁওতালদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও পীড়নের ফলশ্রুতিতে সেদিন তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। একই সালের ১০ জুন আনুমানিক ৫০ হাজার সাঁওতাল কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ভূ-স্বামী, জোতদার, মহাজন ও পুলিশের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ জানাতে সাঁওতালদের এই কলকাতা যাত্রা। পথিমধ্যে ব্রিটিশ রাজের দারোগা-পুলিশ তাদের বাধা দেয়। বিদ্রোহী সাঁওতালরা দারোগাসহ ১৯ জনকে হত্যা করে। অতঃপর কানু ঘোষণা করেন, "হুলহুল দিশমরে ঢারওয়াক, দারোগা বানুক কোওয়া, হাকিম বানুক কোওয়া, সরকার বানুগেয়া। নিতক দ হড় হপন রেয়াক রাজ হেচ সেটের এনা।" অর্থাৎ, বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে শাল গাছের কোওয়া ডাল পাঠাও। এখন দারোগা নেই, হাকিম নেই, সরকার নাই। এবার সাঁওতালদের রাজত্ব এসেছে।

দেড়শো বছর পর এখনও সাঁওতাল এলাকায় ৩০ জুন সিদু-কানুকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে 'সিদু-কানু দিবস' পালিত হয়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর রক্তে-মজ্জায় বিদ্রোহ মিশে আছে। একটি সাঁওতাল জনপ্রিয় গানের শেষের কয়েকটি চরণ এরকম-

নুড়িচ নাঁড়াড় গাই কাডা, নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগিং
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্রাম রুওয়াড় নাগিও
তবে দো বেন হুল গেয়াছো।
এর অর্থ-
গো মহিষ, লাঙল, ধন সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মতো আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করবো।

বিশ শতকের প্রথম দিকে দিনাজপুর, রংপুর এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জে (নাচোল) সাঁওতাল কৃষকদের তেজোদীপ্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন বলে পরিচিত এই লড়াই-এ সাঁওতাল বিদ্রোহীদের যে বল ও বীর্য প্রদর্শিত হয়েছে তা অসাধারণ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও এই লড়াকু সম্প্রদায়ের

অনন্য অংশগ্রহণ ছিল। তারা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই-এর সূচনা করে।

ইংরেজ রাজত্বের দু'শো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে কৃষক বিদ্রোহ থেকে শুরু করে আমাদের দেশে কৃষকরাই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাস বিদ্রোহ, ২৪ পরগণা জেলায় তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলায় দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল চাষীদের বিদ্রোহ, ১৭৭৯ সালে চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালে খাসী বিদ্রোহ, ১৮০৮ সালে আদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮১৮ সালে ভীল বিদ্রোহ, ১৮৩২ সালে কোল ও ভূমিজ বিদ্রোহ, ১৮৩৯ সালে নাগা বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। তেভাগা আন্দোলনের মূল কথা ছিল– জান দেব তবু ধান দেব না। দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও ২৪ পরগণার ভাগচাষীদের যে আন্দোলন, আদিবাসীদের সেখানে ছিল প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ।

এ বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, সাঁওতালরাই সর্বপ্রথম নিজেদের এলাকায় সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের ঐক্য গড়ে তুলেছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করে এদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সুপ্ত ছিল। শুধু স্বপ্নই নয়, ইংরেজ সরকারের সামগ্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছিল। গরিব চাষী, ক্ষেতমজুর, জমিহারা কৃষক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষই ছিল তাদের মূল শক্তি। পরাক্রমশালী ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তখনও সাঁওতালরা পূর্ণমাত্রায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে, সাঁওতালদের এ সংগ্রাম ভারতের শোষিত মানুষের বিপ্লবের পথকে সুগম করেছিল।

নিরীহ, সরল প্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? সাঁওতাল চাষীরা যখন জঙ্গল কেটে আবাদি জমি তৈরি করত এবং সেই জমিতে মেহনত ঢেলে ফসল ফলাতে জমিদারদের লোভাতুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ত সেই জমিতে। মহাজন ও হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাদের নানাভাবে ঠকাত এবং নামমাত্র দাম দিয়ে তাদের সমস্ত ফসল আত্মসাৎ করে নিত। মহাজনরা ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায়ের নামে তাদের ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করত ও তাদের গোলাম বানিয়ে রাখত। জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ঘুষে পুষ্ট হয়ে পুলিশ ও আমলারা তাদের অযথা হয়রানি ও পীড়ন করত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুঁজিবাদী বেনিয়া সরকার জুলুম ও পীড়নের প্রতিকার না করে কেবল রাজস্ব আদায় ও কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগে নিবদ্ধ রাখত।

আদিবাসীদের বিদ্রোহের আসল কারণ ছিল, জমিতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ফসল ভোগ করা এবং সমস্ত অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচার

থেকে রক্ষা পাবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তাই বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল- "জমি চাই, অত্যাচারী, ঠকবাজ মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণ এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি চাই"। জমিদার, মহাজন ও ইংরেজদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল স্থানীয়-অস্থানীয় শাসকদের অপশাসন ও অন্যায়ের অবসানের জন্য।

পরিতাপের বিষয় হল, আজ পর্যন্ত আদিবাসীদের কোনো সংগ্রাম ইতিহাসযোগ্য হয়ে স্থান করে নিতে পারেনি। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল জাতি অনুন্নত জাতি বলে গণ্য হচ্ছে ইতিহাসে তাদের কথা লেখা হয় না। বীরের মতো যে জাতি দেশের জন্য প্রাণ দিল, বিদেশী শাসন লুপ্ত করার জন্য তীর-ধনুক-বল্লম-টাঙ্গি-তরোয়াল সম্বল করে কামান, বন্দুকে সুসজ্জিত দুর্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করল, তাদের কথা লেখা হল খণ্ড জাতির বিদ্রোহ কিংবা নিছক একটা স্থানীয় হাঙ্গামা বলে। দেশের প্রতি, ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা যে তাদেরও যথেষ্ট ছিল সেটা ঐতিহাসিকরা দেখলেন না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণায় ঐতিহাসিকদের মনের সংকীর্ণতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাদের অবদান স্থান পেলনা।

সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায় মূলত লড়িয়ে জাত। তাদের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। সঙ্গত কারণে এই সম্প্রদায়ের বিবরণও সুদীর্ঘ হয়ে গেল।

এছাড়া, অন্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস অনেকেরই অজানা নয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার গারো (মান্দি) এবং হাজং কৃষকদের লড়াইও নাতিদীর্ঘ নয়। গারো এবং হাজং সম্প্রদায় ছাড়াও একই এলাকায় কোচ, বানাই ও ডালু সম্প্রদায় বাস করে। সতের, আঠারো শতকে এই এলাকায় ছিল পণ্য-বিনিময় প্রথা। দরিদ্র গারোদের বিদ্রোহের কারণ নানা পন্থায় তাদের ঠকানো হত। করা হত শোষণ। এর উপর ছিল নানা অজুহাতে জমিদারদের কর আদায়। এক সময় শোষণের মাত্রা সম্পর্কে উপলব্ধ হবার পর তারা সতেরো শতকের শেষদিকে প্রথমে করম শাহ অতঃপর ছগাতি ও মনা সর্দার এবং আঠারো শতকে টিপু, গুমানু সরকার, উজির সরকার, জামুক পাথর, দোবরাজ পাথর প্রমুখ ফকির ও কৃষক নেতার নেতৃত্বে জমিদার, মহাজন ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মাঝে মাঝে বিদ্রোহে ভাটা পড়লেও এর স্থায়িত্ব হয়েছিল প্রায় একশো বছর।

আঠারো শতকের শেষভাগে জনপ্রিয় হাজং নেতা গোরাচাঁদ হাজং-এর নেতৃত্বে জমিদারদের বিরুদ্ধে হাজংরা বিদ্রোহ সংঘটিত করে। অযাচিত খাজনা আদায়, টংক প্রথা, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের দাবিতে আন্দোলন দানা বাঁধে। পরে, কমরেড মনি সিং-এর নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। তিন পর্বে সত্তর বছর দীর্ঘ হয়েছিল হাজং বিদ্রোহ।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও চাকমা জাতির আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল গত সতেরো শতকের শেষদিকে। শের দৌলত, রামু খাঁ, জানবকস খাঁ প্রমুখের নেতৃত্বে চাকমারা জমিদার, ফড়িয়া ও ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে পনেরো বছর ধরে বিদ্রোহ সচল রাখে।

এদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের অতীতের এই সকল লড়াই-বিদ্রোহের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রক্ত ও হৃদয়ে হুলের মন্ত্র নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান খাটো করে দেখার কোনোই সুযোগ নেই। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অতুল্য অবদান যথোচিতভাবে সংযোজনার দাবি রাখে। এতে বিস্মৃতি বা অবহেলা করা হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অপূর্ণাঙ্গতা।

মানবসৃষ্ট সভ্যতার কোনো এক ক্রান্তিকালেই ব্রিটিশ বেনিয়ারা ছায়াময় শান্তি পূর্ণ ভারত ভূমিকে পরিণত করে অভিশপ্ত চরাচরে। তখন একদল মানুষের আঘাতে টুকরো টুকরো আরেকদল মানুষের যাপিত জীবন, দুর্বিপাকে ঘোরে দৈনন্দিন জীবন চয়ন। আর এই বিপর্যস্ত মানবতার দৃষ্টান্ত রয়েছিল ভূ-ভারতের পরতে পরতে, রয়েছিল বাংলা ভূমির নাচোল স্থানে। স্থানটি বর্তমানে রাজশাহীর অন্তর্গত একটি থানা। ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে শত বছর আগে এখানে এসে আশ্রয় নেয় সাঁওতালরা। পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবাদি করে ফসল ফলিয়ে তারা দিনাতিপাত করে। বাংলার দারিদ্র্য-জর্জর কৃষকদের মতোই সুখে-দুঃখে কাটতে থাকে তাদের দিনগুলো। কিন্তু এরই মাঝে এক সময় জমিদার, জোতদার, সরকার আসে। কাগজপত্র দেখিয়ে তারা জমির মালিকানা দাবি করে। পাশাপাশি নিরীহ নিরক্ষর সাঁওতালদের ওপর আইন জারি হয়– চাষ করতে হলে জমির মালিক অর্থাৎ জোতদার ও জমিদারদের থেকে জমি বরাদ্দ নিতে হবে, এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক জমির মালিককে দিতে হবে। নব ঘোষিত এই আইনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সাঁওতাল সমাজ। এ সময় খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন কিছু বিদ্রোহ হল। তাতে ইতিবাচক কোনো ফল হল না। ১৯৩০ সালে একটি স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এরপর ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু সাঁওতালদের ভাগ্যের আদৌ পরিবর্তন হয় না। ব্রিটিশদের নির্দেশিত ও প্রয়োগকৃত শাসন প্রক্রিয়াই বলবৎ থাকে সাঁওতাল সন্তানদের ওপর। ফলে, বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়ে প্রবলরূপে প্রকাশ পায় ১৯৪৮ সালে। দেশব্যাপী তখন স্বাধীনতার জোয়ার প্রবাহিত। আর সাঁওতালরা তখন নিজেদের জমিতে বর্গাচাষী।

পেটের তাগিদে তারা ফসল ফলাতে বাধ্য হয় জমিদার-জোতদারের জোর করে নেয়া জমিতে। শ্রম, খরচ সবকিছু বিনিয়োগ করেও ফসলের অর্ধেক দিতে হয় জমির মালিককে। তাও যদি সে অনুগ্রহ করে জমি দেয়। কোনো কারণে

ফসল ভালো না হলে জমি থেকে উঠিয়েও দিত মালিক। এরকম নগ্ন নিষ্ঠুরতা চলতে থাকে আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনে। ইতোমধ্যে বিজয় পেয়েছে পঙ্গু মানবতার দুই আর্তনাদ– রংপুর, দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন এবং ময়মনসিংহের টংক আন্দোলন। এর প্রভাব পড়ে সারা দেশের নির্যাতিত কৃষকের মানসে। প্রভাব পড়ে সাঁওতাল মানসিকতায়ও। নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আবার জেগে ওঠে তারা। তাদের সেই মানবিক সংগ্রামে শামিল হতে এগিয়ে আসেন সাঁওতাল নেতা মাতলা সর্দার এবং মালদহ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রমেন মিত্র। এছাড়াও নেতৃত্বদানে এগিয়ে এসেছিলেন ভিন্ন এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা শিবু কোরামুদি। আর ছিলেন এক কিংবদন্তি, সাঁওতালদের রানি মাতা ইলা মিত্র। এই মহান নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, প্রজ্ঞা ও সাঁওতালদের সুমহান ত্যাগে কৃষক বিদ্রোহ এক পরিণত রূপ পায়। এক হয়ে যায় নাচোল ও চাপাই নবাবগঞ্জের কৃষককুল। সকলের দাবি- তেভাগা কার্যকর ও জমিতে চাষীদের মালিকানা হস্তান্তর। কৃষক বিদ্রোহের প্রবল চাপে তেভাগা মেনে নিতে বাধ্য হয় জোতদার-জমিদারবর্গ গ্রামগুলো চলে আসে কৃষক সমিতির অধীনে। কিন্তু এই বিজয়ের বিক্ষুব্ধ বাতাস ভারি করে আবার আসে আরেক বিদ্রোহের সম্ভাবনা। সাঁওতাল রক্তের সংগ্রামী চেতনা তাই লড়ে যায় তারপরও।

বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহীতে বসবাসরত এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওঁরাওদের একটি বিরাট অংশের বাস ভারতের ছোট নাগপুর অঞ্চলে। অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো যুগপৎ সরলতা ও সংগ্রামী চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আদিবাসী ওঁরাও জনগোষ্ঠী। শক্তিশালী ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে এক দৃপ্ত উচ্চারণ 'ওঁরাও তানা ভগৎ আন্দোলন' (১৯১৪-১৯১৯) তার পরিচয় বহন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পাপে পুরো পৃথিবী যখন পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত, তখন ভারতের ছোট নাগপুরের ওঁরাওগণ তখনো জমিদার, ইল্লাকদার, হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়ী, খ্রিষ্টান ও ব্রিটিশরাজ প্রভৃতি সবার প্রতিই বশ্যতায় রীতিসিদ্ধ। সেই বশ্যতাকে অস্বীকার করার অভিপ্রায়ে আবির্ভূত হন এক মহামানব ২৫ বছর বয়সী যাত্রা ওঁরাও। শুরুতে তার বিদ্রোহের বাণী নিছক ধর্মীয় আন্দোলনের মন্ত্ররূপে উদ্ভাসিত হলেও তা-ই এক পর্যায়ে ব্রিটিশ ও জমিদারদের খাজনা না-দেওয়ার আন্দোলনে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য, সে সময় পার্শ্ববর্তী পূর্ব নাগপুরে বসবাসকারী মুক্ত মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি হারে খাজনা দিতে হত ওঁরাওদের। এর ফলে তারা প্রতিবেশীদের অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে পৈতৃক জমি হারাতে থাকে। এছাড়া তারা দিকু, মহাজন, পুলিশবাহিনী ইত্যাদি শোষক শ্রেণীর প্রতিভূদের যে কোনো কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করে দিতে বাধ্য থাকত। যাত্রা ওঁরাও সর্বপ্রথম এসবের প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হন। সামগ্রিকভাবে ওঁরাওদের ভেতরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থাকায় তারাও

সামিল হয় যাত্রার সংগ্রামে। সে সময় যাত্রার অনুসারীগণ (তানা) লাল মরিচ, লাল চালসহ লাল রংয়ের সবকিছু পরিহার করে। কেননা, লালরং ওঁরাওদের চরম ঘৃণার প্রজাতি ব্রিটিশ বেনিয়াদের পরিচয় বহন করত।

সরল বিশ্বাসী আদিবাসী ওঁরাওদের মতে, জমি ঈশ্বরের দান, আর তাই মানুষের জমির অধিকারে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এই মতবাদই ছিল ওঁরাওদের তানা ভগৎ আন্দোলনের চালিকা শক্তি। তারা পারিশ্রমিকহীন শ্রম না দেওয়ার ও নিজেদের জমির খাজনা তথাকথিত জমিদারদের না দেওয়ার সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের শত্রুর তালিকায় ছিল হিন্দু-মুসলমান ভূ-স্বামী ও ব্যবসায়ী, মিশনারি, পুলিশ ও ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ১৯১৪ সালেই জমে ওঠে দুর্বার আন্দোলন। নেতা ওঁরাও যাত্রার চারপাশে এসে সংঘবদ্ধ হয় ২৬ হাজার ওঁরাও অনুসারী। রাঁচী, পালামৌ ও হাজারীবাগের ওঁরাও সম্প্রদায়সহ বাংলাদেশের ওঁরাওদের মধ্যেও এ আন্দোলন দাবানলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে যায়। আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা বেছে নেয় সহিংসতার পথ। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে অপহৃত হতে থাকে জমিদার ও ব্রিটিশদের কর্মচারীরা।

রাতের বেলায় সভা-সমাবেশে মিলিত হয়ে ওঁরাওরা নতুন ধর্মজ্ঞান আলোচনার পাশাপাশি আন্দোলনের দিক-নির্দেশনাও নির্ণয় করতেন। ১৯১৪ সালের ২৩ এপ্রিল জমিদার ও সরকারের কাজে অস্বীকার ও শান্তি বিঘ্নিত করায় যাত্রা ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের বন্দি করা হয়। আদালতের বিচারে তাঁদের কারাদণ্ড হয়। ১৯১৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যাত্রা এ আন্দোলনের নেতৃত্ব ছেড়ে দেন। উত্তরসূরি হিসেবে নেতৃত্বে আসেন প্রধান শিষ্য লিথো ওঁরাও। তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং মুক্তির পর তিনি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যান। এরপর তানা ভগৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সাংগোর ওঁরাও। তাঁর পরিণতিও পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দের মতো হয়। ১৯১৬ সালে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ির চা-বাগানের ওঁরাও কুলিদের মধ্যে। এরপর ১৯১৯ সালে শিবু ওঁরাও ও মায়া ওঁরাও'র নেতৃত্বে আন্দোলনে নতুন গতির সঞ্চার হয়।

তাঁরা চা-বাগানে চলমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেন এবং নিজেদের হিন্দু-মুসলমানের সমকক্ষ বলে দাবি করেন। ১৯২১ সালে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ ঘটে ওঁরাও তানা ভগৎ আন্দোলনের। গান্ধির কংগ্রেস আন্দোলন তখন অবিসংবাদিতরূপে বিরাজমান সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ওঁরাওদের আশ্বাস দেওয়া হয়– গান্ধিরাজ তাদের স্বর্ণযুগ এনে দেবেন। ঐতিহ্যগত সরলতাসমৃদ্ধ অধিবাসী ওঁরাওরাও একথা বিশ্বাস করতে শুরু করে। গান্ধি এমন একজন দেবতা যিনি বন্দুক ছাড়াই ব্রিটিশদের বিতাড়িত করবেন এবং ওঁরাওদের জন্যে একটি স্বর্ণযুগ নিশ্চিত করবেন। এভাবে কংগ্রেসী আশ্বাসের অতলে হারিয়ে যায় ওঁরাওদের তানা ভগৎ আন্দোলন।

"ফুলপাতা যে রকম সূর্যের দিকে মুখ ফেরায়, সে রকম কোনো অজানা সৌরাকর্ষণে অতীতও ইতিহাসের আকাশে উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ ফেরাবে বলে লড়াই করে।"

–ভাল্টার বেনিয়ামিন (১৯৯২ : ২৪৬)

মুক্তিযুদ্ধ

শত শত নদীবেষ্টিত ভূ-ভাগে প্রাচীন কৌম ও বঙ্গ-জন অধ্যুষিত বঙ্গ-জনপদ। বিচিত্র এর ভূ-প্রকৃতি, যা তার মানুষদের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। সেই প্রকৃতি মনোহর আর দৃষ্টিনন্দন হলেও আচরণে অনেকটা প্রতিপক্ষ। দৃষ্টিসীমা সরলভাবে দিগন্তের সন্ধান পায় না। পথ-ঘাটও অসরল, আঁকা-বাঁকা। প্রলয়ঙ্করি বন্যা এখানে প্রায় প্রতিবছরের ঘটনা। নিত্য লড়াই চলে নদী আর তার পাড়ের মানুষদের মধ্যে। নদী ঘর ভাঙে, শস্য কেড়ে নেয়। সমুদ্রকূল গ্রাস করে সব কিছু। এমনিতর জল-স্থলে প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচেছে এই অঞ্চলের পরাক্রমশালী মানুষরা। তাই লড়াই-সংগ্রাম-প্রতিবাদমুখরতা তাদের সংস্কার। আত্মবিস্মরণ বা অস্তিত্বকে ভোলার অবকাশ মেলেনি । সভ্যতার বিকাশ বা বিকাশের উৎকর্ষতার বদৌলতে সেই প্রতিপক্ষসুলভ প্রকৃতিকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও প্রতিপক্ষ বা শক্রর নবরূপে প্রত্যাবর্তন রোধ করা যায়নি। প্রতিকূলতার চটুল চরিত্র ও নব মাত্রিকতায় পাল্টে গেছে যুদ্ধের প্রকৃতি। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, উগ্র আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, শোষণ সর্বস্বতা, পুঁজিবাদ, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি তথাকথিত সভ্যতার ধারক মানুষেরই সৃষ্টি, যে সৃষ্টির বিকাশ মানুষেরই চরম শক্ররূপে। অন্যদিকে এইসব শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মুক্তিকামী বিশ্ববাসী প্রগতির অস্ত্র হিসেবে হৃদয়ে ধারণ করেছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, উদার জাতীয়তাবাদের ধারণা, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং সমাজতন্ত্রের দর্শন। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে প্রগতির উপরোক্ত অস্ত্রসমূহই মূল শক্তি ও প্রেরণার যোগান দিয়েছিল।

প্রায় দুইশো বছর শাসন-শোষণ শেষে ১৯৪৭'র আগস্টে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ব্রিটিশরা। এর মধ্য দিয়ে

আমাদের সামনে দৃশ্যশোভন হয়ে ওঠে স্বাধীনতা নামক এক মাকাল ফল, যা আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে খেয়েছিলাম। বারোশো মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে একমাত্র ধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া আর কোনো মিলই ছিল না। এই তথাকথিত স্বাধীনতা ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বাধীনতা, পূর্ব পাকিস্তানকে অবাধ শোষণের স্বাধীনতা। পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশ বিবেচনা করে পশ্চিমারা এদেশের মানুষকে রাষ্ট্রজীবনের সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত ও বঞ্চিত রাখে। এভাবেই পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের ২৬০০ কোটি টাকা (১৯৪৭-'৭০) পাচার হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। আশা বা মোহভঙ্গের প্রথম বছর ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার ওপর আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে ঢাকায় এক গণবিক্ষোভ সংঘটিত হয়। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ কয়েকজন শহীদ ও অনেকে আহত হন। ভাষার জন্য এই জীবন ও রক্তদানের মাধ্যমেই শুরু হয় এদেশবাসীর স্বাধিকার আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের পরিণত প্রকাশই ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ।

পূর্বতন বছরগুলোতে সংগঠিত তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া এদেশবাসীর মনস্তত্ত্বে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, তা আরো করুণভাবে আত্মগত হয়েছে ১৯৭০-র ১২ নভেম্বর। ইতিহাসের এক প্রলয়ঙ্করি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ববাংলার দক্ষিণাঞ্চল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেদিন। সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দশ লাখ বাঙালির জীবন ছিনিয়ে নেয়। সর্বস্বান্ত হয় অসংখ্য মানুষ। অথচ এই বিরাট জাতীয় দুর্যোগে ইয়াহিয়া সরকার দুর্গত জনসাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর উদাসীনতা প্রদর্শন করে।

এরপর ১৯৭০-র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ৩১৩ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৯ এবং আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়। ফলাফল বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কথা আওয়ামী লীগের। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১-র ১ মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণা করলে রুখে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। এরপর পরিস্থিতির পরম্পরায় আসে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। রমনা-রেসকোর্সে বিশাল জনসমুদ্রের সম্মেলনে শেখ মুজিব গভীর আবেগ, যুক্তি এবং ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনাপূর্ণ এক ভাষণ দেন। এ ভাষণে অকুতোভয় নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন–

"…. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

মূলত সেদিন থেকেই 'স্বাধীনতা" শব্দটি এদেশবাসীর। অন্যদিকে, পূর্ব-পাকিস্তানের জেগে ওঠা জনতার কণ্ঠরোধ করতে সামরিক জান্তা সিদ্ধান্ত নেয় চূড়ান্ত আঘাত হানার। এ লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি বা তার আগে থেকেই মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তান থেকে গোপনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যাপক সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম আনা হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষের ওপর চলে মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। বর্বরোচিত এই হত্যালীলায় সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে এদেশে বসবাসরত অবাঙালি একটি অংশ এবং এদেশে জন্ম নেয়া কিছু বিশ্বাসঘাতক দালাল। প্রথমত তারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যান্টনমেন্টসমূহ।

অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর সম্ভাব্য মৃত্যু মেনে নিয়েও জনগণের জীবন রক্ষার্থে মহাহত্যাযজ্ঞের প্রথম প্রহরেই গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিব। স্বাধীনতা হয়ে ওঠে সবার অভিন্ন ও একমাত্র লক্ষ্য। ২৬ মার্চ-ঢাকা এক ধ্বংসস্তূপের নগরী। এই ঘটনায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে শুরু হয় অভাবনীয় প্রতিরোধ প্রক্রিয়া। ঢাকার রাজারবাগ ও পিলখানা এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাকসেনারা বাঙালি পুলিশ, ইপিআর, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট'র সৈন্যদের নিরস্ত্র করে পাইকারি গণহত্যা চালালে সেই খবর অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। আত্মরক্ষার ও দেশাত্মবোধের তাগিদে অধিকাংশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য প্রতিরোধ-সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। সশস্ত্রবাহিনীর বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের মধ্যে চট্টগ্রামস্থিত ৮-ইবি এবং ইপিআর বাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধ একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এতে স্বল্পকালের জন্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখলে আসলে ২৬ মার্চ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান এবং ২৭ মার্চ ৮-ইবির মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে নরক হয়ে ওঠা বাংলার শহর-গ্রাম থেকে পাহাড়, জঙ্গল, নদী-নালা ডিঙিয়ে লাখ লাখ মানুষ বেরিয়ে পড়েন নিরাপত্তার খোঁজে। বেশিরভাগ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নেয় ভারতে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের স্থানে স্থানে তাঁবু খাটিয়ে তৈরি করা হয় শরণার্থী শিবির। প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বাংলাদেশী শরণার্থীদের ভার নিলেও পরবর্তীতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য শরণার্থী আশ্রয় নিতে থাকলে এর দায়িত্ব নেয় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। সে সময় প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। নকশাল অধ্যুষিত জনবহুল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অগণিত বিদেশী শরণার্থী বিশেষত সশস্ত্র বিদ্রোহীদের জন্যে উন্মুক্ত করা অসামান্য ঝুঁকিপূর্ণ হলেও দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা রাখেন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। মুক্তিযুদ্ধের এ পর্বে অসামান্য ভূমিকা রাখেন সীমান্ত অতিক্রম করা আওয়ামী লীগ নেতা (সাধারণ সম্পাদক) তাজউদ্দিন আহমদ। প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিনি সে সময় ভারতের সাথে

যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র সময় জুড়ে তিনি সমস্ত বিভ্রান্তি ও উপদলীয় কোন্দলের মধ্যে স্থির থেকে জাতিকে সঠিক নেতৃত্বে চালিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এ বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সম্মুখে প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এই সংবাদ প্রচারিত হলে কলকাতার পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত এম. হোসেন আলী বাংলাদেশ পক্ষে যোগ দেন। এরও আগে ৬ এপ্রিল দিল্লীর পাক হাইকমিশনের কর্মকর্তা কে. এম. সাহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জানান। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ক্যানবেরা, কাঠমুন্ডু, ম্যানিলা, লন্ডনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দূতাবাসে বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মাচারীরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। এইসব ঘটনাবলি মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি লন্ডনে তাঁর সদর দফতর স্থাপন করে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে ছুটে বেড়ান, যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের নাড়া দিয়েছিল। বিশ্ব জনমত আদায়ের লক্ষ্যে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রধান শহরে নানা উপায়ে পাকিস্তানি নৃশংসতা তুলে ধরেন। লক্ষ্য হয়ে যায় একটিই, সেই নির্দিষ্ট ও দুর্নিবার লক্ষ্য– দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তি। ফলে, সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের অভিপ্রায়ে দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করতে থাকে মুক্তি পিয়াসী সবুজের দল।

৩০ এপ্রিল, ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু বাংলাদেশের তরুণদের প্রশিক্ষণদানের দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারত একটি রেডিও ট্রান্সমিটার বরাদ্দ করলে ২৫ মে মুজিবনগর থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের' অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। মুক্তি পাগল শব্দ সৈনিকদের নির্ভীক প্রচেষ্টায় এই বেতার-সম্প্রচার তার উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে উজ্জীবিত করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সমর্থনকারী সবাইকে। পাশাপাশি চিত্রসৈনিকরাও তাঁদের শিল্পকর্মে পাকিস্তান শাসকদের ব্যঙ্গচিত্র উপস্থাপন করে জনমনে পাকিস্তানি শাসন সম্পর্কে তীব্র ঘৃণার সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিক একাত্তরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সুগঠিত পাকসেনাদের বিপরীতে মুক্তিবাহিনী ছিল অনেকটা আগোছালো, অসংবদ্ধ। তবুও তারা নিষ্ঠুর পাকসেনাদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রয়াস চালিয়েছিল। আশা ছিল, পৃথিবীর মানবতাবাদী সংস্থা ও বড়ো বড়ো সভ্য দেশগুলো এই অসম যুদ্ধ রোধে সচেষ্ট হবে। কিন্তু তা হয় নি। তাই মে মাসের মাঝামাঝি থেকে গেরিলাযুদ্ধের পথ বেছে

নেয়া হয়। ১৩টি শিবিরে মে-জুন-জুলাই এই তিন মাস ধরে চলতে থাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ। তাদের রণকৌশল– অতর্কিত আক্রমণে ছোটো ছোটো পাক সেনাদলকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া। জীবন বাজি রেখে এভাবেই চলতে থাকে এদেশবাসীর যুদ্ধ প্রক্রিয়া। ফলে 'পূর্ব পাকিস্তান' পুনর্দখলের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানি শাসকদের আত্মপ্রসাদ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসতে থাকে জুন মাসের শেষ দিকে।

একথা সত্য, আগস্ট একাত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও কম, যা পাক সেনাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিতান্তই অপ্রতুল। এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে কুড়ি হাজার করে আরো ষাট হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দেয়া হয় এবং বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর জন্যে গঠন করা হয় আরো নতুন তিনটি ব্যাটেলিয়ান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে চলমান অস্ত্রশস্ত্র সংকটের উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৬ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ নৌ-কমান্ডো বাহিনীর পৃথিবীকে চমক লাগানো নৌবিধ্বংসী তৎপরতার অভাবনীয় সাফল্য মুক্তিযুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ভারতের সহায়তায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মাত্র ৩০০ জন নৌ মুক্তিযোদ্ধা ১৫ আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে সর্বমোট ৫০,৮০০ টন জাহাজ নিমজ্জিত করেন, ৬৬,০৪০ টন জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত করেন, এবং বেশকিছু সংখ্যক নৌযান দখল করে নেন। এই দুঃসাহসিক অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচিত।

প্রত্যক্ষ তৎপরতার ক্ষেত্রে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা নভেম্বরের শুরুতে অনেক বেশি সক্রিয় ও আত্মবলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে যথোপযুক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তারা দখলদার সৈন্যদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন হটাতে সক্ষম হয়। এতে পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় সহযোগী রাজাকার বাহিনীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সুবিধাবাদী অংশটি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে থাকে এবং এই অবস্থায় এই বাহিনী আয়তন বৃদ্ধির জন্যে দখলদার সামরিক শাসকরা জামায়াতে ইসলামী এবং অবাঙালি সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় গঠিত 'রাজাকার' 'আলবদর' ও 'আল শামস' বাহিনীর গোঁড়া সদস্যদের ওপর অধিকতর নির্ভর করতে থাকে।

এই সকল নপুংসক রাজাকার সম্প্রদায় ছাড়াও পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোবাহিনী। এই মঙ্গল-প্রতিম চেহারার মিজোদের আবাস লুসাই পর্বতপ্রধান ভারতের মিজোরাম প্রদেশে। সরল স্বভাবের কিন্তু বিপথে চালিত এই মিজোদের কয়েকটি নিরাপদ ঘাঁটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে। এই ঘাঁটিগুলো পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র মজুদ থাকত যে এই বৈরী ভূমিতে যে কোনো সম্ভাব্য ভারতীয় অনুপ্রবেশ

তারা প্রতিরোধ করতে পারত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান প্যারা-মিলিটারি ফোর্সেস-এর বেতনভুক্ত এই মিজোদের পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে মোতায়েন করা হয়। পাক কর্তৃপক্ষ প্রতিটি পোস্টে মিজোদের পাশাপাশি বেলুচি, পাঠান ও পাঞ্জাবিদের ছোটো ছোটো ইউনিট রাখত। তারা যেন সর্বশেষ লোক এবং সর্বশেষ রাউন্ড পর্যন্ত পাকিস্তানের স্বার্থে লড়াই করে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রেখেছিল।

এদিকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এলাকার কিংবদন্তি কাদের সিদ্দিকী নবীন একদল সহকর্মী নিয়ে পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। টাইগার সিদ্দিকী নামে পরিচিত মাত্র ২৫ বছর বয়সী এই তরুণ তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, রণকৌশল এবং সামরিক প্রতিভাবলে গড়ে তোলেন সতেরো হাজার সুদক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এবং সত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট বাহিনী। 'কাদেরিয়া বাহিনী' নামে খ্যাত এই দলটি কখনো অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার আশায় বসে থাকেনি।

সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ও বহুগুণ শক্তিশালী পাক বাহিনীর ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে অস্ত্র ছিনিয়ে এনে যুদ্ধে ব্যবহার করেছে তারা। এই বাহিনীর অসাধারণ রণনৈপুণ্যেই ডিসেম্বর মাসে মিত্রবাহিনী টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মুক্ত এলাকা হয়েই প্রথম ঢাকায় পৌঁছে।

আগস্ট মাসে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবের ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। ইন্দিরা গান্ধির প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় ইয়াহিয়া বিশ্ববাসীকে জানাতে বাধ্য হন–শেখ মুজিব বেঁচে আছেন এবং কারাভ্যন্তরেই রয়েছেন। অন্যদিকে, ১ কোটি শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্যান্য বঙ্গবাসীর যাবতীয় প্রয়োজনের যোগান দিতে গিয়ে মারাত্মক চাপের মুখে পড়ে ইন্দিরা সরকার। এ সমাধানকল্পে ইন্দিরা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মস্কো এবং ২৪ অক্টোবর থেকে তিন সপ্তাহের জন্যে বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি ভ্রমণ করেন। কিন্তু বিশ্বনেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় তেমন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে ভারতকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন। এভাবে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়। ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ৪৭ মিনিটে পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের ৭টি বিমান ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালালে অনিবার্য হয়ে যায় ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতি। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই পর্বের দুইদিনের যুদ্ধেই বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান বিমানবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এই সময় কূট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যখন বুঝতে পারে যে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন নতুন ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা

চালাতে প্রয়াসী হয়। এপ্রিল মাস থেকেই হোয়াইট হাউস পাকিস্তানকে অস্ত্র না দেয়ার বিবৃতি দিলেও, গোপনে এ প্রক্রিয়া সচল থাকে যুদ্ধের পুরোটা সময় জুড়ে।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫ ডিসেম্বর বিশেষ উদ্যোগে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে এই অন্যায় অধিবেশনে ভেটো দেয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরদিন ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন ইন্দিরা গান্ধি। এতে পাকিস্তানের সাথে ভারতের সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং ভারতে সকল প্রকার মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে অবস্থানরত সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত তার সমুচিত জবাব দেয়। ইতোমধ্যে রণাঙ্গনে শুরু হয়ে যায় পাকসেনাদের পলায়ন পর্ব। ৭ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানিদের নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে এগোতে থাকে যুদ্ধের পরিণতি।

১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকার পাশাপাশি স্মরণযোগ্য নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র কথা। ১ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই কনসার্টে দর্শক ছিলেন ৪০ হাজার এবং এ থেকে আয় হয়েছিল আড়াই লাখ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের শিশুদের কাজে ব্যয় করার জন্যে জাতিসংঘের শিশু তহবিলে জমা দেয়া হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানটি মার্কিন জনগণসহ বিশ্বাবাসীর সহানুভূতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১০ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিনিয়র কমান্ডারদের সমন্বয়ে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর এক যৌথ কমান্ড গড়ে তোলা হয়। যৌথ কমান্ডের পরিকল্পনা ছিল সম্ভাব্য বড়ো ঘাঁটিগুলোকে এড়িয়ে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে ঢাকা দখল করা। এক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করা হয় যে, পাকিস্তানিরা ভুল করে ধারণা করে- চতুর্দিকে বিপুল শক্তি নিয়ে যৌথ কমান্ড এগিয়ে আসছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানি পক্ষ সমগ্র দেশে তাদের সামরিক শক্তি ছড়িয়ে দেয়। এতে পাকিস্তান-বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্যম্ভাবী পরাজয় বুঝতে পেরে পাকিস্তানি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানায়। নিরাপত্তা পরিষদে যখন এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে ইয়াহিয়া জাতিসংঘকে জানান এ প্রস্তাব অনুমোদিত নয়। তাই তা নাকচ করা হোক। ইয়াহিয়ার এই মত পরিবর্তনে মার্কিন সপ্তম নৌবহর ছিল যুদ্ধ জয়ে আশার আলো। এই সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি বিশ্বসংঘাতের আশঙ্কা দেখা দেয়।

১০ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম লগ্ন। ততদিনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানিদের অবধারিত পরাজয়। এই আসন্ন পরাজয়ের কথা জেনেও পাকিস্তানি পশুরা হত্যা করে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কট্টরপন্থীদের সশস্ত্র বাহিনী ছিল 'আলবদর'। গেস্টাপো স্টাইলের এই বাহিনী বিশিষ্ট বাংলাদেশীদের চিনিয়ে ও ধরিয়ে দেবার এবং অবশেষে হত্যা করার ভার নেয়।

পাক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নক্সার প্রণেতা। যাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষতা, শোষণমুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন তাঁরাই এই হত্যালীলার শিকার হয়েছেন। 'জেনোসাইডের' পাশাপাশি 'এলিটোসাইডে' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– বাংলাদেশের লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী প্রমুখরা। ঢাকার এক বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের গভর্নর হাউসে সভার আমন্ত্রণ করে নির্বিচারে হত্যা করার একটি মহাপরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানিদের। পরবর্তীতে এই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়াই ছিল ওদের এই হত্যা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

একাত্তরের ইতিহাসে অত্যন্ত ঘটনাবহুল একটি দিন ১৪ ডিসেম্বর। ঢাকা শহর ও গুটিকয় ছোটো ছোটো এলাকা বাদে সারা দেশ তখন শত্রু মুক্ত। আসন্ন যুদ্ধ ও সম্ভাব্য ধ্বংসের আশঙ্কায় থমথমে ঢাকা শহর। ঐদিনই ঢাকার গভর্নর হাউসের ওপর আক্রমণ চালায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর ছয়টি মিগ ২১। এই ঘটনায় পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক প্রশাসক অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্নর ডা. মালিক পদত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের চৈতন্যোদয় হয় সেদিন। ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি লে. জেনারেল নিয়াজিকে বার্তা পাঠান– পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের জীবন রক্ষার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার। শর্তহীন আত্মসমর্পণের দিকে তাড়িত হয় পরাস্তও পরিশ্রান্ত ইস্টার্ন কমান্ড। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনী ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে সমবেত হয়। এরপর আসে ১৬ ডিসেম্বর। বাংলার ইতিহাসে এক হিরন্ময় মুহূর্ত।

১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, বাংলাদেশের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, এবং ভারতের অপরাপর সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিগণ ঢাকায় অবতরণ করেন। এর আধঘণ্টা পরেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের এক বিশাল হর্ষোৎফুল্ল জনতার উপস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সমরাধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল পাকিস্তানি বাহিনীর (৯৩ হাজার)

পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। জন্ম হয় একটি দেশের, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তখনো মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে চলছে অভ্যন্তরীণ অপশক্তিসমূহের বিরুদ্ধে। কেননা, মুক্তির যেমন শেষ নেই, তেমনি মুক্তিযুদ্ধও শেষ হয় না। ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ১২০০ বছরের স্থবিরতার অবসান ঘোষণা করেছে মাত্র।

বাঁচার আনন্দে আমি চেতনার তটে
প্রত্যহ ফোটাই ফুল, জ্বালি দীপাবলী
ধ্যানী অন্ধকারে। আর মৃত্যুকে অমোঘ
জেনেও স্বপ্নের পথে, আমার
পৃথিবীতে খুঁজি দান গানে গানে, প্রাণলোকে
খুঁজে ফিরি অপমৃত সুন্দরের স্মৃতি।

– শামসুর রাহমান

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়

ত্যাগ ও রক্তে কেনা স্বাধীতার জন্য

যদি ত্যাগই হয় মুক্তির আদর্শ। যদি রক্তই হয় স্বাধীনতার মূল, তবে এদেশের মানুষ অধিকতর মূল্য দিয়েছে। মানবেতিহাসে সংগঠিত অজস্র গণহত্যার ঘটনার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছে ১৯৭১ সালের গণহত্যায়। এই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন এদেশের মানুষ। এদেশের বাঙালি ছাড়াও রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি সম্প্রদায়ের আদিবাসী মানুষ। অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকা, চেতনায় মিশে থাকা তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে জন্ম দিয়েছে মহাকাব্যের। তবুও রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অবহেলিত থেকেছে আদিবাসী মানুষরা। শত শত বছর ধরে বঙ্গ ভূ-খণ্ডে বসবাসরত সম্প্রদায়গুলো বাঙালির মতো সমানভাবেই নিগৃহীত হয়েছে বাংলার পরাধীনতার বছরগুলোতে। বেনিয়া ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রত্যাশায় হয়েছিল তাদেরও হৃদয়। অতঃপর বাঙালির মতোই মোহমুক্তি ঘটেছে। নতুন মুক্তির লক্ষ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেয়েছে আরেকবার। একাত্তরে। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক অবস্থানের মানুষেরা একতাবদ্ধ হয়ে সুখ-দুঃখে সমান অংশীদারিত্ব নিয়ে আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত লড়েছেন। ন্যায় ও সহজ-সরল সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আদিবাসীরা অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার ও আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা মাথায় রেখেও এদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরে

অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তথাকথিত সভ্যতার সুষমা বঞ্চিত এই মানুষদের জীবনযাত্রা শিক্ষা দেয় ন্যায় ও কল্যাণের। অন্তর্গত সেই কল্যাণ কল্পেই এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৪৫টি নৃগোষ্ঠীর সহস্রাধিক নর-নারী প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও সংগ্রামকে সমধিক শক্তিশালী করেছেন শতাধিক মুক্তিকামী মানুষ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়– এ যাবৎ রচিত বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস তাদেরকে সে অর্থে স্থান দেয়নি। কারণ, ৩৬ বছর পেরিয়েও এদেশে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যায়নি। এত বছরেও যথাযথ সম্মান-সম্মাননা মেলেনি সেই লড়াকু মানুষদের, যাদের সুমহান আত্মত্যাগে 'বঙ্গদেশ' থেকে আমরা 'বাংলাদেশ' পেয়েছি। অভাবে, অভিমানে এভাবে চলে গেছে অসংখ্য মানব ; দেশ তাদের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এখনো যুদ্ধে প্রাপ্ত পঙ্গুত্ব নিয়ে পথ হাতড়ে বেড়ান অসংখ্য দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা। সাঁইত্রিশ বছরের স্বাধীনতা এখন তাদের কাছে একটি দীর্ঘশ্বাস অথবা দুঃসহ কষ্টকল্পনা।

এই যদি হয় এদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা, তাহলে আদ্যন্ত বঞ্চনার শিকার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমেয়। চরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার অপ্রত্যাশিত পক্ষপাতমূলক বাস্তবতার কাছে হেরে গিয়ে তাদের কেউ আজ লোকান্তরিত, কেউ দেশান্তরিত এবং কেউ মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়দানে কুণ্ঠিত। জাতীয় প্রয়াস না থাকায় এভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের সংগ্রাম-সাহসিকতার অনন্য গাথা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতাল, মণিপুরী, চাকমা, মারমা, রাখাইন, গারো প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনন্য সাধারণ অবদান উল্লেখের প্রয়াস রেখেছে এ বইতে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ্রোহ-সংগ্রামের ইতিহাসে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে এদের বসবাস উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। ১৯৭১ সালে উত্তরবঙ্গে পাকিস্তানিদের প্রধান ঘাঁটি ছিল রংপুর শহরে। পাকবাহিনীর ২৩তম ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার ছিল এটি। ব্রিগেড কমাণ্ডার আব্দুল্লাহ মালিক। ব্রিগেডটির অধীনে ছিল ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২৬ এফ এফ রেজিমেন্ট, ২৩ ক্যাভালরি এবং ২৯ ট্যাঙ্ক বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম পর্যায় ২৩ মার্চে পাকিস্তানি সেনা অফিসার অবাঙালি লেফটেন্যান্ট আব্বাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রংপুরসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলোতে নেমে আসে অত্যাচারের খড়গ। এহেন অসহনীয় পরিস্থিতিতে দা-কুড়াল, তীর-ধনুকের মতো আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রংপুর সেনানিবাস আক্রমণের মতো দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে আসে সাঁওতাল আদিবাসীরা। ২৮ মার্চ হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র আদিবাসী ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিসবেতগঞ্জ হাট ও তার আশপাশের এলাকাসহ ঘাঘট নদীর তীর ঘেঁষে জমায়েত হতে থাকেন। এমন সময় পাশবিক আক্রোশে গর্জে ওঠে পাকসেনাদের অত্যাধুনিক

আগ্নেয়াস্ত্র। শিকারির তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়া পাখিদের মতো লুটিয়ে পড়ে আদিবাসী মানুষ। সহস্র শহীদের রক্তে রক্ত-বর্ণ হয়ে যায় ঘাঘট নদীর জল। অকুতোভয়, স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রত্যয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত, নিঃশঙ্কচিত্ত, প্রাণ সঁপে দিতে প্রস্তুত ইতিহাসখ্যাত সাহসী সাঁওতালরা তখন থেকেই প্রতিজ্ঞাচিত্ত হয়ে যায় একটি বিন্দুতে– যার নাম স্বাধীনতা।

পূর্ব পাকিস্তানে পরাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পাকিস্তানিরা প্রধান বাধা বিবেচনা করত হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও আওয়ামীলীগ সমর্থকদের। সাঁওতালদের হিন্দু গণনা করে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালায় তাদের ওপর। অবাধ লুণ্ঠনের পর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয় সাঁওতালদের গ্রামগুলোতে। লুণ্ঠনের সেই মহোৎসবে পাকসেনাদের পাশাপাশি সোল্লাসে অংশগ্রহণ করেছিল অতিচেনা বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রতিবেশীরা। পরিকল্পিতভাবে নিমিষেই হস্তান্তরিত হয়েছে দরিদ্র সাঁওতালদের কয়েক দশকের শ্রমে সঞ্চিত সহায়-সম্পদ। জীবনের নিরাপত্তার খাতিরে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় ৩০ হাজার সাঁওতাল। ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া সাঁওতালদের মধ্যে নতুনভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা জাগান আদিবাসী সাঁওতাল নেতা সাগরাম মাঝি (হাঁসদা)। তাঁর প্রচেষ্টায় সাঁওতাল তরুণরা সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ভারতের পাতিরাম, মধুপুর, শিলিগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, পানিঘাটা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনশোরও বেশি সাঁওতাল প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গোদাগাড়ি রাজশাহীর বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বনাথ টুডু ছিলেন একজন প্লাটুন কমান্ডার। চাঁপাই নবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় সংগঠিত বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে তিনি বীরত্বপূর্ণ নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হন। একই থানার সুধীর চন্দ্র মাঝিও কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। নওগাঁর জগদ গ্রামের আদিবাসী তরুণ মাধাই টুডু বিভিন্ন ইয়ুথ ক্যাম্পে এবং চূড়ান্তভাবে পানিঘাটায় এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। চকচান্দাড়ু, বদলগাছি ও পাহাড়পুরের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন তিনি।

এভাবে রক্তে হুলের চেতনা নিয়ে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন সম সরেন, চাম্পাই সরেন, ঠাকুর মুরমু, সুশীল সরেন, দাসু মুরমু প্রমুখ আদিবাসী সাঁওতাল। ফাদার লুকাশ মারান্ডি ছিলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন খ্রিষ্টান যাজক। একাত্তরের অনিশ্চিত সময়ে তিনি ভারতে পলায়নপর শরণার্থীদের রুহিয়া মিশনে দিনাজপুর আশ্রয় ও বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছেন। এই অপরাধে ২১ এপ্রিল পাকসেনারা যাজক লুকাশ মারান্ডিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনিভাবে শহীদ হয়েছেন রাজশাহী কাশিঘুটুর ১১ জন সাঁওতাল এবং রংপুর ও এর আশপাশে ২০০ জন।

১৮ সেপ্টেম্বর ইপিআর কমান্ডার সালেক (বগুড়া), বেঙ্গল রেজিমেন্টের মান্নান, ঢাকা পুলিশের হাবিলদার রজব আলী এবং রণজিত কুমার মহন্ত, প্রদীপ কুমার কর (গোবিন্দগঞ্জ) প্রমুখের নেতৃত্বে সাঁওতাল সেনাদের একটি দলের সাথে হিলির পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে পাক বাহিনীর সাথে ভীষণ সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে বেশকিছু সৈন্যসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় পাকবাহিনী। ঘোড়াঘাটের সাঁওতাল বীর ফিলিপের নেতৃত্বে মাইন বিস্ফোরণে পাকসেনাদের একটি বেডফোর্ড গাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ সময় মুক্তিসেনারা নাটোরের প্রতিটি সরকারি অফিস থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা ওড়ায়। আদিবাসীসহ সর্বস্তরের জনগণের সশস্ত্র বিক্ষোভ-মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল সেদিন নাটোরের রাজপথ।

নাচোল বিদ্রোহসহ বিভিন্ন উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণে স্মরণীয় সাঁওতাল নারীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ি থানার সাঁওতাল আদাড়পাড়া গ্রামের কয়েকটি পরিবার যুদ্ধের সময় গ্রামেই থেকে যায়। পরিবারগুলোর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোনামনি সরেন, মালতী টুডু ও সোহাগিনীদের পরিবার।

এই সাঁওতাল পরিবারগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য আশ্রয়সহ সার্বিক সহযোগিতার কেন্দ্র। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৫/২০ জনের একটি দল সাঁওতাল আদাড়পাড়াতে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বপন, বাচ্চু, জামিন সরেন, সুশীল সরেন, ক্ষুদিরাম মুরমু, সনাতন মুরমু, সুধীরচন্দ্র মাঝি, নাজমুল প্রমুখ। দেশ মুক্ত হওয়ার বেশ কয়েকদিন পূর্বে স্থানীয় রাজাকার যোবেদের প্ররোচনায় এইসব সাঁওতাল পরিবারে হানা দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এসব পরিবারগুলোয় অপূরণীয় ক্ষতি করার পাশাপাশি লাঞ্ছিত করা হয় ষোড়শী যুবতি মালতী টুডুকে।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ সময়ের একদিন রাজশাহী-তানোর সংযোগ রাস্তার ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে যান সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা সুশীল সরেনসহ অপর কয়েকজন। অপারেশন সফল হলেও জনৈক ব্যক্তির সহযোগিতায় তারা পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যান। তানোর সেনাক্যাম্পে নিয়ে তাদের ওপর চালানো হয় অমানুষিক অত্যাচারের স্টিমরোলার। পাকসেনাদের নির্যাতনে সেদিন শহীদ হয়েছিলেন দুজন মুক্তিসেনা।

সাগরাম মাঝি (হাঁসদা), সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক হিসেবে যাঁর নাম অগ্রগণ্য। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট থেকে মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (এলএমএ) সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় অনেক প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। জেলে শহীদ ৪ মহান নেতার অন্যতম কামরুজ্জামানের রাজনৈতিক সহকর্মীও ছিলেন সাগরাম মাঝি। তিনি ১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয়

নেয়া সাঁওতাল শরণার্থীদের ক্যাম্পগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে সাঁওতাল তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশ-মাতৃকার লড়াইয়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকল্পে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অসীম বঞ্চনার শিকার হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাঁওতালগণ। মুক্তিযুদ্ধে জীবন দানকারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য একথা।

এরশাদ শাসনামলে গোদাগাড়ি থানার মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নতিকল্পে বেশ কয়েক লাখ টাকা সহায়তা করা হলেও আদিবাসী সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তার ভগ্নাংশও দেয়া হয়নি। পরবর্তী সময়েও প্রতারণার এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে। আদিবাসী পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা চামপাই সরেনকে রাজশাহীর তানোর থানা নির্বাহী অফিসার একটি বিজয় মেলার উদ্বোধনে আমন্ত্রণ করলে বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তাদের অনেকেই একটি নিম্ন জাতি সাঁওতালদের এ সম্মান মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। এখনো অনেক সাঁওতাল পরিবার বৃহত্তর জাতি কর্তৃক বহুমুখী নির্যাতন, অত্যাচারের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং রাতের আঁধারে দুঃস্বপ্ন হয়ে ভিড় করে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। এভাবেই স্বপ্ন বাঁধার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেন সাঁওতালরা। অথচ কিংবদন্তির নাচোল নেত্রী ইলা মিত্র নাকি সমস্ত শক্তি পেয়েছিলেন সাঁওতালদের কাছ থেকে। (৪ এপ্রিল ১৯৯৩ সালে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছিলেন)।

বছরের ১ ডিসেম্বর পালিত হয় 'মুক্তিযোদ্ধা দিবস'। উদ্দেশ্য– নতুন প্রজন্মের কাছে অসীম ত্যাগ ও সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা। আজ সগর্বে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয় বিকৃত ইতিহাস, যে বিকৃতির কারিগর এদেশেরই কিছু অপরাজনীতির ধারক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা চেষ্টা করেছেন নিজেদের মনগড়া ইতিহাস তৈরির, সেখানে নিজেরাই ইতিহাসের অবিসংবাদিত নায়ক। ভারত-পাকিস্তান যেমন সাতচল্লিশ সালে একটি রেডিও ঘোষণার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে তেমনি বাংলার নতুন প্রজন্মকে বোঝানোর অপচেষ্টা চলেছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাও একটি রেডিও ঘোষণার ফসল। এভাবেই ক্ষমতা জ্ঞানের জন্ম দেয়, মিথ্যে প্রতিষ্ঠা পায় সত্যে, বিকৃত ইতিহাস কাঁদে বিধুর বিষণ্নতায়।

তেমনি বিকৃত ইতিহাসের জন্ম হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী চাকমা সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে। স্বভাবগত সাহসিকতার অধিকারী দেশপ্রেমিক এই সম্প্রদায়ের বাস বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহকালে এ সত্য সম্পর্কে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ছাত্র-যুবক শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের

ইচ্ছে পোষণ করে। কিন্তু তৎকালীন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ হয়তবা অনাস্থা হেতু আদিবাসীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও মুক্তিযুদ্ধে শামিল করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাননি। এছাড়াও উল্লেখ্য- ১৯৪৭'র দেশ বিভাগের প্রধানতম শর্ত ছিল- মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান, আর অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত। স্বভাবতই আদিবাসী প্রধান পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ছিল ভারতের স্বার্থে। এই স্বাভাবিক সম্ভাবনার লক্ষ্যে সে সময় এই অঞ্চলের সচেতন আদিবাসী জনগণ ও নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশ বিভাগ ঘোষণার তিনদিন পরেও ভারতীয় পতাকা ওড়ে। অথচ পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের আদিবাসী বিশেষত চাকমাদের ঢালাওভাবে পাকিস্তানপন্থী বা পাকিস্তানের দালাল বলে অভিহিত করা হয়।

আবার, পাকিস্তান পর্বে ১৯৬০ সালে চালু হওয়া কাপ্তাই বাঁধ এই চাকমা সম্প্রদায়ের সর্বস্ব ক্ষতির কারণ হিসেবে সুবিদিত। পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পিত এই বাঁধের ফলে ১৯৬০ সালেই স্থানীয় চাকমা প্রধান অঞ্চলের নিচু এলাকাগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। ১৯৬১ সালে ডুবে যায় পুরো এলাকার আবাদি জমি থেকে শুরু করে ঘর-বাড়ি সবকিছু। চাকমাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ডুবে গেছে জমির সোনালি ফসল। লেকের পানিতে ভেসে উঠতে দেখেছে ঘর-বাড়ি-গরু-ছাগল-থালা-বাটিসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী। কখনো কখনো দুর্বল শিশু-বৃদ্ধরাও। কারণ, পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধটি চালু করার পূর্বে স্থানীয় আদিবাসীদের জান-মাল রক্ষার লক্ষ্যে একটি সতর্ক ঘোষণারও প্রয়োজন বোধ করেনি। মানবেতিহাসের এই বিরলতম অমানবিক আচরণে সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আবাদি জমির ৪০ ভাগ ডুবে যায় এবং প্রায় ১ লক্ষ আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। এরপর অভাবনীয় এই বিপর্যয়ে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেড় কোটি টাকা দেয়া হয়। এর সিংহভাগ আবার দেশীয় রাজনীতিবিদ ও আমলারা শুষে নেয়। এই ঐতিহাসিক কাপ্তাই বাঁধের ফলে আদিবাসী চাকমাদের মতোই কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের জন্যে অভূতপূর্ব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন আদিবাসী মারমারা। তাই স্বভাবতই এ ধরনের আদিবাসীদের জন্য অকল্যাণ কর্মকাণ্ডের জন্যে পাকিস্তান সরকারের প্রতি এদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো অত্যন্ত বিরূপ ছিল। এজন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের মতো সংখ্যালঘু আদিবাসীদেরও অন্তর্গত বাসনা ছিল পাকিস্তানি শাসনের অবসান। অর্থাৎ এদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা। শোষণ-বিরোধী একই রকম বাসনায় তাড়িত ছিল অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায়, চাকমারা।

যদিও প্রচারণা রয়েছে- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চাকমা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে। বলা হয়ে থাকে, চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় যখন পাকিস্তানের পক্ষ নেয় তখন সমস্ত চাকমা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী

কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। কিন্তু চাকমা নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের ভাষ্যে– এ সত্য গবেষকদের ঐতিহাসিক অবমূল্যায়নের নামান্তর। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এই জাতিটিকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে জাতীয়তাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক প্রপঞ্চ হিসেবে নির্দিষ্ট করে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। যেমন– পাকিস্তান পর্বে এদেরকে বলা হত ভারতপন্থী, আবার '৭১ ও পরবর্তী বাংলাদেশ পর্বে এদের বলা হয় পাকিস্তানপন্থী। তবে এটা সত্য যে অসংখ্য বাঙালির মতো আদিবাসী কিছু বিপথগামী পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক ও বেসামরিকভাবে স্বাধীনতা বিরোধী বিভিন্ন অপকর্মে শামিল হয়েছে। মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো পৃথিবীর যে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেই এই সত্যের উপস্থিতি রয়েছে।

চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় '৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ নিলেও চাকমা রাজ পরিবারের অন্যতম সদস্য কে. কে রায়ের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে রয়েছে। প্রখ্যাত চাকমা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে এরকম সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছিল অসংখ্য চাকমা ছাত্র, যুবক ও সচেতন সাধারণ মানুষ। তাদের ভাষ্য মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক এইচ. টি. ইমাম এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর রহমানের ষড়যন্ত্রে চাকমা সম্প্রদায়কে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। এর অনেক অনেক প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য রসময় চাকমা, তাতিন্দ্রলাল চাকমা প্রমুখের নাম। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন রসময় চাকমা। এ লক্ষ্যে দেশে উত্তাল পর্বের শুরু হলেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখানো ও ট্রেনিং গ্রহণের জন্য ছুটে যান ভারতের রস্যাবাড়ি। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেখানে তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে আসেন রসময় চাকমা। তখনো চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ। তাই দেশে ফিরে এসে খাগড়াছড়ির মাইছছড়িতে জায়গীর খান নামক এক পাঞ্জাবির বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেন।

এই পাকিস্তান-বিরোধী ঘটনায় তার ওপর হুলিয়া জারি করা হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরেও তাকে পাকসেনাদের দৃষ্টিচক্ষুর আড়ালে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। রসময় চাকমার মতোই আরেক আদিবাসী তাতিন্দ্রলাল চাকমা। কলেজের ছাত্র থাকাকালেই ছাত্রলীগ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাতিন্দ্রলাল। অসংখ্য পাকিস্তান-বিরোধী রাজপথ-কাঁপানো মুক্তির মিছিলে ছিল তাঁর উচ্চকণ্ঠী সপ্রতিভ অংশগ্রহণ। তাই মুক্তিযুদ্ধের মাহেন্দ্রক্ষণে আগেভাগেই ট্রেনিং সম্পন্ন করে সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি। সঙ্গী করেছিলেন আরো অনেক আদিবাসী চাকমা যুবকদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

উল্লিখিত তাতিন্দ্রলাল ও রসময় চাকমার মতো অনেক আদিবাসী চাকমা সেদিন বিফল মনোরথ হয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়ে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশাগ্রস্ত হয়ে ও পাকসেনাদের ইন্ধনে সিভিল আর্মড ফোর্স অথবা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাঙালি রাজাকারদের অধিকাংশ বিভিন্নভাবে পার পেয়ে গেলেও চাকমা আদিবাসীদের ক্ষেত্রে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল এর। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-উত্তর কালেই মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কতিপয় দল পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা প্রধান কুকিছড়া, পানছড়ি, কানুনগো পাড়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গণহত্যা চালায় ও লুটপাটের মহোৎসব করে। পরবর্তী সময়েও পার্বত্য জেলাসমূহের চাকমা প্রধান বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় বিছিন্নতাবাদী মিজোদের খুঁজতে গিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী তাদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়।

এসব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে কিছু সংখ্যক আদিবাসী ছাত্র-যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তাদের প্রতি শীতল আচরণ করা হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এই আচরণে হতাশ হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই আর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান নি। জানা যায়, পাকিস্তানি আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত কারণে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তারা আদিবাসীদের বিশেষ করে চাকমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত করতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই অবস্থায় তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের পক্ষে সমগ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত হওয়ার আহ্বান জানানোর মতো দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিতে তৎকালীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ব্যর্থ হন। এই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শান্তি বিনষ্টকারী অপতৎপরতা বলে উল্লেখ করে আদিবাসী যুবকদের নিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করে। তবুও তৎকালীন ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের দিয়ে বিভিন্ন লোভ-লালসা সত্ত্বেও চেতনায় স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে শত সহস্র আদিবাসী তরুণ, শহীদ হয়েছে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথাগত ইতিহাসে চাকমা আদিবাসী প্রধান রাজা ত্রিদিব রায়ের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা এবং আদিবাসী যুবকদের একটি অংশের কতিপয় বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের কথাটাই ফলাও করে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অজুহাতে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাস্তবতা ভিন্ন হলেও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সমজাতীয় ধারণা পোষণ করে মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙা থানাধীন আসালং, বড়বিল, তাইন্দ্যং এবং তবলছড়ি মৌজায় বসবাসকারী অসহায় আদিবাসীদের

গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। আদিবাসী জীবনে এই অপঘটনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ভস্মীভূত এলাকার আদিবাসীরা এরপর আশ্রয় নেয় বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, খাগড়াপুর ও মহালছড়ি এলাকায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা তাদের নিজ ভিটা-মাটিতে ফিরে যেতে পারেনি।

যুদ্ধকালীন এসব খণ্ড খণ্ড বীভৎসতা ছাড়াও যুদ্ধশেষে এর রেশ থেকে যায় পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীপ্রধান এলাকাসমূহে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর যে দল মাটিরাঙা উপজেলা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে (বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা) প্রবেশ করে, সে দলটি বর্তমান পানছড়ি এবং দীঘিনালা উপজেলার বেশ কয়েকটি আদিবাসী গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং কিছুসংখ্যক আদিবাসী পুরুষকে হত্যা, অসংখ্য আদিবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মারধর করে। এ ধরনের সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে সে সময় বেদখল করা হয় অসংখ্য আদিবাসীদের সহায়-সম্পত্তি।

এছাড়াও যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতির রেকর্ড অনুযায়ী ৩ জন চাকমা তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাবে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও, পরবর্তীতে তা রহিত হয়। বৃহত্তর জাতি কর্তৃক এসব অসংখ্য বৈষম্যমূলক আচরণে বিক্ষুব্ধ আদিবাসী চাকমা সম্প্রদায়ের 'শান্তি বাহিনী' নামক বিকল্প পথে পথ চলা শুরু হয়। তবে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার ক্ষুদ্রাংশ নিরসন হলেও তা মুছে ফেলা যায়নি। এই সাহসী আদিবাসী সম্প্রদায় বাংলাদেশের গর্ব ও অহংকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা এক সময় মং সার্কেলের অধীনে একটি দেশীয় স্বশাসিত রাজ্য ছিল। একাত্তরের ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনগোষ্ঠীও বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করে। ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলে আন্দোলন। মং সার্কেলের রাজা মপ্রু সেইন এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে রাজা ও মং জনগণের চাপা ক্ষোভ ছিলো দুটো কারণে। ১. ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এই রাজ্যের রাজা বা রাণী ছিল সর্বময় ক্ষমতা । পাকিস্তানি শাসকরা ক্রমশ তাদের ক্ষমতা রহিত করে। ২. সরকার কাপ্তাই বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এই অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি লেকের তলায় তলিয়ে যায়। পরে এজন্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের উপর্যুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়নি বা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনেরও প্রয়োজন মনে করেনি।

এসব কারণে ক্ষুব্ধ পার্বত্যবাসী পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে । প্রথমদিকে রাজা মপ্রু'র রাজবাড়িটি শহর

থেকে পালিয়ে আসা ভীত-সন্ত্রস্ত জনসাধারণের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজা তার রাজভাণ্ডারের সব সম্পদ আশ্রিতদের অন্ন সংস্থানের জন্য নিয়োজিত করেন। চিকিৎসা সেবার জন্য একটি হাসপাতালও চালু করেন। পার্বত্য নারীরা মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজা গড়ে তোলেন প্রতিরক্ষা ব্যূহ। তার নিজের ৩৩টি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। নিজের ব্যবহৃত কার ও কয়েকটি জিপ গাড়িও মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হস্তান্তর করেন।

এক সময় মানিকছড়ির পতন অত্যাসন্ন হয়ে এলে রাজা তার রাজবাড়ি ও মাতৃভূমি পেছনে ফেলে পরিবার ও দলবল নিয়ে ত্রিপুরার সাবরুম শহরে যান। সাবরুম সীমান্ত-সংলগ্ন হওয়ায় নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে রাজা রূপাইছড়ি শরণার্থী শিবিরে গিয়ে সাধারণ শরণার্থী জীবন যাপন শুরু করেন। নিকটবর্তী হরিণা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্যূটার এবং অস্ত্র প্রশিক্ষক থাকার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে লেগে গেলেন তিনি। এসময় রাজা মপ্রু'র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার খবর বিবিসিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ও সংস্থার প্রতিনিধিদের নিকট দেয়া সাক্ষাৎকারে আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বের সকল বিবেকবান ও স্বাধীনতাকামী মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য রাজা মপ্রু হয়ে ওঠেন এক বিপজ্জনক ব্যক্তি। তারা রাজাকে হত্যা বা ছিনতাই করার ফন্দি আঁটে। মিজো বিদ্রোহীরা ছিল রাজা-বিরোধী। পাকিস্তানিরা মিজো বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র কাজে লাগায় । এতে রাজার অবস্থান বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে সপরিবারে আগরতলায় স্থানান্তরিত করে। কিন্তু না, রাজা নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে নিশ্চুপ থাকেন নি। তিনি সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেবার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বেশকিছু অপারেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর ত্রিপুরার মহারাজ কিরিত বিক্রম তার রাজপ্রাসাদে রাজা মপ্রু'র পরিবারকে আশ্রয় দেন। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন। মুক্তিবাহিনী ও পরে মিত্র বাহিনীর সাথে একত্রে এক সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িত হন। মিত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনারারি কর্নেল র‍্যাঙ্ক দিয়ে এক ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাথে রাজাকে সম্মুখ সমরে পাঠান। প্রথমে আখাউড়া অপারেশন । অতঃপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আশুগঞ্জ ও ভৈরব। ভৈরব থেকে মপ্রু মিত্র বাহিনীর সাথে ১৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত ঢাকা শহরে প্রবেশ করেন।

বিজয়ের আনন্দ উদযাপনের পর আগরতলা গিয়ে নিজ পরিবার নিয়ে মানিকছড়ি ফেরেন । তখন রাজবাড়ির সর্বস্ব লুটপাট, বাড়িটিও প্রায় ধ্বংস স্তুপ । ফটিকছড়ি থেকে ভাড়া করা হাঁড়িপাতিল, থালা-বাসনে রাজ পরিবারের লোকজনদের আহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। সর্বস্ব হারিয়ে রাজা মপ্রু এক স্বাধীন দেশের পত্তনে অবদান রাখতে পেরেছেন এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজা এজন্য কোন সরকারের নিকট থেকে কখনো ক্ষতিপূরণ, সহায়তা, এমনকি স্বীকৃতিও পাননি।

বিপুল ধ্বংস, ব্যাপক গণহত্যা, অসংখ্য মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলা এবং অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটি অনন্যপূর্ব ঘটনা। আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশ। এই অর্জনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে অংশগ্রহণ ছিল দেশের সর্বস্তরের মানুষের। রাখাইনরা এদেশেরই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। তাদেরও ছিল একটি সমৃদ্ধ জনপদ, স্বতন্ত্র-স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য। বর্মি সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর ছোবলে সবকিছু হারিয়ে এদেশে থিতু হয়েছিল তারা। অভিজ্ঞতায় স্বাধীনতা হারানোর বেদনা, চেতনায় পরাধীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার বশেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্ব রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় অসংখ্য রাখাইন তরুণ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অসহায় বাঙালিদের আশ্রয়দান ও মুক্তিযোদ্ধাদের নানামুখী সহায়তা ছাড়াও রাখাইনরা দেশের বৃহত্তর অংশের সাথে একাত্ম হয়ে জীবন-মরণের সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে। তেমন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হলেন– কক্সবাজার অঞ্চলের উ-মংয়াইন, উ-ক্যহ্লাচিং (প্রয়াত কাস্টমস অফিসার), পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলের উ-উসিতমং (কৃষিবিদ) প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছেন রামু উপজেলার বিলুপ্ত রাখাইন পাড়ার মংয়াইন, মহেশখালীর মংহ্লা। এরা বাংলাদেশ সরকারের তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা। এঁদের ছাড়াও এমন অসংখ্য সহজ-সরল রাখাইন মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁদের পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তারা 'মুক্তিযোদ্ধা' নাম বিকিয়ে বাড়তি সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশা করেনি। স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের প্রতি তেমন প্রচেষ্টার অবকাশ মেলেনি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সাথে চীনের বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক ছিল। জানা যায়, ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানিদের অস্ত্রের যোগান দিয়েছে চীন। সঙ্গত কারণে চীনের প্রতি পাকিস্তানিদের কৃতজ্ঞতা ছিল। এ সময় রাখাইনদের কেউ কেউ নিজেদের 'চায়না বৌদ্ধ' বলে পরিচয় দিয়ে মুক্তি পেলেও পাকিস্তানি নৃশংসতায় নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাখাইন জনপদ। ১৯৭১'র মে মাসের একদিন মহেশখালীর ঠাকুরতলা বৌদ্ধ বিহারে অনুপ্রবেশ করে পাক

সেনারা। বিনা অপরাধে তারা বিহারের মহাথেরো উ-তেজিন্দাসহ সাত জন শিষ্যকে বাইরে নিয়ে এসে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চচামং ও চিং হ্লা মং পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বিহার অধ্যক্ষসহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। বৌদ্ধ বিহারের ৬২টি রৌপ্য মূর্তি লুণ্ঠন ও কয়েকটি শ্বেত পাথরের মূর্তি ধ্বংস করে উন্মুক্ত হিংস্রতার পরিচয় দেয় পাকসেনারা। একই এলাকার দক্ষিণ রাখাইন পাড়ার বৌদ্ধ বিহারেও সমান বীভৎসতার জন্ম দেয় তারা। বিহার পুরোহিতের সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত তিনজন নিষ্পাপ নিরপরাধ শিষ্যকে মন্দিরের রান্নাঘরে জোর করে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়ে মন্দিরে আগুন জ্বালিয়ে দেয় পাকিস্তানি পশুরা। নিরপরাধ তিন রাখাইন বালকের মর্মান্তিক মৃত্যুদৃশ্য উপভোগ কেবল কোনো নিষ্ঠুর পশুরই মানায়। এমনিভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদের আদিম বর্বরতার শিকার হয়েছে অসংখ্য আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ। বরাবর প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী সহজ-সরল রাখাইনদের এসব করুণ আলেখ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এখনো উপেক্ষিত।

শত শত বছরের সংগ্রাম, সাধনা, নিরলস প্রচেষ্টা, রক্তস্নাত ত্যাগ মহিমায় বর্তমান বাংলাদেশের অর্জন। ব্রিটিশদের 'Trade & Territory' নীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে পরাধীনতার সবটুকু বিষাক্ত নির্যাস পতিত হয়েছিল এদেশের মানুষের ওপর। তবুও তাঁরা ভেঙে পড়েননি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় একাত্ম হয়ে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় প্রাণ বাজি রেখে শত্রুর সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। অবশেষে শরীরের শেষবিন্দু রক্তের বিনিময়ে হলেও স্বাধীনতার সত্য রূপায়ণে সংগ্রাম সমরে সমুত্তীর্ণ হয়েছে তারা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই একাত্ম হয়েছে সেই মুক্তির মিছিলে। এভাবেই ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম এবং আত্মাহুতির মহাতরঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ হয়েছে এক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তার অংশ। একই সমতলে লীন হয়ে গেছে মানবসৃষ্ট সকল সীমারেখা, বিভেদের দেয়াল। দেয়াল ভেঙে মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশের মণিপুরী সম্প্রদায়।

২৫ মার্চ '৭১-এ পাকসেনাদের গণহত্যার তাণ্ডবে ঢাকা শহর থেকে মানুষরা নিরাপত্তার সন্ধানে গ্রামমুখী হলে পড়লে পাকিস্তানি তাণ্ডব সেখানেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মণিপুরী অধ্যুষিত মৌলভীবাজারের ভানুগাছ, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, ছাতকের কোম্পানিগঞ্জ ও সিলেটে পাক সেনাদের এক সময় অনুপ্রবেশ ঘটে। নৃশংস হত্যার শিকার হয় নিরপরাধ ছাত্র, যুবা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। তখন থেকেই মণিপুরী চেতনায় জেগে ওঠে স্বাধীনতা লাভের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। শারীরিকভাবে সক্ষম মণিপুরী আদিবাসীরা পালিয়ে ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ যুদ্ধে।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ভানুবিল গ্রামে আগস্ট মাসের ১২ তারিখে পাঞ্জাবি সেনারা প্রবেশ করে মণিপুরী-বিষ্ণুপ্রিয়া ব্রাহ্মণ সার্বভৌম শর্মাকে গ্রেফতার করে এবং চোখ বেঁধে পূর্বদিকের জঙ্গলে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প ছিল কামারছড়া চা বাগানে। ক্যাম্পের সন্নিকটে বাংকার খনন ও জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্যে পালাক্রমে স্বেচ্ছাশ্রমে বাধ্য করা হয় ভানুবিলের প্রতিটি মণিপুরী আদিবাসীকে। এ সময়ে জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন আদিবাসী যুবক পালিয়ে ভারত যেতে সক্ষম হয়। এভাবেই সুযোগ বুঝে ভারতে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নেয় বেশ কয়েকজন আদিবাসী মণিপুরী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– কৃষ্ণ কুমার সিংহ, বাবুসেনা সিংহ, বিদ্যাধন সিংহ, কুলেশ্বর সিংহ (শিক্ষক), মানত্রী সিংহ প্রমুখ। এছাড়াও সতীশচন্দ্র সিংহ, নীলকান্ত সিন্‌হা, ব্রজমোহন সিংহ, মণি সিংহ, থইবা সিংহ, নিমাই সিংহ, বিশ্বম্ভর সিংহ, দীনমনি সিংহ, বাপ্পী সিংহ, বসন্ত কুমার সিংহ, ব্রজেন্দ্র সিংহ, কুন্‌জ সিংহ, পদ্মাসন সিংহ, হীরেন্দ্র সিংহ, দিলীপ সিংহ, বীরেশ্বর সিংহ, ধনো সিংহ, আনন্দ সিংহ, সুরমনি সিংহ, নন্দেশ্বর সিংহ, ভুবন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অগ্নিঝরা একাত্তরের অসামান্য অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত কথনই এক একটি অভূতপূর্ব মহাকাব্য সৃষ্টির দাবি রাখে। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এঁরা ছিলেন মহাকাব্যের সংশপ্তকদের মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাকসেনাদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে গিয়ে বাঘিনীর কবলে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন মৌলভীবাজারের কালিগঞ্জ গ্রামের ব্রজেন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনাদের হাতে ধরা পড়েও বেঁচে এসেছেন উত্তর ভানুবিলের বাবুসেনা সিংহ। তবুও অসংখ্য মহান মুক্তিসেনার মতো স্বাধীনতার শপথে বলি হয়েছেন মাধবপুর গ্রামের গিরীন্দ্র সিংহ। পাকসেনাদের অকথ্য অত্যাচারে শহীদ গিরীন্দ্র সিংহের মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় রক্তাক্ত ধলাই নদীর বুকে।

এমনি অনেক মণিপুরী অস্ত্রসৈনিকের মতো মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় ভাস্বর হয়েছেন বেশ কয়েকজন মণিপুরী শব্দসৈনিক। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধন সিংহ, অনিতা সিন্‌হা, বাণী সিনহা প্রমুখ। ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে তারা মুক্তির গানে উজ্জীবিত করেছেন মুক্তিপিয়াসী জনতাকে। তাদের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন বাঙালি শিল্পী শিবু ভট্টাচার্য, শ্রীদাম (নৃত্য শিল্পী), হিমাংশু গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট জন। ঘুরে ঘুরে সংগীত পরিবেশন করে তা থেকে উপার্জিত অর্থ তারা দান করেছেন বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরী আদিবাসীদের অসামান্য বীরত্বকথন উল্লেখের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধায় যাদের নাম অবশ্য স্মরণীয়, তারা হল মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক নীলমনি চট্টোপাধ্যায়, নন্দেশ্বর সিংহ, বিজয় সিংহ প্রমুখ। এদের

মধ্যে নীলমনি চট্টোপাধ্যায়'র প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল প্রায় ১২০০ মুক্তিসেনার একটি প্রতিরোধ বাহিনী।

পৃথিবীর ইতিহাসে অবিশ্বাস্য ত্যাগে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বাইরেও রয়েছে ৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সী ২ লাখ ৬৯ হাজার নারীর লাঞ্ছনার বিষণ্ণ ইতিহাস। এর মধ্যে দেশাভ্যন্তরে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন ২ লাখ ২ হাজার ৫শ ২৭ জন এবং যার মধ্যে শতকরা ৭০ জনই ছিল স্পষ্ট গণধর্ষণের শিকার। আনুপাতিক হারে এই পাকিস্তানি বীভৎসতার শিকার হয়েছিল আদিবাসী মণিপুরী নারীও, যাদের অনন্তপ্লাবী অশ্রুস্নানে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামক একটি কদর্য রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়ে উঠেছে 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন সার্বভৌম দেশ।

অদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অতুল্য কিছু বৈশিষ্ট্য

একাত্তরে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য দেশপ্রেমের বোধ থেকে দেশের অসংখ্য আদিবাসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেকে অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতি অথবা জীবনরক্ষার তাগিদ থেকেও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তেমনি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালে অনেক মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে মুক্তিযোদ্ধাই রয়েছেন। আবার অনেকেই একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা হয়েও পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা থাকেননি। অনেকে বলেন, তারা বস্তুত রাজাকারই বনে গেছেন। কারণ, একাত্তরের রাজাকাররা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উপাদান নানা প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেছে যত্রতত্র। সম্প্রতিকালে ওই একইভাবে একই উপাদান যে মুক্তিযোদ্ধারা চর্চা করছে, তারা রাজাকার বৈ তো কিছু নয় !

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের একজনকেও এই জঘন্য প্রক্রিয়ায় শামিলরত বলে দেখা যাবে না। তাদের আচরণে কপটতা ও জটিলতা নেই। আর তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। ফলে, এই সকল নোংরা উপাদান ব্যবহারে তারা অজ্ঞ, অনভ্যস্ত।

মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় মর্যাদা ও গর্বমণ্ডিত স্মৃতি। অনেকে এই সনদ দেখিয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আয়ত্ত করেছেন। সনদ বা মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ের বদৌলতে বৈধ-অবৈধ পন্থায় বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিকানা অর্জন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা আদৌ সনদ গ্রহণ করেন নি। অনেকে এ সম্পর্কে জানতেনও না । অনেকে তা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। ফলে, আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের যারা সনদ গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকেই তা হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছেন। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার প্রায় একশ' আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার বর্তমান পেশা হল দিনমজুরি। এমনকি পরিবারের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দিনমজুরি করছেন বেশিরভাগ। এই এলাকারই একজন মুক্তিযোদ্ধা জীবিকার আর কোনো অবলম্বন

না পেয়ে মানুষের দশ দুয়ারে ভিক্ষা করতে শুরু করেন। তিনি কোনো বাড়ির দুয়ারে পৌঁছে খটাস করে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিতেন। ভিক্ষাবৃত্তি তাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি বিধায় একসময় তিনি দেশান্তর হয়ে চলে গেছেন সেই মেঘালয়ে, যেখানে তিনি একদা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে লড়াকু সৈনিকটি কোন বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তা আর জানা যায়নি। এখন আর আসলে কারো জানার দরকারও পড়ে না।

সুজিত মারাঙ আরেক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা। হালুয়াঘাট এলাকার, জীবনধারণের জন্য এদেশ, যে দেশ তিনি যুদ্ধ করে অর্জন করেছিলেন। এখন মেঘালয়ের পাহাড় বা জঙ্গলে বসে হয়ত স্মৃতি হাতড়ান, সান্ত্বনা খোঁজেন। হিসাব মেলাতে পারেন না। তবে দেশত্যাগের আগে তার মা'র নিকট গৌরবমণ্ডিত আমানত অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সনদ গচ্ছিত রেখে গেছেন। কেবল সুজিত মারাঙই নয়, অনেক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাই দেশান্তরিত হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা প্রণব রিছিল বর্তমানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাজনীতিবিদরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজনীতি করেন। বাস্তবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তারা কেউ কিছুই করে নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধারা বড়ো অসহায় অবস্থায় আছেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেও তাদের লজ্জা লাগে।

পঁচাত্তরে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গারো পাহাড় এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনী যে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে তাতে মূল শক্তিই ছিল গারো আদিবাসী। এর কারণ মূলত আদের হতাশা, বঞ্চনা ও আশাভঙ্গের বেদনা। আলবার্ট মানখিন নামে একজন গারো লেখক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, '১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সীমান্ত এলাকায় যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তা কাদেরিয়া না বলে গারো বিদ্রোহ বলা যায়। এই কাদেরিয়া সংগ্রামে শত শত আদিবাসী যুবক অংশগ্রহণ করেছিল জীবনে না-পাওয়ার হতাশাবোধ থেকেই। এদের অনেকেই ছিল একাত্তরের নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ-পরবর্তীতে তাদের কোনো স্বীকৃতি মেলেনি। তাই তাদের অন্তরের বেদনা ও আক্রোশ নিয়ে তারা ফুঁসে উঠেছিল । প্রকৃত অর্থে ঐ সময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষোভটাই উস্কে উঠেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ছিলেন না। রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃতি ও বঞ্চনাই ছিল মূল ফ্যাক্টর। যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই বলবেন যে যুগে যুগে বঞ্চনা, অস্বীকৃতি ও শোষণের ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে নানা বিদ্রোহ-যুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সম্প্রতিকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের

পাহাড়িয়াদের সংগ্রাম ও শান্তিচুক্তি। এ সমস্ত বঞ্চনা, শোষণ ও [illegible] ইতিহাসে নবপ্রেক্ষাপটের সূচনা।

যোদ্ধাকথা. অসততার পরাকাষ্ঠায় নিজেকে খুইয়েছেন একাত্তরের অনেক মুক্তিযোদ্ধাই। পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের দলেও গিয়ে ভিড়েছেন অনেকে। পাকিস্তান-প্রীতির মনোভাবও পোষণ করেন এখন অনেকে। খেতাব ও তকমাধারী আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছেন এর মধ্যে। অথচ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের একজনও এমন আত্মবিক্রয়ের বাজারের পণ্যে পরিণত হননি। তাদের অসামান্য অবদানের বিনিময়ে তিল পরিমাণ সুবিধা আদায়ের দৌড়ঝাঁপে তারা মত্ত হননি। বস্তুত তাদের বোধে এবং তাদের সংস্কৃতিতে এই উপাদনগুলোই অনুপস্থিত।

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (অসম্পূর্ণ)

আদিবাসী মণিপুরী মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম ও থানা	জেলা
১.	নীলমনি সিংহ (ননী)	লালা দিঘীর পাড়	সিলেট
২.	আদিত্য শর্মা (কংকর)		সিলেট
৩.	টি. অবনী কুমার সিংহ	সুবিদবাজার	সিলেট
৪.	কে. দীলিপ কুমার সিংহ	শিবগঞ্জ	সিলেট
৫.	এম. কিরণ সিংহ	শিবগঞ্জ	সিলেট
৬.	থাংজম জীতেন সিংহ (মৃত)	শিবগঞ্জ, টিল্লাপাড়া	সিলেট
৭.	এম. মনমোহন সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	হবিগঞ্জ
৮.	কারাম নীলবাবু সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	হবিগঞ্জ
৯.	নীলচান দত্ত	দুধপাতিল, গাজিপুর	হবিগঞ্জ
১০.	কে. এইচ নীলবাবু সিংহ	যাত্রাগাঁও, গাজিপুর, সুবিদবাজার	হবিগঞ্জ
১১.	মাইবম প্রমোদ সিংহ (মৃত)	ফাতাবিল, গাজিপুর	হবিগঞ্জ
১২.	খোমদ্রাম প্রতাপ চন্দ্র সিংহ	নলধরী, কর্মধা	মৌলভীবাজার
১৩.	এরাংবম অরবিন্দ সিংহ (টলরিজাউ)	নলধরী, কর্মধা	মৌলভীবাজার
১৪.	ভূমখাম ললিত সিংহ	নলধরী, কর্মধা	মৌলভীবাজার
১৫.	হেনাফ সানাতোন সিংহ (মৃত)	নলধরী, কর্মধা	মৌলভীবাজার
১৬.	এল. হরেন্দ্র সিংহ	বরইতলা, সাগরনাল	মৌলভীবাজার

১৭.	বসন্ত কুমার সিংহ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
১৮.	বীরেশ্বর সিংহ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
১৯.	মন্ত্রী সিংহ	ভানুবিল	মৌলভীবাজার
২০.	প্রতাপ চন্দ্র সিংহ	কুলাউরা	মৌলভীবাজার
২১.	মনমোহন সিংহ	ভুবনখোলাবাগ	হবিগঞ্জ
২২.	নীলবাবু সিংহ	আবাদগাঁও	হবিগঞ্জ
২৩.	আব্দুল হামিদ	চন্দ্রঘোনা	রাঙামাটি
২৪.	থইবা সিংহ	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ

শহীদ মণিপুরী মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম ও থানা	জেলা
১.	খো. রমন সিংহ	আম্বরখানা	সিলেট
২.	নোংমাইখেম গৌরমোহন সিংহ	গোয়াইপাড়া	সিলেট
৩.	খো. খগেন্দ্র সিংহ	সুবিদবাজার	সিলেট
৪.	খো. খোমদোল সিংহ	সুবিদবাজার	সিলেট
৫.	কারাম আতেন সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	সিলেট
৬.	ই. কূলচন্দ্র সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	সিলেট
৭.	থোকচোম কৃষ্ণমোহন সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	সিলেট
৮.	থোকচোম অক্ষয় কুমার সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	সিলেট
৯.	এম. নরেন্দ্র সিংহ	গোবরখোলা, গাজিপুর	সিলেট
১০.	গৌরচন্দ্র সিংহ	ছোট ধামাই, মুড়ি	মৌলভীবাজার

আদিবাসি গারো মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম ও থানা	জেলা
১.	আশীষ বাউল	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
২.	দীপক সাংমা	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
৩.	অরুন দেবনাথ	বিরিশিরি	নেত্রকোনা

৪.	অশেষ বাউল	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
৫.	নোয়েল বিশ্বাস	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
৬.	স্নিতা বিন্দু বাউল	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
৭.	বিন্দু সাংমা	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
৮.	মতিলাল সরকার	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
৯.	স্পেনসন হাজং	ভরতপুর	নেত্রকোনা
১০.	ডথউফিল হাজং	বালুচরা	নেত্রকোনা
১১.	পরমল দ্রং (শহীদ)	মণিকুড়া, হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
১২.	ফাং লুকাশ মারান্ডি (শহীদ)	বেণিদুয়ার	নওগাঁ
১৩.	একজিবিশন বনোয়রি	ভালুকাপাড়া	নেত্রকোনা
১৪.	অনাথ নকরেক	রানীখং	নেত্রকোনা
১৫.	অরবিন্দ সাংমা	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
১৬.	ধীবেন্দ্র রিছিল	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
১৭.	স্তেফান নকরেক	বালুচরা	নেত্রকোনা
১৮.	ভদ্র মারাক	বিড়ইডাকুনী	নেত্রকোনা
১৯.	যতীন্দ্র সাংমা	বিরিশিরি	নেত্রকোনা
২০.	বিকাশ কুমার সরেন	নাটোর	নাটোর
২১.	তাসিসিউস এ. সাংমা	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
২২.	ফাঃ রর্বাট মানখিন	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৩.	সুবাস বুরাম	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৪.	ধীরেন রিছিল	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৫.	ফবিদ আশাক্রা	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৬.	ফেলিক্স আশাক্রা	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৭.	নলিনী বনোয়ারী	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৮.	কোচ দারিং	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
২৯.	দেবেশ ম্	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
৩০.	দানিয়েল আর. ভুবাম	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
৩১.	যতীন্দ্র রাংমা	রানীখং ধর্মপল্লী	নেত্রকোনা
৩২.	নিখিল রেমা	গাজীরভিটা, বিড়ইডাকুনী	নেত্রকোনা
৩৩.	থমাস রিছিল	ভুটিয়াপাড়া	নেত্রকোনা
৩৪.	ক্রিমসন বনোয়ারী	ভুটিয়াপাড়া	নেত্রকোনা
৩৫.	রমেন্দ্র পাঠাং	সূর্যপুর	নেত্রকোনা

৩৬.	টার্নিশ চাম্বু গং	ঝাটাপাড়া	নেত্রকোনা
৩৭.	মন্টু পাঠাং (মৃত)	চরবাঙালিয়া	নেত্রকোনা
৩৮.	ভুপেন্দ্র মান্দা	চরবাঙালিয়া	নেত্রকোনা
৩৯.	গুনেন্দ্র মারাক	কাটাবাড়ি	নেত্রকোনা
৪০.	অনিন্দ্র নকবেক	রাংবাপাড়া	নেত্রকোনা
৪১.	অমুল দ্রং	কাটাবাড়ি	নেত্রকোনা
৪২.	পরিমল যাগ্রা	কাটাবাড়ি	নেত্রকোনা
৪৩.	স্বপন চিসিম (মৃত)	নলকুড়া	নেত্রকোনা
৪৪.	রজেন্দ্র মারাক	ভুটিয়াপাড়া	নেত্রকোনা
৪৫.	আইনদিন রাংসা (মৃত)	গোবরকুড়া	নেত্রকোনা
৪৬.	জেবুম রেমা	চরবাঙলিয়া	নেত্রকোনা
৪৭.	বিমল ঘাগ্রা	গোবরকুড়া	নেত্রকোনা
৪৮.	লিলুন চিরান	সূর্যপুর	নেত্রকোনা
৪৯.	লেজেন্দ্র সাংমা	চিনাবিল	নেত্রকোনা
৫০.	বেঞ্জামিন চিছাম	গোবরকুড়া	নেত্রকোনা
৫১.	লেলুন রংদি	ভুটিয়াপাড়া	নেত্রকোনা
৫২.	কাজল চাম্বুল	গোবরকুড়া	নেত্রকোনা
৫৩.	ডেভিড দিও	বাংরাপাড়া	নেত্রকোনা
৫৪.	বিপ্রবরণ রিছিল	বাংরাপাড়া	নেত্রকোনা
৫৫.	হেটিশ চিসিম	ধলাপানি	নেত্রকোনা
৫৬.	নৃপেন্দ্র নকরেক	বোয়ালমারা	নেত্রকোনা
৫৭.	পরেশ রাংসা	ডাকিয়াপাড়া	নেত্রকোনা
৫৮.	শিমোন চিরান	চরবাঙালিয়া	নেত্রকোনা
৫৯.	বাজেন্দ্র মারাক	সূর্য পুর	নেত্রকোনা
৬০.	কানেশ আজিম	গোবরকুড়া	নেত্রকোনা
৬১.	প্রত্যেশ বাংসা	নলকুড়া	নেত্রকোনা
৬২.	তরুণ চিসিম	বাংরাপাড়া	নেত্রকোনা
৬৩.	দীপসন সাংমা	ধলাপানি	নেত্রকোনা
৬৪.	ডিপারসন ঘাগ্রা	চরবাঙালিয়া	নেত্রকোনা
৬৫.	হার্ডসন সাংমা	ধলাপানি	নেত্রকোনা
৬৬.	অমল রিছিল	ডুমনিকুড়া	নেত্রকোনা
৬৭.	ভদ্র ম্রং	বাংরাপাড়া	নেত্রকোনা
৬৮.	কার্নেশ চিসিম	ধলাপানি	নেত্রকোনা

৬৯.	ডাঃ উইলিয়াম ম্রং	বিড়ইডাকুনী	নেত্রকোনা
৭০.	লিকোলাস রিছিল	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৭১.	পংকজ রেমা	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৭২.	মুস্থ রেমা	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৭৩.	ধরন রিছিল	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৭৪.	সুদর্শন চিবান	ভুবনকুড়া	
৭৫.	হরচন মানখিন	ভুবনকুড়া	
৭৬.	চিরান	ভুবনকুড়া	
৭৭.	কান্তি মানখিন	ভুবনকুড়া	
৭৮.	আগষ্টিন মাংসাং	ভুবনকুড়া	
৭৯.	আরং রিছিল (শহীদ)	বাঘাইতলা	
৮০.	দীলিপ রিছিল	তেলিখারী	
৮১.	দেবতোষ সাংমা	কালিয়া কান্দা	
৮২.	তবক মানখিন (মৃত)	ভুবনকুড়া	
৮৩.	তনেন্দ্র থাকনী	পলাশতলা	
৮৪.	মনোজ রেমা	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৮৫.	ফ্রান্সিস রিছিল	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৮৬.	রামেন্দ্র দ্রং	বাঘাইতলা	নেত্রকোনা
৮৭.	প্রবণ রিছিল	সংরা	
৮৮.	প্রাণ কুমার দ্রং	সংরা	
৮৯.	পৌল মানখিন	সংরা	
৯০.	ধীরাজ দ্রং	সংরা	
৯১.	প্রদীপ সাংমা	জয়রামকুড়া	
৯২.	পুলক মারাক	বিড়ইডাকুনী	নেত্রকোনা
৯৩.	আলেকজান্ডার ঘাগ্রা	জয়রামকুড়া	
৯৪.	ক্রিপসন দাবিং	গোবরকুড়া	নেত্রকোনা
৯৫.	অমল দ্রং	বোয়ালমারা	নেত্রকোনা
৯৬.	দেবেশ মারাক	পলাশতলা	
৯৭.	সুজিত মারাক	ঘোষবেড়	
৯৮.	ওনিন্দ্র মারাক	কড়ই কান্দা	
৯৯.	রেমন চিচাম	রায়পুর, ভালুকাপাড়া	
১০০.	ডেভিড চিসিম	ঘোষগাঁও, ভালুকাপাড়া	

১০১.	বীরেন্দ্র চিরান	মল্লিকবাড়ি, ভালুকাপাড়া	
১০২.	অনিল মান্দা (শহীদ)	মল্লিকবাড়ি, ভালুকাপাড়া	
১০৩.	স্তেফান নকরেক	কাউখালী বরুয়াকোনা	
১০৪.	লুকাশ সরেন	শীতল বরুয়াকোনা	
১০৫.	দেবেন টুডু (মৃত)	শীতল বরুয়াকোনা	
১০৬.	বিশ্বনাথ টুডু	শীতল	রাজশাহী
১০৭.	নরেন টুডু (মৃত)	কালিতলা	রাজশাহী
১০৮.	ক্ষুদিরাম মুর্মু (মৃত)	আদাড়পাড়া	রাজশাহী
১০৯.	কার্তিক হাঁসদা	শিরামপুর	
১১০.	মন্টু মুর্মু	মধুমাঠ	রাজশাহী
১১১.	বুদ্ধিনাথ হাঁসদা	জয়দা	রাজশাহী
১১২.	শিবলাল মুর্মু	আঙ্গারখোলা	
১১৩.	বিশ্বনাথ মুর্মু	অগ্না	রাজশাহী
১১৪.	সনাতন মুর্মু	আঙ্গাখোলা	
১১৫.	দাস মুর্মু	সিমলা	রাজশাহী
১১৬.	লরেন্স মারান্ডি (মৃত)	দিনাজপুর	রাজশাহী
১১৭.	শিমল হাঁসদা	মালেদো	দিনাজপুর
১১৮.	আগাপিত মালো	শীধল গ্রাম	
১১৯.	আলব্রিকুশ হাঁসদা	মারীয়ামপুর	
১২০.	খ্রীষ্টফার মুর্মু	দিনাজপুর	দিনাজপুর
১২১.	জামিন মুর্মু	আদাড়পাড়া	রাজশাহী
১২২.	সুশীল মুর্মু	বড়গাছিয়া	
১২৩.	ষ্টেফান মুর্মু	বটতলা	রাজশাহী
১২৪.	অনিল মুর্মু	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১২৫.	অনাথ নকরেক	ভরতপুর	নেত্রকোনা
১২৬.	অরবিন্দ সাংমা (দিও)	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা
১২৭.	আইনল সাংমা	বিজয়পুর	নেত্রকোনা
১২৮.	আইসন মানখিন	ভরতপুর	নেত্রকোনা
১২৯.	পরিমল মারাক	গোপালপুর	নেত্রকোনা
১৩০.	পিরিসন মারাক	ফান্দা	নেত্রকোনা
১৩১.	বির্নেস সাংমা	গোপালপুর	নেত্রকোনা

১৩২.	বেঞ্জিং নকরেক	গাজীপুর	নেত্রকোনা
১৩৩.	সুরেন্দ্র ম্রং	বেন্নাকান্দা	নেত্রকোনা
১৩৪.	হেনবিত ম্রং	বাদামবাড়ি	নেত্রকোনা
১৩৫.	যতীন্দ্র চিসিম	বামনপাড়া	নেত্রকোনা
১৩৬.	মানুয়েল বেসরা	রহমপুর	নবাবগঞ্জ
১৩৭.	মাইকেল মুর্মু (মৃত)	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১৩৮.	মঙ্গল হাঁসদা (মৃত)	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১৩৯.	সেতাব সেবাষ্টিয়ান মারান্ডি	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১৪০.	লংকিনুস টুডু	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১৪১.	ফ্রান্ডি টুডু	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১৪২.	মঙ্গল মাক্রূস মুর্মু	রহনপুর	নবাবগঞ্জ
১৪৩.	উইলিয়াম ব্রুরাম	সেনাপাড়া বালুচড়া	নেত্রকোনা
১৪৪.	উৎপল হাগিদক	বিশ্বনাথপুর	
১৪৫.	সতেন্দ্র চিরান	বিশ্বনাথপুর	
১৪৬.	ধীরাজ চাম্মুগং	চেংগ্নী	
১৪৭.	লেনার্ড রিছিল	গোপালবাড়ি	
১৪৮.	ইফবাস নকরেক	বালুচড়া	নেত্রকোনা
১৪৯.	মিত্র ঘাগ্রা	নলছাপ্রা	
১৫০.	তরুণ কান্তি জাম্বিল	নলছাপ্রা	
১৫১.	প্রদীপ ঘাগ্রা	নলছাপ্রা	
১৫২.	ক্লেমেন্ট জাম্বিল	নলছাপ্রা	
১৫৩.	যতীন্দ্র জাম্বিল	নলছাপ্রা	
১৫৪.	মিহির বনোয়ারী	নলছাপ্রা	
১৫৫.	সতীশ স্নাল	নলছাপ্রা	
১৫৬.	রনেশ স্নাল	নলছাপ্রা	
১৫৭.	লেবিনাথ জাম্বিল	নলছাপ্রা	
১৫৮.	কালুরংদী	কুয়ারপুর	
১৫৯.	সুরেশ স্কু	ইয়ারপুর	
১৬০.	সিংজান নকরেক	কুয়ারপুর	
১৬১.	গাব্রিয়েল রাংসা	বালুচড়া	নেত্রকোনা
১৬২.	কুপিল রংদী	কুয়ারপুর	
১৬৩.	যমুনা মাংসাং	কাউবাড়ি	
১৬৪.	ইনাসন দারিং	কাউবাড়ি	

১৬৫.	সুজন মারাক	কালাপানি	
১৬৬.	ফিলিপন নকরেক	কালাপানি	
১৬৭.	ক্লীয়ারসন রংদী	কালাপানি	
১৬৮.	অভিনাথ দারিং	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৬৯.	প্রবীর সিমসাং	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৭০.	নিতেন্দ্র আজিম	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৭১.	হিল্লোল হাগিদক	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৭২.	বিপন্ন হাজং	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৭৩.	প্রফুল্ল হাজং	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৭৪.	বার্নার্ড রেমা	তারানগর	
১৭৫.	দিল বাহার নকরেক	তারানগর	
১৭৬.	বিমল রেমা	তারানগর	
১৭৭.	বভিন জাম্বিল	তারানগর	
১৭৮.	ফেবিয়ান রেমা	তারানগর	
১৭৯.	বব্‌টাট জম্বিল	তারানগর	
১৮০.	আসমান মারাক	তারানগর	
১৮১.	সুদর্শন সাংমা	তারানগর	
১৮২.	ঋষিকেশ সাংমা	তারানগর	
১৮৩.	সচিন্দ্র সাংমা	তারানগর	
১৮৪.	অনাথ নকরেক	ভরতপুর	নেত্রকোনা
১৮৫.	বেনসিং নকরেক	গাজীপুর	নেত্রকোনা
১৮৬.	মিতিশ চিছাম	মানিকপুর	
১৮৭.	থিউফিল হাজং	বালুচড়া	নেত্রকোনা
১৮৮.	পরিমল দ্রং	মণিকুড়া, হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
১৮৯.	আমিন মুর্মু	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর
১৯০.	পৌল মানখিন	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ

আদিবাসী সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম ও থানা	জেলা
১.	বাবু লাল সরেন	ময়েন, তানোর	রাজশাহী
২.	চাম্পাই সরেন	ময়েন, তানোর	রাজশাহী
৩.	শুকলাল মুটমু	ময়েন, তানোর	রাজশাহী

৪.	পলটন হাসদা	ময়েন, তানোর	রাজশাহী
৫.	ভীম মুর্মু	ময়েন, তানোর	রাজশাহী
৬.	ঈশ্বর মুর্মু	ময়েন, তানোর	রাজশাহী
৭.	সুশীল সরেন	নারায়নপুর, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৮.	মদি দিস্কু	মোহাম্মদপুর, তানোর	রাজশাহী
৯.	মহেশ্বর টুডু	মোহাম্মদপুর, তানোর	রাজশাহী
১০.	নাইকা সরেন	মোহাম্মদপুর, তানোর	রাজশাহী
১১.	মতি টুডু	মোহাম্মদপুর, তানোর	রাজশাহী
১২.	কিস্টু মুরমু	মোহনপুর, তানোর	রাজশাহী
১৩.	মঙ্গল মারান্ডি	মোহনপুর, তানোর	রাজশাহী
১৪.	মাথিয়াস মার্জী	দামকুড়হাট, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
১৫.	বিজুদাস মুর্মু	দামকুড়হাট, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
১৬.	অনিল মুর্মু	মিরাকাঠাল, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
১৭.	ফিলিপ মুর্মু	মিরাকাঠাল, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
১৮.	ঈশ্বর চন্দ্র মাঝি	ডমুডাইন, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
১৯.	লক্ষীরাম মাঝি	ডমুডাইন, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২০.	মলসিং মাঝি	ডমুডাইন, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২১.	লুকাস সরেন	শীতলপুর, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২২.	দেবেন টুডু	শীতলপুর, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৩.	বিশ্বনাথ টুডু	শীতলপুর, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৪.	মন্টু মুর্মু	মধুমাট, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৫.	ক্ষুদিরাম মুর্মু	আদাড়পাড়া, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৬.	জামিন মুর্মু	আদাড়পাড়া, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৭.	শিবলাল মুর্মু	আহারখোলা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৮.	সনাতন মুর্মু	আহারখোলা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
২৯.	যোসেফ মুর্মু	দেওলা, তানোর	রাজশাহী
৩০.	ছোট হাঁসদা	কাজীপাড়া, তানোর	রাজশাহী
৩১.	সুকলাল সরেন	কালনা, তানোর	রাজশাহী
৩২.	যোসেফ সরেন	লবলবি, তানোর	রাজশাহী
৩৩.	সাহেব রাম মাঝি	লালদিঘী, তানোর	রাজশাহী
৩৪.	বিশ্বনাথ টুডু	শগুনা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৩৫.	সুভাষ টুডু	শেফালীপাড়া, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৩৬.	কার্তিক হাঁসদা	শিরামপুর, গোদাবাড়ি	রাজশাহী

৩৭.	বুদ্ধিনাথ হাঁসদা	জয়দা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৩৮.	মরেন টুডু	কালিতলা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৩৯.	দামু মুর্মু	শিমলা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৪০.	সুশীল মুর্মু	বড়গাছিয়া, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৪১.	স্টেফেন মুর্মু	বড়তলা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৪২.	মাইকেল সরেন		
৪৩.	গোকুল মুর্মু		
৪৪.	অনিল মুর্মু	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৪৫.	মানুয়েল বেসরা	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৪৬.	মাইকেল মুর্মু	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৪৭.	মঙ্গল হাঁসদা	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৪৮.	ছত্তার সেবাস্টিয়ান মারান্ডি	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৪৯.	লংকির্মুসূ টুডু	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৫০.	ফ্রান্সিস টুডু	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৫১.	মঙ্গল মাকুশ টুডু	রহনপুর, গোমস্তাপুর	রাজশাহী
৫২.	পটল সরেন	জাবড়ী, নিয়ামতপুর	নওগাঁ
৫৩.	ফাঃ লুকাশ মারান্ডি	বিনিদুয়ার	নওগাঁ
৫৪.	আগস্পিত হইমব্রম	জিতল, বদলগাছি	জয়পুরহাট
৫৫.	ইন্দ্রজিত সরেন	ট্যাঙ্গাপাড়া, পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
৫৬.	বিকাশ কুমার সরেন	জাম্মনাবাদ, বাগতিপাড়া	নাটোর
৫৭.	আলবিনুস হাদো	মারিয়ামপুর, ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
৫৮.	শিমল হাঁসদা	মালদো, ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
৫৯.	খ্রীষ্টফার মুর্মু	মরিয়মপুর, ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
৬০.	লরেন্স মার্জী		
৬১.	সুধীর চন্দ্র মাঝি	মালকমলা, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৬২.	কার্লোস মুর্মু	সুরশুনিপাড়া, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৬৩.	সরকার বেসরা (মৃত)	চাঙ্গলবাঙ্গল, নিয়ামতপুর	নওগাঁ
৬৪.	ঠাকুর মুর্মু	নারায়নপুর, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৬৫.	রাম কিম্কু	বারকাটি, গোদাবাড়ি	রাজশাহী
৬৬.	মাথাই টুডু	জগদল, ধামইরহাট	নওগাঁ
৬৭.	লিজাল সরেন	মারখেল, নাচোল	চাপাইনবাবগঞ্জ
৬৮.	লালু মার্জী	কার্তিকপুর, নাবেল	চাপাইনবাবগঞ্জ

৬৯.	শ্রী সম মুর্মু	তুলাহার,	চাপাইনবাবগঞ্জ
৭০.	শিবলাল কিসকু	উৎকুন্ডা, নাবোল	চাপাইনবাবগঞ্জ
৭১.	হাবেল বেসরা	পীরগঞ্জ	দিনাজপুর
৭২.	আলব্রিকুস মুর্ম	জগদল, ধামইহাট	নওগাঁ
৭৩.	মাইকেল সরেন	লাগাইচ, ধামইহাট	নওগাঁ
৭৪.	দানিয়েল টুডু	লাগাইচ, ধামইহাট	নওগাঁ
৭৫.	ফিলিপ হেম্ব্রম	ভানাইকুশলিয়া, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট
৭৬.	যোসেফ মুর্মূ	ভানাইকুশলিয়া, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট
৭৭.	সনাতন মুর্মু	ভানাইকুশলিয়া, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট
৭৮.	নবীন সরেন	নিত্তিপাড়া, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট
৭৯.	ফাদার লুকাশ মারান্ডি	বেনীদুয়ার	দিনাজপুর
৮০.	থিউফিল হাজং	বালুচরা, কলমাকান্দা	নেত্রকোনা
৮১.	দীপক সাংমা	বিরিখিরি, দুর্গাপুর	নেত্রকোনা
৮২.	এক্সিবিশন বনোয়ারি	গোয়ালখালী, ধোবাউড়া	এয়মনসিংহ
৮৩.	অনাথ নকরেক	ভরতপুর, দুর্গাপুর	নেত্রকোনা
৮৪.	অরবিন্দ সাংমা দিও	পূর্ব উৎরাইল, দূর্গাপুর	নেত্রকোনা
৮৫.	ধীরেন্দ্র রিছিল	বামনপাড়া, দুর্গাপুর	নেত্রকোনা
৮৬.	স্তেফান নকরেক	কাউবাড়ি, কলমাকান্দা	নেত্রকোনা
৮৭.	ভদ্র মারাক	বাংরাপাড়া	ময়মনসিংহ
৮৮.	যতীন্দ্র সাংমা ১	গোহালিদাও, দুর্গাপুর	নেত্রকোনা
৮৯.	যতীন্দ্র সাংমা ২	বামনপাড়া	নেত্রকোনা

আদিবাসী মারমা মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম ও থানা	জেলা
১.	মংশ্লেহা	মধ্যমপাড়া	বান্দরবান
২.	সুবেদার মেজর মংসিলু	উজানীপাড়া	বান্দরবান
৩.	মংশৈপ্রু	নাইক্ষ্যংছড়ি	বান্দরবান
৪.	সাইফ্রু মগ	কাটাপাহাড়, যীশুটিলা	রাঙামাটি
৫.	কংজরি মগ	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি

৬.	আদুং মগ	রাজ্যমনিপাড়া	খাগড়াছড়ি
৭.	বুইপ্রু মারমা	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি
৮.	কংচাই মগ	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি
৯.	মৃত মংমংচিং মগ	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি
১০.	ম্রাসাথোয়াই মগ	বীচিতলা, ২৬২ গোলাবাড়ি	খাগড়াছড়ি
১১.	থোয়াইঅং মগ	চাইলাউপাড়া	খাগড়াছড়ি
১২.	মংআপ্রুশি মগ	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি
১৩.	থোয়াইঅংরী মারমা	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি
১৪.	মংসাথোয়াই মগ	পানখাইয়াপাড়া	খাগড়াছড়ি
১৫.	মংশোয়েঅং মগ	২৬২ গোলাবাড়ি	খাগড়াছড়ি
১৬.	মৃত আথুইয়ং মগ	আপার পেড়াছড়া, ২৬২ গোলাবাড়ি	খাগড়াছড়ি
১৭.	উক্যজেন	ম্যাজিস্ট্রেটপাড়া, ২৬২ গোলাবাড়ি	খাগড়াছড়ি
১৮.	সাথোয়াই মারমা	সাতভাইয়াপাড়া, ২৬২ গোলাবাড়ি	খাগড়াছড়ি
১৯.	মংসাথোয়াই চৌধুরী	লুরেমরম, হাফছড়ি	খাগড়াছড়ি
২০.	কংক্য মগ	গুইমারা	খাগড়াছড়ি
২১.	পথোয়াই মগ	ডিপিপাড়া, গুইমারা	খাগড়াছড়ি
২২.	মংহাপপ্রু মারমা	নতুনপাড়া	খাগড়াছড়ি
২৩.	দুমফড়ি	নতুনপাড়া	খাগড়াছড়ি
২৪.	কংজ্য অং মগ	গুইমারা	খাগড়াছড়ি
২৫.	মৃত লাব্রে মগ	নতুনপাড়া, ৩নং হাফছড়ি	খাগড়াছড়ি
২৬.	ম্রাসাথোয়াই মগ	ডিপিপাড়া	খাগড়াছড়ি
২৭.	উথোয়াই মগ	নতুনপাড়া	খাগড়াছড়ি
২৮.	চাইলাপ্রু	হাফছড়ি	খাগড়াছড়ি
২৯.	মংপাই মগ	নতুনপাড়া, হাফছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩০.	মৃত ক্য রী মগ	দেওয়ানপাড়া	খাগড়াছড়ি
৩১.	মংবুইবাহ চৌধুরী	ডেবাছড়ি, সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩২.	নাইগ্য প্রুয় মারমা	সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩৩.	মৃত রামেচ মারমা	সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি

৩৪.	মংমং মারমা	ডেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩৫.	দোঅংগ্য চৌধুরী	ডেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩৬.	কংজচাই চৌধুরী	ডেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩৭.	থোয়াইঅংগ্য মারমা	ডেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩৮.	মং মারমা	সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৩৯.	মং মার্মা	সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৪০.	ম্রাসাথোয়াই মারমা	ডিপিপাড়া	খাগড়াছড়ি
৪১.	কংজ চাই মগ	গুইমারা	খাগড়াছড়ি
৪২.	মংহাপ্রু মারমা	বটতলা, গুইমারা	খাগড়াছড়ি
৪৩.	মংহাপ্রু মগ	টিনটহরি মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৪৪.	সুইমং মগ	কালাপানি, মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৪৫.	মংতাক মারমা	কালাপানি, মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৪৬.	আথুই মগ	তবলছড়ি, মাটিরাঙা	খাগড়াছড়ি
৪৭.	মংচাইপ্রু চৌধুরী	মহালছড়ি	খাগড়াছড়ি
৪৮.	মংরুবাই চৌধুরী	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৪৯.	নারাসু মারমা	থলিপাড়া, মহালছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫০.	নাইগ্যপ্রু মারমা	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫১.	মৃত রামেসু মারমা	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫২.	মংমেত মারমা	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫৩.	দোঅংগ্য মারমা	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫৪.	কংজচাই মারমা	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫৫.	থোয়ইঅংগ্য মারমা	দেবলছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫৬.	মং মারমা	সিন্দুকছড়ি মুখ	খাগড়াছড়ি
৫৭.	মং মারমা	মহালছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫৮.	মংমং মারমা	নূনছড়ি, মাইচছড়ি	খাগড়াছড়ি
৫৯.	চাইহাপ্রু মারমা	সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৬০.	সাথোয়াইপ্রু	মহামনিপাড়া, রামগড়	খাগড়াছড়ি
৬১.	রিপ্রু মগ	ফেনীরকুল, রামগড়	খাগড়াছড়ি
৬২.	অংকিউ মগ	সদু কারবারীপাড়া	খাগড়াছড়ি
৬৩.	মৃত মংমং মগ	সদু কারবারীপাড়া	খাগড়াছড়ি
৬৪.	মংসুইঅং মগ	জগন্নাথপাড়া	খাগড়াছড়ি
৬৫.	সাথোয়াইপ্রু মগ	দারোগাপাড়া	খাগড়াছড়ি
৬৬.	প্রাইপ্রু মগ	দারোগাপাড়া	খাগড়াছড়ি

৬৭.	আপ্রুসী মগ	সোনাইআগা	খাগড়াছড়ি
৬৮.	মৃত মংমং	মহামুনিপাড়া	খাগড়াছড়ি
৬৯.	মংচিনু মারমা	উজানীপাড়া	বান্দরবান

আদিবাসী চাকমা মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম/থানা	জেলা
১.	লে. কর্নেল অব: মনীষ দেওয়ান	মাঝের বস্তি	রাঙামাটি
২.	শহীদ খগেন্দ্রলাল চাকমা	মাঝের বস্তি	রাঙামাটি
৩.	শহীদ সঞ্জীব চাকমা	রাইখালী, চন্দ্রঘোনা	রাঙামাটি
৪.	করুণামোহন চাকমা	বরকল	রাঙামাটি
৫.	মনীন্দ্র চাকমা	পোয়াপাড়া, কাউখালী	রাঙামাটি
৬.	মৃত কালঞ্জয় চাকমা	পোয়াপাড়া, কাউখালী	রাঙামাটি
৭.	মৃত জাপান কুমার চাকমা	কাশখালী, কাউখালী	রাঙামাটি
৮.	রবিরশ্মি চাকমা	কল্যানপুর, ৯নং পৌর ওয়ার্ড	খাগড়াছড়ি
৯.	ধর্মচরণ চাকমা	গলাছড়ি, লক্ষ্মিছড়ি	খাগড়াছড়ি
১০.	কংগ্য দেওয়ান	মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি
১১.	সুবিলাস চাকমা	লেমুছড়ি, মাইচছড়ি	খাগড়াছড়ি
১২.	রমণীরঞ্জন চাকমা	পূর্ব মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি

আদিবাসী ত্রিপুরা মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম/থানা	জেলা
১.	মৃত বসন্ত কুমার ত্রিপুরা	আসাম বস্তি	রাঙামাটি
২.	বিজয় কুমার ত্রিপুরা	আসাম বস্তি	রাঙামাটি
৩.	রণ বিক্রম ত্রিপুরা	খাগড়াপুর	খাগড়াছড়ি
৪.	নব বিক্রম ত্রিপুরা	খাগড়াপুর	খাগড়াছড়ি
৫.	নিলোৎপল ত্রিপুরা	মিলনপুর	খাগড়াছড়ি
৬.	ফিলিস বিজয় ত্রিপুরা	শালবন	খাগড়াছড়ি
৭.	নির্পদ ত্রিপুরা	সিন্দুকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৮.	বিন্দু কুমার ত্রিপুরা	মাটিরাঙা	খাগড়াছড়ি
৯.	ব্রজেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	রামগড়	খাগড়াছড়ি
১০.	লোকনাথ ত্রিপুরা	রামগড়	খাগড়াছড়ি

১১.	বেনুরায় ত্রিপুরা	বৈষ্ণবপাড়া	খাগড়াছড়ি
১২.	রথীন্দ্র ত্রিপুরা	সোনাইআগা	খাগড়াছড়ি
১৩.	সুরেশ ত্রিপুরা	বল্টুরাম টিলা	খাগড়াছড়ি
১৪.	হৃদয় কুমার ত্রিপুরা	পরশুরামঘাট	খাগড়াছড়ি
১৫.	পূর্ণ কুমার ত্রিপুরা	জগন্নাথপাড়া	খাগড়াছড়ি
১৬.	গগণ চন্দ ত্রিপুরা	রামগড়	খাগড়াছড়ি
১৭.	মৃত নীল কুমার ত্রিপুরা	শামুকছড়া, নাকাপা	খাগড়াছড়ি
১৮.	সুবোধ বিকাশ	রামগড়	খাগড়াছড়ি
১৯.	ভাগ্যধন ত্রিপুরা	রামগড়	খাগড়াছড়ি
২০.	ভূপেন ত্রিপুরা	রামগড়	খাগড়াছড়ি
২১.	জয় কুমার	নাকাপা	খাগড়াছড়ি
২২.	অন্ন কুমার	নাকাপা	খাগড়াছড়ি
২৩.	মৃত মোহন ত্রিপুরা	রামগড়	খাগড়াছড়ি
২৪.	ভূপেন্দ্রলাল	রামগড়	খাগড়াছড়ি
২৫.	হরেন্দ্র কুমার	রামগড়	খাগড়াছড়ি
২৬.	ভুবন মোহন ত্রিপুরা	মাস্টারপাড়া	খাগড়াছড়ি
২৭.	প্রীতিকান্তি ত্রিপুরা	গর্জনতলী	রাঙামাটি

আদিবাসী ওঁরাও মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম/থানা	জেলা
১.	হোসেন ওঁরাও	গোদাগাড়ি	রাজশাহী
২.	শুকচাঁদ ওঁরাও	গোদাগাড়ি	রাজশাহী
৩.	বিমল সিং ওঁরাও	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
৪.	মহাদেব মিঞ্জি	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট

আদিবাসী মুন্ডা মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম/থানা	জেলা
১.	বীরেন্দ্রনাথ হেরদুয়ার	গোগ্রাম, গোদাগাড়ি	রাজশাহী
২.	নরায়ণ মুরারী	গোদাগাড়ি	রাজশাহী
৩.	গজেন্দ্রনাথ মুরারী	গোদাগাড়ি	রাজশাহী
৪.	বুধু মুন্ডা	দোগাছি	জয়পুরহাট

আদিবাসী রাখাইন মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	গ্রাম/থানা	জেলা
১.	সিংহ্না মোং	মহেশখালী	কক্সবাজার
২.	আবিও	মহেশখালী	কক্সবাজার
৩.	শহীদ মংছিয়েন	মহেশখালী	কক্সবাজার
৪.	আ ক্য মং	মহেশখালী	কক্সবাজার

অন্যান্য আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা

ক্রম	নাম	সম্প্রদায়	জেলা
১.	অঙ্গীদ ছেত্রী	ছেত্রী	খাগড়াছড়ি
২.	অরুণলাল ছেত্রী	ছেত্রী	খাগড়াছড়ি
৩.	লিয়ানপুম বম	বম	বান্দরবান
৪.	লালবাহাদুর ছেত্রী	ছেত্রী	রাঙামাটি

কয়েকজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা

আদুং মগ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গোলাবাড়ি রাজ্যমনি পাড়ার অধিবাসী আদুং মগ বা মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। পিতা মৃত মংতুশে মগ। ১৯৫০ সালে খাগড়াছড়িতেই জন্ম আদুং মগের। পাহাড়ের কোলে এখানেই কেটেছে তার বিস্মৃত শৈশব। স্থানীয় ক্যাং (ধর্ম মন্দির)-এ মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছিল তার। এরপর আর্থিক দৈন্যতায় তা বন্ধ হয়ে যায়। দিনমজুরে পরিণত হয় তার ভবিষ্যৎ।

১৯৭১র উত্তাল সময়ে তিনি একজন দিনমজুর। আনুমানিক মে মাসের দিকে অন্য ৭-৮ জন যুবকের সাথে পরামর্শ করে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য মনস্থির করে। পরবর্তীতে আরও ২৮ জন পাহাড়ি যুবক তাদের সাথে যুক্ত হয়। ধরা পড়ার ভয়ে ২ জন ২ জন করে তারা ভারতে চলে যায়। তাদের মধ্যে কেউ হাফলং, কেউ বগাপার, কেউ পালাডাঙাতে ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে আসে এবং সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়।

আদুং মগ তবলছড়ি হয়ে ত্রিপুরা সীমান্তে পৌছে এবং হাফলং ক্যাম্পে ৪৯ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আগস্টের শেষের দিকে ট্রেনিং শেষে তিনি রাঙামাটির বড়ো হরিণায় এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর ১নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার নিত্তহ্লার নেতৃত্বে বেশকিছু অপারেশনে অংশগ্রহণ করে। অপারেশনগুলো পরিচালিত হয়েছিল পানছড়ি, নুনছড়ি, তবলছড়ি, মানিকছড়ি, মাইনিমুখ, ভাইবোন ছড়িতে। এগুলোর মধ্যে মাইনিমুখ অপারেশনটি ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, ভারতের মিজোবাহিনী পাকস্তানিদের দোসর হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল।

তবে সেই অপারেশনেও সফলতা অর্জন করেছিল আদুং মগের দল। চিরতরে মুক্ত হয়েছিল সেদিন মাইনিমুখ অঞ্চল।

অপারেশন অধিভুক্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরা তাদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ এবং চাল, ডাল তুলে সাহায্য করতেন। আবার পাকবাহিনী তাদেরকে খাটাত এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু কেড়ে নিত।

পাহাড়ের বুকে দীর্ঘ ৪ মাস যুদ্ধের শেষে আসল ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন তিনি খাগড়াছড়িতে। তাঁর ভাষায় আর্দ্রতা ও চোখে পানি এসেছিল সেদিন, কষ্টের নয় আনন্দের পানি।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘ ২ $\frac{১}{২}$ মাস তিনি ও তাঁর দল পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা ও পুনর্গঠন বিষয়ক দায়িত্ব পালনে রত ছিলেন। যুদ্ধ শেষে আরিশ্যা মডেল টাউনে অস্ত্র সমর্পণ করেন আদুং মগ।

আজ মুক্তিযুদ্ধের ৩৬ বছর পরের বাংলাদেশে আদুং মগ এখনও অবিরাম যুদ্ধ করে যাচ্ছেন তাঁর নিয়তি অথবা দারিদ্র্যের সাথে। অথচ এটা কখনোই তাঁর প্রত্যাশা ছিল না। অনেকটা ক্ষোভ, অনেকটা বেদনামিশ্রিত অশ্রুপূর্ণ ভাষায় তিনি বলেছেন, তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু স্মৃতি কথা, তাঁর অতৃপ্তির কথা।

"৩৭ বছর চলে গেছে এদেশের স্বাধীনতার। এ যাবৎ যে সরকার এসেছে, দুঃখজনকভাবে কেউ-ই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের চোখে দেখে নি। দেখেছে তাদের যারা সরকারের জন্য হুমকি স্বরূপ, যারা সরকারকে ভয় দেখাতে পারে। যেমন– রাজাকার, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ইত্যাদি। সরকারকে ভয় দেখাতে সমর্থ এই অপশক্তিরাই আজ রেশন পায়, জমি পায়, ভালো চাকুরি পায়, ভালো সবকিছু পায়। অথচ তারা দেশের জন্যে যুদ্ধ করেনি। আর আমরা যারা দেশের জন্যে যুদ্ধে গিয়েছিলাম, আজও আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি। যুদ্ধ শেষের প্রশান্তি পাইনি। এখনো যুদ্ধ আমাদের চলছে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্যে। এই করুণ বাস্তবতা কেবল পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যেই প্রযোজ্য নয়, সমতলের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগের একই নিয়তি দিয়েছে দেশ। মুক্তিযোদ্ধারা আজ ভিক্ষুক, ঠেলাগাড়ির চালক, রিক্সাচালক, দিনমজুর, করুণাশ্রয়ী। একটি কুকুর পথ দিয়ে হাঁটলে মানুষ সরে গিয়ে তাকে পথ করে দেয়, কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধাকে কেউ এই সম্মানটুকুও দেয় না। কুকুরের চেয়েও নিচে আজ তাদের অবস্থান। পাগল-ছাগল, অশিক্ষিত, গ্রাম্য, মূর্খ, নোংরা, অসভ্য, বদমেজাজি, অভদ্র ছেলেরা সেদিন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। ভদ্র, শিক্ষিত, সভ্য সুসন্তানরা সেদিন ছিল নিরাপদ আশ্রয়ে। কেউ ভারতে, কেউ পাক-বাহিনীর চামচা হয়ে। কখনোই তারা দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবে নাই। কারণ, তারা ভেবেছিল এটা সম্ভব নয়। কেউ কেউ যখন দেখেছে এখন আর যুদ্ধে গেলে মরবে না, সুবিধা পাবে, তখনই যুদ্ধে গিয়েছে, নামেমাত্র। অথচ যুদ্ধ শেষে তারাই নিয়েছে সব বড়ো বড়ো খেতাব-পুরস্কার, সম্মান, সুবিধা, উচ্চ পদ ইত্যাদি। অন্যদিকে সেই সব অশিক্ষিত, পাগল-ছাগলের দল কেবল পেয়েছে অবহেলা, অপমান আরও খারাপ যা কিছু আছে।"

মূল্যহীন এই অমানুষরা সেদিন না খেয়ে যুদ্ধ করেছিল। পানির অভাবে কলাগাছ চুষে খেয়েছিল। স্বপ্ন দেখেছিল এই দেশে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে, সবাই ভালোভাবে বাঁচতে পারবে।

তার ভাষায়, না জেনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভে সেদিন যুদ্ধে যাইনি। গিয়েছিলাম এমন একটি দেশের আকাঙ্ক্ষায় যে দেশ সবার মূল্যায়ন করবে। আজ আমরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তো নয়ই, সাধারণ মানুষ হিসাবেও মূল্যায়ন পাই না। দিতে হয় বলে সরকার আজ অতিশয় গরিব মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০০ টাকা করে ভাতা দেয়, যেখানে ১ কেজি মাংসের দাম ২০০ টাকা। কী হয় তাদের এই টাকায় ? তাও আবার, এটা পাওয়ার জন্যে কত সংগ্রাম, ঘুষ, প্রার্থনা, তদবির ইত্যাদি। ছিঃ ! ভাবতে ঘৃণা হয়, আমি এমন একটা দেশের জন্মের কারণ !

ইদানীং মুক্তিযোদ্ধাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সরকার চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা দিয়েছে। সুবিধা– মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা ৩০% হারে নিয়োগ পাবে। কিন্তু সত্য কতটুকু, বাস্তবায়ন আছে কিনা, তা কি সরকার জানে ? জানে না, জানে না।

আমার ছেলে আই এ ফেল। সে এল.এম.এ.এফ-র চাকরির জন্য আবেদন করেছে, গার্ডের চাকরি, সর্বনিম্ন চাকরি। ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হলেও আমার ছেলেকে অর্থাৎ ১টি মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকেও নেয়া হল না।"

যে ফুলকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, সেই ফুলের পাঁপড়িগুলো আজ খসে খসে পড়ছে নিভৃত-নীরবে। কেউ জানে না, জানলেও জানতে চায় না।

সম্প্রতি মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়, সম্মান জানানো হয়। অথচ মরার আগে মুক্তিযোদ্ধাটি কতবার মরে গেছে রাষ্ট্র তার খবর রাখে না। "আমি এই ধরনের প্রহসনকে মন থেকে ঘৃণা করি। মরার আগে লাথি মেরে মরার পর সেলুট দিলে কার লাভ হয় ? মনে পড়ে, '৭১-এর সেই সময়ে যারা (আমাদের অঞ্চলে) রাজাকারে যেত তাদের মাসিক এক হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হত। যারা যেত না তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখানো হত, নির্যাতন করা হত। সেই সময় পাহাড়িদের মধ্যে কেউ কেউ লোভে পড়ে স্বাধীনতার বিপক্ষে যোগ দেয়।

আমরা দেখেছি, তারা কতটা খারাপ হতে পারে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে, কত ঘৃণিত কাজ করতে পারে পাক বাহিনীর বাহবা পাওয়ার জন্য। তবুও মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমরা তাদের জানে মারি নি। সংশোধনের সুযোগ দিয়েছি। হালকা কিছু অপমান ও নির্যাতন করে তাদের পিতা-মাতার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছি– আপনাদের ছেলে যেন আর এই ধরনের খারাপ কাজে না যায়, দেশের পক্ষে যেন কাজ করে, দেশকে ভালোবাসতে শিখে। খুশি হয়ে বাবা-মা আমাদের সোনা-গয়না, টাকা-পয়সা দিতে চেয়েছে। আমরা তা নেই নি। কারণ এটা অন্যায়, অপরাধ, বড়োজোড় একবেলা ভালো খাবার খেয়ে বিদায় নিতাম।"

আদুং মগ একজন নৈশ প্রহরী, রাতের দারোয়ান। "এই বৃদ্ধ বয়সে জীবন বাঁচাতে, সংসার চালাতে আমাকে এটা করতে হয়। তাও আবার কত চেষ্টা তদবির করতে হয়েছে। সরকার আমাকে ৫ শতাংশ জমিও দেয়নি যেখানে আমি এটা-সেটা রোপন করে দু'বেলা খাবার জোগাতে পারতাম। সরকার সব দেয় তাদের যারা সরকারের আর্মি, বিডিআর, পুলিশ, বাঙালিদের ধরে ধরে মেরে ফেলে। তারা সবাই এখন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত।"

সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তিনি বলেন– "এটা বলতে পারি– ভুল করেছি, শুধু মুক্তিযুদ্ধ করে ভুল করেছি। হাতের অস্ত্র হাতে থাকতেই যদি সেদিন অন্য কাজে লাগাতাম তাহলে আজ সব পেতাম। কিন্তু পারিনি দেশের সঙ্গে বেইমানী করতে। আর তাই দেশ আজ তার সম্মান দেখাচ্ছে আমাকে অভুক্ত রেখে।"

লিয়ানপুম বম

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসী বম সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়ানপুম বম। ১৯৩০ সালে বান্দরবান জেলার মধ্যম পাড়ায় জন্ম। পিতা- মৃত সালহার বম। স্থানীয় খ্রিষ্টান মিশন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে। এরপর যোগ দেন ই.পি.আর-এ।

সৈনিকের ধর্ম যুদ্ধ করা। এটাই তার পেশা। কিন্তু বাঙালি না হওয়ায় বিভিন্ন লোভ দেখানো হত সে সময়ে অবাঙালি সৈনিকদের। যাতে তারা পাকিস্তানিদের হয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু না, দেশের মাটি, যেখানে নাড়ি পোঁতা, যেখানে পূর্ব পুরুষদের পদচিহ্ন পড়েছে সেই মাটির সাথে কোনো বেইমানী করা যায় না। তাই লিয়ানপুম বম কোনো ইন্ধনের শিকার হন নি। যুদ্ধ করেছেন নিজের দেশের হয়ে। ১৯৭১'র মার্চ মাসের শেষের দিকে তিনি তার দলের সাথে সিলেট হয়ে আসাম সীমান্তে পৌঁছেন। সেখান থেকে ফিরে এসে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অংশ নেয় অনেকগুলো অপারেশনে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ময়মনসিংহ অপারেশন, রাজশাহী অপারেশন, সিলেট অপারেশন ইত্যাদি। এই শেষ দুটি অপারেশনই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ, পাঠান ও পাঞ্জাবি সেনারা অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল তার দলকে। আশপাশের গ্রামবাসীরা ফেন, পান্তা সম্ভব হলে ভাত, পোশাক ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল সে সময়। আজও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন লিয়ানপুম সেই সব গ্রামবাসীদের যাদের অফুরন্ত ত্যাগ তাদের যুদ্ধ জয়ে সহায়ক হয়েছিল।

বয়সের ভারে ন্যুজ, একাংশে প্যারালাইস্‌ড নিয়ে ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে লিয়ানপুম মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বিশেষ স্মৃতি হাতড়ে বলেন–

"সিলেটের অপারেশনে বেশ কয়েকজন মিত্রবাহিনীর সহযোদ্ধা হারিয়েছিলাম আমরা। রক্তাক্ত শহীদের বুকের রক্ত আঙুল দিয়ে মুখে নিয়ে খুনের রক্তে দিশেহারা হয়ে নতুন করে দল নিয়ে এগুচ্ছিলাম আমি। সেই অপারেশনে ১৪০ জন হানাদার বধ করে অপারেশনকৃত অঞ্চলটি শত্রুমুক্ত করি। শহীদের রক্তই ছিল সেদিন আমার অনুপ্রেরণা। তাদেরকে পরবর্তীতে ভারতে নিয়ে দাফন করা হয়। হারিয়ে যাওয়া সেই সহযোদ্ধাদের মতো আমার জীবনও সেদিন অনিশ্চিত ছিল সব সময়। ভাবতাম, মরে গেলে তো ভালোই– দেশের জন্যে মরলাম। কিন্তু যদি বেঁচে থাকি তাহলে বাঁচব একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে। অন্তত আমার পরিবারের সদস্যদের জন্যে একটু ভালো ঘর, ভালো খাবারের ব্যবস্থা হবে। আমার সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধে আমার কৃতিত্ব দেখে বলেছিলেন– লিয়ানপুম তোমাকে একটি ছ'তলা ভবন অন্তত করে দিব, তোমার সন্তানদের ভালো চাকরি দিব। তোমার এটি পাওনা। আর সেই কমান্ডার এক সময় দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর হয়ে বসেন। কিন্তু আমার কথা ভুলে গেছেন অন্য অনেকের মতোই। হ্যাঁ, আমি মেজর জিয়ার কথা বলছি। যিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। আজ আমার ভাঙা ঘর, টিনের উপর বাঁশের ভার দেওয়া। এছাড়া আমার আর কিছু নাই। এই ঘরের জায়গাটুকু আবার কেড়ে নেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে মারমারা। কেস করেছি। সেই কেস চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। এ পর্যন্ত দিয়েছে এই দেশ মুক্তিযুদ্ধে আমার বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে....।"

এভাবেই নিষ্ঠুর স্বপ্ন প্রতারিত করে যায় লিয়ানপুম বমকে, যার এখন চলাফেরা করার শক্তি নেই, নেই কথা বলার শক্তিও। পরিবারের অসহায় সদস্যদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে আজও কুল পান না তিনি। এটাই কি তার স্বাধীনতার পাওনা অথবা অর্জন ?

করুণা মোহন চাক্‌মা

আদিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা করুণা মোহন চাক্‌মা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাক্‌মা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পিতা মৃত পাচন্যা চাক্‌মা (হেডম্যান)। করুণা মোহন ১৯৪১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির বরকল উপজেলার ১৫৫নং হেড ভরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তার শৈশব কাটে। স্থানীয় বাঘছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত, রাঙামাটির জীবতুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মগবান জুনিয়র স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে।

১৯৭১ সালে ৩০ বছরের দুর্দান্ত যুবক চাক্‌মা। তখন তিনি কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তানি শোষণের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ঘৃণা যেন সেদিন বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছিল। মহান সেই স্বাধীনতা

সংগ্রামে নিজেকে সামিল করার পেছনে নিজের স্বাধীনচেতা মানসিকতার পাশাপাশি মনিষ দেওয়ানের অনুপ্রেরণাও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭১'র ৩১ মে করুণা মোহন বাড়ি থেকে বের হয়ে ছোটো হরিণা সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মিজোরাম প্রদেশের দেমাগ্রিতে পৌছেন। সেখানেই মনিষ দেওয়ানের অধীনে ৩০ দিনের ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। ট্রেনিং সম্পন্ন করে তিনি টেগা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে এসে ১নং সেক্টরের অধীনে ৫টি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে টেগা সীমান্তের অপারেশনটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এতে তাদের ৩ জন সহযোদ্ধা নিহত এবং ১ জন আহত হন। কারণ, পাক বাহিনী তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করেছিল। করুণা মোহনের দলের কমান্ডার ছিলেন মনিষ দেওয়ান এবং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম। তার সফল অপারেশনগুলোর মধ্যে ছিল বড়াতুলি, ছোট হরিণা এবং জারালছড়ি অপারেশন।

বড়াতুলি ও ছোটহরিণায় পাক বাহিনীর ক্যাম্পগুলো তার দল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে সক্ষম হয় এবং জারলছড়ি গ্রামে সম্মুখ যুদ্ধে পাক বাহিনীর ৭ জন নিহত হয়। এতসব বিজয়ের উল্লাসের মাঝখানেও ঘটে গেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, যা তাকে আজও বেদনায় লীন করে দেয়। তা হল জারলছড়ির অপারেশনে এক সহযোদ্ধার বেঁচে থাকার আকুতি। মারাত্মক আহত সেই বন্ধুকে তারা বাঁচাতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। শহীদ সেই বীর মুক্তিযোদ্ধার করুণ মুখচ্ছবি আজও যখন স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে, আবেগে আপ্লুত হয়ে যান করুণা মোহন। করুণা মোহনের সেই হারিয়ে যাওয়া সহযোদ্ধার নাম সোনাধন চাক্‌মা, যাকে পরবর্তীতে জগন্নাথ ছড়া গ্রামে সমাহিত করা হয়।

'৭১-র উত্তাল সেই সময়ে যখন পাক বাহিনী জানতে পারল করুণা মোহন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তখন তারা তার বাবাকে আটক করে নির্যাতন করে। পরে পাক বাহিনীর এক ক্যাপ্টেনকে ৫ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়।

ছোটো ছোটো অপারেশনের পাশাপাশি করুণা মোহন মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বরকল অপারেশনে বীরত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব দেখান এবং বরকলকে মুক্ত করতে সক্ষম হন।

"৭১-র ডিসেম্বর মাস। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে আমরা ভেবে নিয়েছিলাম বিজয় আমাদের নিশ্চিত। অবশেষে আসল বিজয়ের ১৬ ডিসেম্বর। বুঝতে পারিনি চোখের এত জল কোথায় ছিল আগে। খুশিতে কেঁদেছিলাম প্রাণখুলে......।"

বিজয়ের সেই দিন তিনি রাঙামাটিতে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাঙামাটিতেই অস্ত্র সমর্পণ করেন করুণা মোহন চাক্‌মা।

যে স্বপ্নে তাড়িত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়ে সেই স্বপ্ন তার স্বপ্নেই রয়ে গেছে, বাস্তবায়ন দেখতে পাননি। কারণ, দেশ এখন

পুরোপুরি স্বাধীন নয়, স্বাধীন নয় এদেশের ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি। যাঁদের রক্তে প্রসব হয়েছে এই দেশ তারা আজও রক্তাক্ত। সুবিধা নিচ্ছে কতিপয় কুচক্রী, যাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা নেই, দেশের স্বার্থ বোঝে না, বোঝে কেবল নিজেদের স্বার্থ।

তাঁর মতে, "অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, অনেক বীরসেনা বিদায় নিয়েছেন তাদের অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে। কিন্তু এখনও বেঁচে রয়েছেন অনেকে, যাদের বেশির ভাগ অতি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত। সরকারের উচিত বেঁচে থাকতেই তাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া, নয়ত দেশ তাদের ক্ষমা করবে না...।"

সিংহ্লা মোং

রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মুক্তিযোদ্ধা সিংহ্লা মোং। জন্ম ১৯৫৪ সালে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপের ঠাকুরতলা রাখাইনপাড়ায়। পিতা মৃত মংলু। পরিবারের ঐতিহ্যবাহী পেশা মাছ বিক্রয়। পড়াশোনা করার কোনো সুযোগ হয় নাই তার। ছেলেবেলা থেকেই দরিদ্র পিতার পেশার সহায়ক হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত এই মুক্তিযোদ্ধার সংসারে রয়েছে একমাত্র বোন, তাকে নিয়ে কোনোমতে চালিয়ে নিচ্ছে সংসার। ১৯৭১ সালে মহেশখালীর আদিনাথ মন্দিরে পাক বাহিনীর আক্রমণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে সিংহ্লা মোং-কে। তখন ১৬-১৭ বছরের গ্রাম্য তরুণ। ৭১-র নভেম্বর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সহকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের থেকেই ট্রেনিং নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন একাধিক অপারেশনে। তার এলাকা থেকে আরো ৫-৬ জন অংশ নিয়েছিল সে সময়। ১নং সেক্টরের অধীনে তার দলের কমান্ডার ছিলেন বড়ুয়া সাহেব। তার অংশ নেয়া তিনটি অপারেশনের মধ্যে ডুলাহাজরার অপারেশনটি ছিল সবচেয়ে স্মরণীয়। নিজ হাতে এক পাক হানাদারকে খুন করে আনন্দে নির্ঘুম থেকেছিল সেদিন। সংখ্যায় কম এবং অস্ত্রে দুর্বল হয়েও মানসিক শক্তি ও নির্ভয়তার কারণে সাফল্যই ছিল তাদের জন্যে। কেবল নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে তার ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল পাকিস্তানিরা। তাই যুদ্ধের পুরো সময়টা ভেতরে ছিল কেবল খুনের আগুন, যে আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানিরা।

এরপর শেষ হয়ে যায় যুদ্ধ। কক্সবাজার শহরে বিজয়ের ১৬ ডিসেম্বরে আনন্দ বেদনায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই কক্সবাজার রেঞ্জেই অস্ত্র সমর্পণ করে।

মুক্তিযোদ্ধা আবিও

মুক্তিযোদ্ধা আবিও রাখাইন সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী একজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৫৮ সালে তিনি কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপের

ঠাকুরতলা রাখাইন পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন এখানে ২০০৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মংহিয়া। ঠাকুরতলা রাখাইন পাড়া বৌদ্ধ মন্দিরে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন মৎসজীবী।

১৯৭১ সালে মহেশখালী আদিনাথ মন্দিরে পাকিস্তানি হানাদাররা আক্রমণ করলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে হয় আবিওকে। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি নতুন মুরং পাড়ায় সোবাহান সাহেবের কাছ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দলের সাথে যুদ্ধে অংশ নেন। ১নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার এস.এম. বড়ুয়ার নেতৃত্বে ২টি অপারেশনে যোগ দেন। অপারেশন দুটি ছিল ডুলাহাজরা অপারেশন এবং মহেশখালী অপারেশন। যোদ্ধারা পাকিস্তানিদের অতর্কিত আক্রমণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ডুলাহাজরার অপারেশনটি হয়ে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল তার দল। স্থানীয় থানায় আগুন ধরিয়ে ৫ জন হানাদারকে বধ করেছিলেন তাঁরা। সে সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রতি পাকিস্তানিদের স্পষ্ট হুঁশিয়ার ছিল– তারা যেন মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দুদের আশ্রয় না দেয়। তাহলে জানে মেরে ফেলবে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তবুও সব ধরনের সহযোগিতা করেছে সে সময় গ্রামবাসীরা। মৃত মুক্তিযোদ্ধা আবিওর একমাত্র মেয়ে খিংসিং-এর কাছ থেকে জানা গিয়েছে আজীবন তিনি তার একটি পায়ে মুক্তিযুদ্ধের গভীর ক্ষত বয়ে বেড়াতেন যা তাঁর স্বাভাবিক জীবনকে কেড়ে নিয়েছিল। তার বাবা স্বপ্ন দেখতেন, দেশ স্বাধীন হলে সরকার তাকে একটি মাছ ধরার ট্রলার কিনে দিবে যা দিয়ে পরিবারের স্বচ্ছলতা আসবে। কিন্তু কিছুই দেয় নি সরকার তার পরিবারকে।

যুদ্ধ শেষে তিনি কক্সবাজারে অস্ত্র সমর্পণ করেন। স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার সময় তার বাবা বলতেন, দেশের মানুষ ভুল করছে। কিন্তু অচিরেই তাদের ভুল ভাঙবে এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করবে....।

কিন্তু আমাদের আজকের বাস্তবতা কি বলে যে আমাদের ভুল ভেঙেছে !

ম্রাসাথোয়াই মগ

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমা সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা ম্রাসাথোয়াই মগ। পিতার নাম হলাচাই মগ। ১৯৫৩ সালে ম্রাসাথোয়াই খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলায় বড়থলি ডিপি পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। পড়াশোনা করে স্থানীয় গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার মা মারা যাওয়ায় সেখানেই শিক্ষা গ্রহণের ইতি ঘটে তার। এরপর নিযুক্ত হন শিক্ষকতা পেশায় (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে)। শৈশবের কিছুটা সময় মহালছড়িতে কাটালেও স্থায়ী নিবাস হিসেবে বেছে নেন গুইমারাকেই।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠী ভাষণে আপ্লুত হয় ম্রাসাথোয়াইর চেতনা। যদিও সে তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক তরুণ বালক।

পাহাড়ি অঞ্চলে সে সময়ে পড়াশোনার তেমন প্রচলন ছিল না। তাই তখন যারা ছাত্র ছিল তাদের প্রতি পাক ও রাজাকার বাহিনী বিশেষ নজর রাখত। রাজাকারে যাওয়ার জন্যে পয়সা-কড়ির লোভ দেখাত এবং তাদের সাথে না গেলে মেরে ফেলার ভয় দেখাত। তবুও ম্রাসাথোয়াই ও তার দল ২ জন ১ জন করে গোপনে ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখা পায় স্থানীয় আরো কয়েকজন আদিবাসী দলের। সেই সময়ে মগ রাজার স্বাধীনতাকামী মনোভাব ও ভারতে চলে যাওয়ায়- তার ভাষায়, "আমরাও অপেক্ষায় ছিলাম কখন আমরা যেতে পারব ভারতে। সেখানকার বৈষ্ণুপুর আওয়ামী লীগ অফিসে প্রথমে আমরা নাম লেখাই। তারপর আমাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করে হরিণা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এখানে এক মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয় আমাদের।

পাহাড়িদের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন হওয়ায় এখানে আমাদের বেশ কয়েকজন ডিসেন্ট্রিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং কারো কারো অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। আর যারা একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিল তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে তাদেরকে এক মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে। দুই মাস পর দেশে ফিরে এসে পানছড়ি এলাকায় অবস্থান নিই। পানছড়িতে তেমন সংঘর্ষ হয়নি, সংঘর্ষ বাঁধে কুকিছড়িতে। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজো বাহিনী গাড়ি নিয়ে আক্রমণ করেছিল আমাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপক গোলাগুলির পর আমরা সফল হই। কুকিছড়ি এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

যুদ্ধকালীন অস্থিরতার সময়ে আমার মা মারা যান। আমি তখন বাড়ি থেকে বহু দূরে। মাকে শেষ দেখাটাও দেখতে পাই নি। আমার জীবনের যা কিছু স্বপ্ন ছিল মায়ের মৃত্যুর সাথে তারও মরণ হয়। আমার আর পড়াশোনা করার সুযোগ হল না। তবুও একটা সান্ত্বনা মনে শক্তি জোগাত– দেশও মায়ের মতো। আজ আমি দেশ পেয়েছি, মানে মাকেই পেয়েছি নতুন করে। সবকিছু ভুলতে পেরেছি এই দেশের দিকে তাকিয়ে।"

অশ্রুসজল ম্রাসাথোয়াই। মুক্তির স্বপ্নপথিক এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এত বছর কেটে যাওয়ার পর এখনও মেলাতে পারেন না জীবনের হিসেব, মেলাতে পারেন না মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল।

"যত ত্যাগ যত রক্তই হোক, পাকিস্তানি ও হানাদারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবই এই একটি ছিল আমাদের স্বপ্ন। ভেবেছিলাম দেশ মুক্ত হলেই মুক্তি পাব অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য আর বৈষম্য থেকে। দেশের পরিচালনায় আসবে এমন নেতৃত্ব যারা সত্যিই দেশকে ভালোবাসবে মুক্তিসেনাদের মতো, যারা মাটির বুকে

বুক মিশিয়ে মাটিকে মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু না, আজ স্বাধীনতার পর পেরিয়ে গেছে ৩৭টি বছর। কিন্তু অর্জন হয় নাই কিছুই। বরং মানসিকতার অধগতি হয়েছে। আমাদের চেয়ে অনেক কম সময় পেয়ে অনেক অনুন্নত দেশ আজ উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমরা পারিনি। কারণ, আমাদের মানসিকতা খুব নিচু আর সংকীর্ণ। আমাদের দেশের নেতৃত্ব অবিবেচক লোভী। আজও দেশ সবাইকে পেট পুরে খাওয়াতে পারে না। আমরা যারা পাহাড়ের অধিবাসী, তারা নিজেদের এদেশের জনগণ বলেই পরিচয় দিতে চায়। কিন্তু দেশ তাদের সরল-সহজ মানসিকতার সুযোগ নিয়ে পিষে ফেলতে চায়। দিন যত যাচ্ছে, ততই নিঃস্ব হচ্ছি আমরা পাহাড়িরা। কতিপয় লোকজনের কারণে শান্ত পার্বত্য অঞ্চল আজ অশান্ত। অথচ শান্তির জন্যেই সেদিন সবাই যুদ্ধে গিয়েছিল, জীবন দিয়েছিল পাহাড়িরা। দেশ তাদের মনে রাখে না।"

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মংছিয়েন

রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর এক শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মংছিয়েন। জন্ম ১৯৫০ সালে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপভূমির ঠাকুরতলা রাখাইন পাড়া গ্রামে। পিতার নাম হারি। স্থানীয় ঠাকুরতলা বৌদ্ধ বিহারে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে পিতার পেশা মৎস্যজীবিকায় যোগ দেয়। ১৯৭১-এ ২১ বছরের তরুণ মংছিয়েন। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার তার ভেতরে জাগিয়ে তোলে এক প্রবল ঘৃণা, যে ঘৃণা তাকে ডাক দেয় মুক্তির সংগ্রামে। স্থানীয় আরো ৫-৬ জন যুবকের সাথে কাউকে না জানিয়েই বাংলা আশ্বিন মাসে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় মংছিয়েন। দলের সাথে মিশে গিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয় কক্সবাজার ও পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন স্থানে। তার দলের কমান্ডার ছিলেন বড়ুয়া সাহেব। সেক্টর ছিল ১ নম্বর।

বহুদিনের অনিশ্চিত জীবন, ক্রমাগত যুদ্ধে শেষে চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র সপ্তাহখানেক আগে ডিসেম্বরের ৮ তারিখে পাকিস্তানিদের সাথে এক সম্মুখ যুদ্ধের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মংছিয়েন। এই মহেশখালী দ্বীপেই সমাহিত করা হয় তাকে। তাঁর বাবা হারি'র ভাষায়–

"স্বাধীনতার শপথ নিয়ে ঘর ছেড়েছিল আমার সন্তান- স্বাধীনতার আগে সে ফিরে আসবে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, আমার সন্তান তো আর ফিরে এল না। এসেছে তার বিধ্বস্ত মৃতদেহ। তবুও খুব বেশি কষ্ট পাই নি। কারণ ভেবেছিলাম দেশ তার মর্যাদা দিবে, পিতা হিসেবে আমি পাব সন্তানের রক্তের দাম। কিন্তু পাই নি, কিছুই পাই নি। আজও কেউ খোঁজ নেয়নি মংছিয়েনদের।"

সাইফ্রু মগ

রাঙামাটি জেলার কাটাপাহাড় গ্রামের আদিবাসী সাইফ্রু মগ আদিবাসী মগ সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯২৮ সালে এখানেই তার জন্ম। পিতার নাম থোয়াক্রা মগ। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে সাইফ্রু তৎকালীন ইপিআর-এ ভর্তি হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল সৈনিক হিসেবেই নয়, নিজের মাটিকে ভালোবেসে অংশগ্রহণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। মার্চ মাসের দিকে তিনি দলভুক্ত হয়ে নওগাঁ দিয়ে রাজশাহী সীমান্তে পৌছেন। এপ্রিলে দেশের অভ্যন্তরে ফিরে এসে অবস্থান নেন চট্টগ্রাম এলাকায়। ১নং সেক্টরের অধীনে মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং হান্নান সাহেবের নেতৃত্বে অনেকগুলো সফল অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন সাইফ্রু মগ। অপারেশনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাবনা, রাজশাহী, হলতীডাঙ্গা, হিলি, নগরবাড়ি ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে রাজশাহী শহরের অপারেশনটা ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এ অপারেশনে সহযোদ্ধা হারিয়েছিলেন তিনি। যাদের কথা এখনো মনে হলে কষ্ট পান। হারিয়ে যাওয়া সেইসব শহীদদের মধ্যে নোয়াখালী অঞ্চলের এক বন্ধুর কথা খুব বেশি মনে পড়ে। তিনি অনেক শখ করে গোপনে ৫০০ টাকা দিয়ে একটি রেডিও কিনেছিলেন। সব সময়ই বুকে বেঁধে রাখতেন সেটি। কিন্তু সেই বন্ধুটি রেডিও কেনার পরের দিনেই শহীদ হন পাকিস্তানিদের গুলিতে। সেই সহযোদ্ধার লাশটিও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হানাদাররা, যা সাইফ্রু মগকে আরো বেশি কষ্ট দেয়। এভাবে চেনা অচেনা লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বন্যায় পলি পড়ে স্বাধীন একটি দেশের। আসে চূড়ান্ত বিজয়ের ১৬ ডিসেম্বর। যদিও সব সময়ই সাইফ্রু বিজয়ের স্বপ্নই দেখতেন। তাই সেদিন তিনি অবাক হননি। কেননা, তার মতে, "এত রক্ত বৃথা যেতে পারে না, বিজয়ী আমরা হবই এটাই ছিল আমাদের সব সময়ের চিন্তা।"

বিজয়ের সেই দিনে হরিণাতে অবস্থান করছিলেন তিনি। বিজয় শেষে চট্টগ্রাম কলেজে ক্যাপ্টেন মাহবুবের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। সেই সাথে সমর্পণ করেন কষ্ট, ত্যাগ, বেদনার স্মৃতি। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন দেশের সাথে নিজের পরিবারের স্বচ্ছলতার। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় মুক্তিযুদ্ধের এতগুলো বছর পরও। তাঁর সন্তানরা পড়াশোনা শেষ করে আজও বেকার। চাকরির বয়স শেষের দিকে, কিন্তু চাকরি হয় না। কোথাও পায় না মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সম্মান ও অগ্রাধিকার। এই বাংলাদেশ সাইফ্রু মগ চাননি ?

কংজ্য মগ

কংজ্য মগ আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৩৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় তাঁর জন্ম। পিতা মৃত লুরো মগ। স্থানীয় বিদ্যালয়ে কংজ্য দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে কৃষি পেশায় নিযুক্ত হয়।

১৯৭১ সালে কংজ্য মগ ৩৭ বছরের বলিষ্ঠ কৃষক। স্থানীয় চাক্মা রাজাকারদের প্রত্যক্ষ নির্যাতনের শিকার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। বাংলা ভাদ্র মাসের প্রথমদিকের কোনো এক রাতে একাকী বাড়ি থেকে বের হয়ে। ফেনী নদী পেরিয়ে পৌছেন ত্রিপুরা সীমান্তে। বগাপার ট্রেনিং ক্যাম্পে দীর্ঘ এক মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে শিলাছড়িতে অবস্থান নেন কংজ্য মগ। গুইমারা অঞ্চল থেকে তার সম্প্রদায়ের আরো ৭ জন ছিলেন তার সহযোদ্ধা। ১নং সেক্টরে দলীয় কমান্ডার সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরার নেতৃত্বে তিনটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এগুলো হল– পান-ছড়ি অপারেশন, তবলছড়ি অপারেশন এবং কুকিছড়ি অপারেশন। এর মধ্যে কুকিছড়ি অপারেশনটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোদের সাথে যুদ্ধে তিনটি অপারেশন-ই অত্যন্ত সফলভাবে সম্পাদন করতে পেরেছিল তার দল। শত্রুমুক্ত করেছিলেন অপারেশনকৃত তিনটি অঞ্চল-ই।

অবশেষে শেষ হয়ে আসে সংগ্রামবিক্ষুব্ধ দিন। আসে বিজয়ের ১৬ ডিসেম্বর। কংজ্য বলতে পারেননি সেই বিজয়ের দিনের অনুভূতি। ভাষা নাকি সেখানে হার মানে। তবে থেমে যাওয়া কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের কিছু না বলা স্মৃতিকথা-

"শ্রাবণ মাসের দিকে রামগড়ের শ্বশুরালয়ে ছিলাম আমি। এক রাতের ১-২ টার দিকে স্থানীয় চাকমা রাজাকার ও পাঞ্জাবিরা ঘিরে ফেলে সেই এলাকা। কেউ ঢুকতেও পারেনা, বেরোতেও পারে না। কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না ওদের ঐ অন্যায় আচরণ। তাই প্রতিবাদ জানাই। প্রতিবাদের প্রতিদানে ওরা যুগপৎ প্রচণ্ড পেটায় আমাকে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি সেই অকথ্য অত্যাচার। অথচ খুব ইচ্ছে করছিল ওদেরকে তৎক্ষণাৎ খুন করার। আমি সংকল্প করি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের। আমার সেই সংকল্প আরো দৃঢ় করে কয়েকদিন পরের আরেকটি ঘটনা। চাক্মা রাজাকারদের কয়েকজন এসে একদিন বলল, আমার গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দিতে। আমি বললাম, আমি তো গাছে উঠি না, লোক দিয়ে পাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করি । তাই তোমাদের নারকেল খাওয়ার ইচ্ছে হলে পেড়ে খেতে পার, আমি গাছে উঠতে পারব না। সেদিনও একইভাবে নির্যাতন করা হয় আমাকে। এ ঘটনায় আমি রাতের আঁধারে এক বুক ক্ষোভ, ঘৃণা, আর মুক্ত হওয়ার কামনা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যাই। তখন থেকেই আমি মুক্তিযোদ্ধা।"

থামলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কংজ্য মগ। বয়সের ভারে কুঁচকে যাওয়া চোখে টলটল স্বচ্ছ পানি।

"দেশ যেদিন স্বাধীন হল সেদিন ভেবে শান্তি পেয়েছিলাম। যাই হোক, আমার কষ্ট, আমার যন্ত্রণা, ত্যাগ মর্যাদা পেয়েছে। এখন থেকে এই দেশ কেবল স্বাধীনতার পক্ষের মানুষদের। চোখের সামনে আর রাজাকারদের দর্প দেখতে হবে না। কিন্তু ভুল ভেঙে যায় ঘুমের ঘোরে কোনো মধুর স্বপ্নের মতো। কয়েক বছর না যেতেই দেশ চলে যায় সেই স্বাধীনতা– বিরোধীদের হাতে। আবারো আমাকে বুকে ব্যথা নিয়ে দেখে যেতে হয় রাজাকারদের খুশির নাচন। স্বাধীনতার পর যতই বছর গিয়েছে ততই অপমানিত হয়েছে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। আর ততই ফুলে-ফেঁপে উঠেছে রাজাকাররা।"

"বহুদিন পর মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছে এদেশের গরিব মুক্তিযোদ্ধারা। অথচ একজন স্বাভাবিক মানুষের মাসিক চা-খরচও এর চেয়ে বেশি। আজকের বাজারে ১ কেজি গরুর মাংসের দাম ২০০ টাকা। তবুও এই টাকার আশাতেই পথ চেয়ে থাকি আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধারা। আর অন্যদিকে কোনো রাজাকারেরই এই দান-খয়রাতের উপর নির্ভর করতে হয় না। ওরা সে সময়ে সুযোগ পেয়ে স্বচ্ছল থেকেছে, এখনো তাই। ভুল আমরাই করেছি সেদিন ওদের কেবল শারীরিক অত্যাচার করে ছেড়ে দিয়ে। উচিত ছিল ওদের এই দেশ ছাড়া করা।

ইউকে চিং মারমা বীরবিক্রম

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ৪৩টি জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে মারমা সম্প্রদায় অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউকে চিং। আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত এই বীর সেনার জন্ম ১৯৩৭ সালে বান্দরবান জেলার লাঙ্গিপাড়া গ্রামে। তার পিতা ছিলেন বাউসাউ এবং মাতা হ্নংসাউ। স্থানীয় বোমাং রাজার স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ইউকে চিং। ১৯৫২ সালে ভর্তি হন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স বা ইপিআর-এ। ১৯৮২ সালে অবসর নেন হাবিলদার মেজর হিসেবে।

এই মহান মুক্তিযোদ্ধার সাথে অন্তরঙ্গ আলাপে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর জীবনের অনেক অনুল্লিখিত দিক। জানা অজানা অনেক কথা।

ইপিআর-এ যোগ দেওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতার কথা (তাঁর ভাষায়)

১৯৫২ সালে আমার ভগ্নিপতি ঢাকায় নিয়ে আমাকে ভর্তি করে দেন ইপিআর-এ। আমি তখন নিতান্তই এক পাহাড়ি কিশোর, ভেতরে সর্বদা ভয় ভয়। আমার

জন্মস্থান বান্দরবানে থাকাকালে সমতলের মানুষদের সাথে তেমন করে মেশার অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাছাড়া আমি পাহাড়ি, আমাদের খাদ্যাভ্যাসও আলাদা। খাবারের সময়গুলো পাহাড়ি সমাজে খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। প্রথমদিকে এইসব ব্যাপারে অনভ্যাস হেতু কিছু সংকোচ ও সমস্যা মানসিকভাবে পীড়া দিত বৈকি। কিন্তু এসকল ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা অচিরেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই ট্রেনিং-এ স্বাচ্ছন্দ পাওয়ায়। ট্রেনিং-এ শেখানো কৌশলগুলো ও শরীর গঠন করার পদ্ধতিগুলো আমার কাছে মজার কোনো খেলার চেয়ে বেশি কিছু মনে হত না। কারণ, আমি পাহাড়ি ছেলে, পাহাড়িদের জীবন আরো অনেক কঠিন ও কৌশলময়। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতাম। এমনকি ১৯৭১ সালে এবং অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন দলকে ট্রেনিং দেওয়ার কালে আমি আমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করেছি। আমার অধীনস্থরা সেগুলো ভালো এবং প্রয়োগিকভাবে গ্রহণ করেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি কোথায় অবস্থান করেছিলেন ?

১৯৭১ সালে আমি রংপুরের হাতিবান্ধায় ইপিআর-এ বর্ডার আউটপোস্টে (BOP) নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। তবে যুদ্ধকালীন সময়ে আমাকে হাবিলদার পোস্ট দেওয়া হয়।

সে সময়ে আপনি উল্লেখযোগ্য কোন কোন অপারেশনে অংশ গ্রহণ করেন ?

আমার অধীনস্থ দলে ৬৫ জন সৈনিক ছিল। আমি তাদেরকে নিয়ে রংপুর, লালমনিরহাট, পাখিউড়া, কাউয়াহাগা, বাঘবান্ধা, হাতিবান্ধা, চৌধুরীহাট, ভুরুঙ্গামারী, কুলাঘাট প্রভৃতি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি।

এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো অপারেশনের বর্ণনা- (দুর্বিসহ স্মৃতি)

কাউয়াহাগার অপারেশন দিয়ে শুরু করা যায়। লালমনিরহাট নদীর ওপারে আমরা একদিন দেখতে পেলাম আগুন জ্বলছে। আমার সাথে গার্ড হিসেবে ছিল ২ জন সেপাই। ওদেরকে বললাম, কোনো ফায়ার-টায়ার করার দরকার নেই। শুধু দেখতে থাক। এর আগে অবশ্য আমরা ওখানে এ্যামবুশ করেছিলাম। এক সময় দেখলাম, ২ জন পাকিস্তানি প্যান্ট-সার্ট ক্লোজ করে শাড়ি পরে ঘরে ঢুকছে। ভাবলাম, যদি গুলি করি তাহলে হয়ত মারা যাবে, নয়ত পালিয়ে যাবে। কিন্তু ওদের জীবিত ধরতে হবে। নয়ত জানা যাবে না মূল ঘটনাটা। তাই ওদের ২ জনকে জীবিত ধরে আনার জন্যে ৪ জনকে পাঠালাম, সঙ্গে গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে বলে দিলাম, যদি ঘরে ২টি দরজা থাকে তাহলে ২ জন দরজায় ও ২ জন দাঁড়াবে আর ২ জন ঘরে ঢুকবে। আর যদি একটি দরজা থাকে তাহলে ২ জন দরজায়

দাঁড়াবে, আর ২ জন ঘরে ঢুকবে। যেই কথা সেই কাজ। কিন্তু ১ জন তবুও পালিয়ে গেল, আর ১ জন জীবিত ধরা পড়ল। সে ছিল একজন পাঞ্জাবি সেনা। সেনাটিকে ধরে এনে গাছের সাথে বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল- কী জন্যে ছদ্মবেশ ধরেছে, তার দলের নেতা কে, দলের কে কোথায় আছে ইত্যাদি। সে সবই বলে দিয়েছিল। কারণ, বলা হয়েছিল যে সে বাঁচতে চায়, নাকি মরতে চায়। যদি বাঁচতে চায় তাহলে আমাদের সব কথা শুনতে হবে, আর মরতে চাইলে এখনই তাকে বেয়নেট চার্জ করা হবে। তাই সে বাঁচার জন্যে সবই বলে দিয়েছিল।

সারা রাত আগুন জ্বলল নদীর ওপারের গ্রামটায়। তবুও আমরা রাতে কোনো ফায়ার ওপেন করলাম না। কারণ, জানতে পেরেছিলাম পাকিস্তানিদের কেউ-ই আর ওখানে নেই। তাই আমি রাতে সেনাটাকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে যাই। অবশ্য ওকে বাঁচিয়ে রাখার বিরুদ্ধে অনেক সেনা আপত্তি তুলেছিল। আমি তখন ঠাণ্ডা মাথায় তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের স্বার্থেই। তখন পাকিস্তানিদের হাতে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বন্দি হয়ে আছে। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও ওদের জেলে বন্দি। ওকে আমরা তখনই ফিরিয়ে দেব যখন ওরা আমাদের কমপক্ষে ২০-২৫ জনকে ফিরিয়ে দিবে। তাই রাতেই আমি পাঞ্জাবি সেনাটিকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে হ্যান্ডওভার করে আসি।

রাতের বেলা ওকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি আমার ২ জন সেনা নিয়ে আবার নদীর ঘাটে গেলাম। কান পেতে শুনলাম মহিলা ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। সেপাইরাও শুনল। সারা গ্রাম তো পুড়ে ছাই, বাচ্চারা আসল কীভাবে ? তাড়াতাড়ি করে মাঝিকে খুঁজে বের করে এনে বললাম, নদীর ওপারে গিয়ে তোমাকে জানতে হবে কারা ওখানে কাঁদছে। মাঝি তো ভয়ে অস্থির, কারণ ওখানে পাকিস্তানিরা থাকতে পারে। যাই হোক, তাকে অভয় দিয়ে পাঠালাম নদীর ওপারে। ফিরে এসে সে বলল, স্যার ওপারে কোনো পাকিস্তানি নাই, অনেকগুলো মহিলা আর বাচ্চারা বালির গর্তে বসে কাঁদছে। তাকে বললাম, যে করেই হোক ওদেরকে এপারে ফিরিয়ে আনতে হবে। মাঝিকে বললাম, তুমি গিয়ে বল যে, মুক্তিফৌজের হাবিলদার সাহেব আপনাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছেন। এভাবে ৬ বারে ৩২ জন মহিলা আর তাদের সন্তানদেরকে নদী পার করে এনে গ্রামের স্কুলে নিয়ে ওঠালাম। গ্রামের মাতুব্বর, স্কুলের শিক্ষকদের ডেকে সব বাড়ি থেকে কাঁথা, শাড়ি, চাল, ডাল তুলে ওদের সব কিছুর ব্যবস্থা করলাম। এরপর ওদের সবার নাম রেজিস্ট্রি করে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে এসে আবার নদীর ওপারে গেলাম আমার দল নিয়ে। তার আগে অবশ্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে ওখানে কোনো পাকিস্তানি নেই। গিয়ে দেখি, কোনো জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বও নেই, কেবল আগুনে পুড়ে কালো ছাইয়ের স্তূপ। এর মধ্যে আমাদের দেখে কচু ক্ষেতের মাঝ

থেকে ১ জন বুড়ো আর ১টি বাচ্চা বেরিয়ে এল। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, যত বাঙালি পুরুষ ছিল তাদের সবাইকে ব্রাশ করে মেরে ঘরের চাল ওদের উপরে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানিরা। ওরা দুজন গোপনে লুকিয়ে ছিল। টিনগুলো ওদের কথামত উঁচু করে দেখি বীভৎস দৃশ্য, কাউকে চেনার উপায় নেই, কেবলি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মাংসের কালো কালো স্তূপ। ঐ অবস্থায়-ই গর্ত করে তাতে ২ জন ২ জন করে সমাহিত করে আমরা আমাদের ব্যারাকে ফিরে আসি। আমার স্মরণে এটা একটা ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে আমি রংপুরে অবস্থানরত। এক সকালে সাথে কয়েকজন সেপাই নিয়ে গেলাম শহরের পাশে। সেখানে ১টি ছোটো ব্রিজ ছিল। ব্রিজের নিচে অনেকগুলো চাটাই স্তূপ করা। একে একে ৭টি চাটাই তুললাম। সেই দৃশ্য ভোলার নয়- প্রতিটি চাটাই'র নিচে রক্তে ভেজা মানুষের লাশ। সবগুলো লাশই ছিল মহিলাদের। হাতে ঘড়ি, পায়ে জুতা দেখে বুঝলাম স্কুল-কলেজের ছাত্রী। চেহারা দেখে চেনার কোনো উপায়-ই ছিল না। কারণ, সবার-ই মুখের বুকের মাংস খুবলে নিয়েছে পাকিস্তানি শয়তানের বাচ্চারা। পার্শ্ববর্তী আরেক ব্রিজের নিচে দেখলাম কচুরিপানাগুলো কেমন যেন এলোমেলো। সন্দেহ জাগায় ওদের বললাম কচুরীপানা তুলে দেখতে। আবারো একই দৃশ্যের অবতারণা হল- বাঙালি নারীদের বীভৎস মৃতদেহ। কারোরই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আস্ত নেই, খুবলে খেয়েছে পাক সেনারা। হাতের ঘড়ি, পায়ের জুতা, আঙুলের আংটি সবই ঠিক আছে, শুধু দেহটা যেন শকুনের পাল্লায় পড়া মৃত গরু। মেয়েদের লাশগুলো তুলে এনে সারা শহরে মাইকিং করলাম যে, এরকম মেয়ে কারো আছে কি না, বা ছিল কি না। কেউ-ই সাড়া দিলনা। পরে রংপুর টাউন হলের পাশে ওদেরকে দাফন করি।

আবার হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সময় একদিন দেখলাম মাটির তৈরি উঁচু ঢিবি। কেমন যেন সন্দেহ হল আমার। সেপাইদের বললাম, মাটির ওপর ঘা দিয়ে দেখতে। ওরা ঘা দিয়ে দেখল নরম নরম লাগে। মাটি খুঁড়তে বললাম ওদের। যা দেখতে পেলাম, সেটাও ভোলার নয়। হাত-পা বাঁধা ২টি করে লাশ একেকটি গর্তে। এরকম ৩-৪টি গর্ত খুঁড়লাম। সবগুলোতে একই অবস্থা। লাশগুলোর চেহারা দেখে বুঝলাম এরা হয়ত উচ্চবিত্তসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আর না খুঁড়ে সেনাদের বললাম। পুনরায় মাটি চাঁপা দিয়ে রাখতে। অনর্থক মৃতদের কষ্ট দিলে পাপ হবে।

এছাড়াও দিনাজপুর এলাকায় দেখেছিলাম বিহারিদের অকথ্য নৃশংসতা। ওরা ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে পানির মধ্যে চুবিয়ে মারত। প্রথমে গলার উপরে পা দিয়ে পানির মধ্যে চেপে রাখত। যখন বাচ্চাগুলোর আর ছোটো ছোটো শরীর স্থির হয়ে যেত ঠিক তখনই ছেড়ে দিত। অর্থাৎ মরে

যাওয়ার পর ছেড়ে দিত পানির মধ্যে। এভাবে অসংখ্য শিশু মেরেছে বিহারিরা।

এই বিহারিরাই আবার কোথাও নদীর ধারে নারীদের লম্বা লাইনে করে দাঁড় করিয়ে ইচ্ছেমত পেটাত। যখন মহিলারা অজ্ঞান হয়ে, বা মারা যেত তখন ধাক্কা মেরে নদীতে ফেলে দিত। এমনি করে নৃশংসভাবে অসংখ্য মহিলা খুন করেছে বিহারিরা।

একবার দিনাজপুরেই দুইটি মেয়ে আর স্বামী-স্ত্রী মোট ৪ জন বিহারিকে ধরলাম। ১টি মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ত, আরেকটি ক্লাস নাইনে। খুবই মায়াবি চেহারার মেয়ে দুটো। স্বামী-স্ত্রী অনেক কান্না-কাটি করে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের বড়ো মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখুন। ওকে আপনারা বিয়ে করতে পারেন, সে খুবই ভালো মেয়ে। আমাদের তিন জনের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমার এ মেয়েটিকে বাঁচান। আমার স্মৃতিতে তখন ভাসছে পাকিস্তানিদের নৃশংসতার দৃশ্য। তাই কান দিলাম না ওদের আবদারে। প্রথমে বাচ্চা দুটো মেরে পরে মারলাম স্বামী-স্ত্রীকে। ৪ জনকে একটি গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে প্রতিশোধের শান্তি পেয়েছিলাম সেদিন।

তবে, এরপরও কাউকে কাউকে হাতের কাছে পেয়েও মারতে পারিনি। কারণ, যুদ্ধ শুরুর আগে আমরা একই সাথে থেকেছি, খেয়েছি, গল্প করেছি। ওদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই ভালো মানুষ ছিল। তাদেরকে আমি মারতে পারিনি। কিন্তু যাদের নামে আমার কানে অভিযোগ এসেছে তাদেরকে ক্ষমা করিনি, তারা যতই পরিচিত লোক হোক। এরপরও কোনো কোনো পাকিস্তানি অফিসারকে মারার সময় সেনাদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি করত, কাঁদত। আমি তখন ওদেরকে পাকিস্তানিদের অমানবিক অত্যাচারের কথা শুনিয়ে শান্ত করতাম।

সহযোদ্ধা হারানোর বেদনা

বাঘবান্ধায় অবস্থানকালে আমার ডিফেন্সে ২ জন আনসার ছিল। তারা আপন দুই ভাই। যুদ্ধের মাঝখানেই বড়ো ভাই বাড়িতে এক ডেলিভারি কেস থাকায় বাড়িতে যায়। একটি মুরগি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সে খুশিমনে মুরগিটি জবাই করার জন্যে বাংকারের সামনে যায় ছোটো ভাইকে নিয়ে। অথচ পাকিস্তানিরা অদূরেই তাদের ক্যাম্পে থেকে খেয়াল রাখত। আমি বুঝতে পেরে ওদের দুই ভাইকে বকাঝকা করলাম। বাংকারে ঢুকতে বললাম। কিন্তু ভাই দুটো আর শেষ রক্ষা করতে পারেনি। প্রথম বোমাটি পড়ল ওদের ২৫ গজ ডানে, দ্বিতীয় টি ২৫ গজ বামে। এই অবস্থা দেখে ওরা ভয় পেয়ে বাংকারের মুখের দিকে দৌড় দিল। অথচ কপাল খারাপ যে তৃতীয় বোমাটি পড়ল ঠিক বাংকারের মুখে। ঘটনাস্থলেই

দুই ভাই শহীদ হল সেদিন। আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম সেই সহোদরদের মৃত্যুতে।

এভাবে ভুরুঙ্গামারীতে হারিয়েছিলাম একজন সৈনিক। এক পাকিস্তানিকে সে নিজ হাতে মেরে খুশি মনে লাশ আনতে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অবশেষে সেও লাশ হয়ে ফিরে এসেছিল।

তবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম চৌধুরীর হাট অপারেশনের সময়। সেই অপারেশনে আমাদের সাথে এক লেফটেন্যান্ট ছিলেন। খুবই সুদর্শন বি.এ পাশ একজন যুবক। বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের কারণে ভারত থেকে তাকে এই অনারারি উপাধি দেয়া হয়েছিল। তো রাতের বেলা আমরা পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানি ঘাঁটিতে এ্যাটাক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দিলেন ডান দিক, আর নিজে নিলেন বাম দিক। বাম দিকে কয়েক গজ এগুতে না এগুতেই একটি বোমা এসে পড়ে তার ওপর, সাথে সাথে মারা যান তিনি। কতটা কষ্ট যে সেদিন মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়েছিল সেই রাতের আঁধারে, তা বলে বোঝানো যাবে না। তার নাম ছিল আব্দুস সামাদ। ভুরুঙ্গামারী বাজারের পাশেই তাকে দাফন করা হয়েছিল। আজও সেই অঞ্চলে সামাদনগর নামে একটি এলাকার পরিচিতি রয়েছে। লেফটেন্যান্ট সামাদ সাহেব আজও বেঁচে আছেন ঐ এলাকার মানুষের মুখে মুখে।

অপারেশন কার্যক্রম

আমি আমার দল নিয়ে তখন অবস্থান করছি কালুরঘাটে। আমরা অতি সতর্কতার সাথে সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছি, অন্যদিকে, নিকটবর্তী পাকিস্তানি টিম একের পর এক গুলি ছুড়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা ভারতীয় ফৌজ আসল। জিজ্ঞাসা করল, হালচাল কী, ওদের অবস্থান এখান থেকে দূরে ইত্যাদি। আমি তাঁদের অভয় দিয়ে বললাম, শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, আমরা আমাদের মতো নিরাপদ দূরত্বে আছি, আর একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। এরপর ১০-১১টি মেশিনগান বসালাম একটি গাছের উপর। ব্রাশ মারলাম পর পর কয়েকটা। দেখলাম সব নিশ্চুপ, সাড়া-শব্দ নেই। সারাদিন আমরা বাংকারে অবস্থান নিয়ে থাকলাম। রাত ৯টার দিকে ওরা প্রথমে ফায়ার ওপেন করল। এরপর শুরু করল বম্বিং। এই অবস্থায় আমি সেনাদের প্রস্তুত হতে বলার জন্য বাংকারে যাই। দেখি বাংকারে কেউ নেই, সবাই হেড কোয়ার্টারে চলে গেছে।

সারারাত একাই ওদের রেসপন্স করে সকালে গেলাম হেড কোয়ার্টারে। দেখলাম সবাই খোশ-গল্পে মেতে নাস্তা-চা খাচ্ছে। রাগে ক্ষোভে তখন আমার সারা শরীর কাঁপছে। রাগের মাথায় কয়েকজনকে লাথি মেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যুদ্ধ করতে এসেছ, নাকি চা-নাস্তা খেতেই এসেছ ? আমাকে একা বাংকারে ফেলে রেখে তোমরা কীভাবে আসতে পারলে ? যুদ্ধের ময়দানে এত ভয় পেলে কি

চলবে ! আমি তো মরিনি, এখনও বেঁচে আছি।' এক সিলেটি হাবিলদার ছিলেন আমার দলে। দেখি, তিনি রিসিভার হাতে নিয়ে আরামে চা খাচ্ছেন। টেলিফোনের রিসিভারটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে বললাম, যতদিন এখানে আছেন ততদিন আপনি আর রিসিভার ধরবেন না, সেই যোগ্যতা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তখন রিসিভারটা নিয়ে ভারতে কল করলাম। ধরলেন এক মেজর। তার বাড়ি ছিল পাবনায়, এক হিন্দু অফিসার। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, ঠিক আছে কমান্ডার সাহেব। আমি এক্ষুনি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সবাই হাতিয়ার রেখে গাড়িতে করে চলে আসেন। মেজর সাহেবের কথামতো গাড়ি আসলে আমরা সবাই বেডিংসহ গাড়িতে উঠে ভারতে চলে গেলাম। এমন এক জায়গায় পৌছলাম, সেখানে ১টি অফিস, ১টি ক্যান্টিন আছে, আর আছে ১টি বিশালাকার গোডাউন। হাতিয়ার ভর্তি। রাশিয়ান অস্ত্র। মেজর সাহেবের নির্দেশ মতো সবাই যে যার ইচ্ছেমতো হাতিয়ার নিয়ে আমরা চলে এলাম ভুরুঙ্গামারী ও বাঘবান্ধার মাঝামাঝি একটি জায়গায়। সেখানে ডিফেন্স নিয়ে আমরা পাকা সড়কের ওপর ২টি এলএমজি রাখলাম। বাংকার বানালাম গাছের আড়ালে। সেখানে খাট বসানো, খাটের ওপর মশারি হারিকেন। বাংকার থেকে ৫০ হাত দূরে রোড ব্লক দিলাম যাতে পাকিস্তানিরা গাড়ি নিয়ে আসলে রাস্তা ক্রস করতে না পারে। পাকিস্তানিদের ২টি আর্টিলারি ছিল। রাতের বেলা খুব আর্টিলারি মারল। ওদের অটোমেটিক ভালো ছিল বোমাগুলো সব আশে পাশে পড়ত। আমি আমার সেনাদের বললাম, ফায়ার ওপেন করার দরকার নেই। ওরা যদি সামনা-সামনি আসে তবেই আমরা যুদ্ধ করব। তবু তোমরা সব সময় প্রস্তুত থাকবে।

সেই রাতে পাকিস্তানিরা আমাদের খুব ফায়ার করল। আমরা চুপচাপ রাত কাটিয়ে দিলাম। সকাল বেলা ভারতীয় ফৌজ নিয়ে মেজর সাহেব আসলেন। তিনি পাকদের অবস্থান জানতে চাইলে বললাম, ভুরুঙ্গামারী বাজারের পাশে আছে ওরা। মেজর ওদেরকে দেখতে চাইলে তাকে নিয়ে একটি ঢালু জায়গা থেকে বায়নোকুলার দিয়ে দেখালাম পাকিস্তানিদের। সকালবেলা ওদের চা-নাস্তা খাওয়াচ্ছে এক বাঙালি মহিলা। দেখে-শুনে মেজর বললেন, যে করেই হোক ওদের খতম করতে হবে। এরপর তিনি আমাদের বাংকার দেখতে গেলেন। বাংকার দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আজ রাতেই শুরু হবে আখেরি অপারেশন। তোমরা ততক্ষণ নিশ্চিন্তে বসে থাকো। রাতের বেলা আমরা ১০-১২ টা থ্রি ইঞ্চি মটর, ১০-১২টা ফোর ইঞ্চি মর্টারও মেশিনগান বসালাম। এরপর সারারাত ধরে চলল ফায়ারিং, বম্বিং। সকালে আসলেন জেনারেল অরোরা। আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন, শুনলাম ভুরুঙ্গামারী অঞ্চল ক্লিয়ার, তাই না ? আমারও তাই মনে হয়েছিল। তাই মাথা নাড়ালাম। রাস্তার ওপর দেওয়া ব্লকটি খুলে দিলাম জেনারেলের গাড়ি যাওয়ার জন্যে। যেই উনি ব্লকটি ক্রস করেছেন

সাথে সাথে ফায়ারের ওপর ফায়ার। জিপের ওপর দিয়ে, আরোরা সাহেবের মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুটে চলল একের পর এক। ভাগ্য নিতান্তই ভালো যে গাড়ির চাকা এবং ওনার মাথায় কোনো গুলি লাগেনি। তড়িঘড়ি করে জিপ থেকে নেমে এসে জেনারেল বললেন, ইউকে তোমার সন্দেহই বোধহয় ঠিক, ওরা এখনো স্ট্রং আছে। এরপর আমরা পাকিস্তানিদের লক্ষ্য করে পর পর ৩০টি বোমা মারলাম। দেখি কোনো সাড়া শব্দ নেই আর। শেষে যখন ওখানে গেলাম, দেখি ৪টি লাশ ছাড়া কিছু নেই। ৪ জনই ছিল সেখানে।

আরেকটি অপারেশনের কথা মনে পড়ছে। ঐ পাকিস্তানি দলটিরও দুইটি আর্টিলারি ছিল। খুবই নিরাপদ স্থানে থেকে আমাদের ফায়ার করত একের পর এক। ভারতীয় ফৌজের মেজর এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ওদের অবস্থান। ওদের অবস্থান জানার পর বললেন, ওদেরকে ৩ মাইল দূর দিয়ে ঘুরে গিয়ে কাউন্টার এ্যাটাক করতে হবে, সামনা-সামনি নয়। কয়েকজন সাহসী রাজপুত সেনা নিয়ে ৩ মাইল ঘুরে ওদের কাছাকাছি গেলাম যেখানে বাংকার বানিয়েছে ওরা। সেই গর্ত থেকেই ফায়ার, বম্বিং করত। আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই রাজপুর সেনারা একেবারে বাংকারের মুখে গিয়ে বলল, হ্যান্ডস্ আপ। হাতিয়ার রেখে বেরিয়ে আসল ৭ জন। ১ জন কমান্ডার ৬ জন সেপাই। ঐ ৭ জনকে আমরা গুলি করে মারিনি। মেরেছিলাম বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ. করে, একটি ইনজেকশনই যথেষ্ট। এভাবে ৭ জনকে মেরে রাস্তার ওপর লাইন করে শুইয়ে দিয়েছিলাম।

গ্রামবাসীর সহযোগিতা

যুদ্ধের সময় শত্রু ছাড়া বাকি সবাই একে অন্যের মিত্র। আমরা গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি। গ্রামবাসীরা আমাদের জন্যে তার চেয়েও বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। চাল, ডাল, ফ্যান, কাঁথা, কাপড়, আশ্রয় সবকিছু দিয়েই পাশে থেকেছে তারা। ভাত না থাকলে ভাতের ফ্যান দিয়েছে, ঘরের চাল না থাকলে গ্রামের সবার থেকে চাল উঠিয়ে আমাদের দিয়েছে। এমনকি গরু, হাস, মুরগি, ছাগল এগুলোও দিয়েছে। তবে আমাদের দলটি যেহেতু ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে, তাই আমরা খাবার-দাবারের ব্যাপারে তেমন চিন্তা-ভাবনা করতাম না। এমনকি আমি যেখানেই আমার দল নিয়ে গেছি, সেখানে টেলিফোন পর্যন্ত চলে গেছে।

যখন পেট্রোলে যেতাম, চোখে পড়ত অসহায় ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ। আমাকে দেখে আবদার করত, অভাব-অভিযোগ বলত। বলত– বাবা, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। না খেয়ে লড়ছি। আমাদের ভাত, তরকারি নেই, শুধু গুলি-বোমা

আছে। আমি তখন আমার দলের তরফ থেকে, গ্রামের মুরুব্বিদের থেকে চেয়ে ওদেরকে খেতে দিতাম।

স্বপ্ন ছিল

স্বপ্ন তখন একটাই ছিল– দেশটা কেমন করে আজাদ হবে, মানে স্বাধীন হবে। এই দেশকে আমার নিজের দেশই মনে করি। কারণ, এখানেই আমার তিন পুরুষের নাড়ি পোঁতা। দেশ আমাকে যাই মনে করুক, আমি নিজেকে এই দেশের বাইরে ভাবতে পারি না। মায়ের মতোই ভালোবাসি এই মাতৃভূমিকে। এই ভালোবাসা থেকে আমি প্রাণবাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। আমার স্মরণে ১৯৭১-র ভয়াবহ যুদ্ধের উত্তাল সময়গুলোতে কখনোই ভাবতে পারিনি আগামীকাল আমি বেঁচে থাকব। প্রত্যেকটি দিন জীবনের বোনাস টাইম মনে হত। যত বিপদেই পড়েছি ঘাবড়ে যাই নি, ভয় পাইনি।

আমার সেক্টর কমান্ডার বাশার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইউকে আপনি কি মনে করেন দেশটা স্বাধীন হবে ? জবাবে বলেছিলাম, অস্ত্র যখন হাতে নিয়েছি স্যার ; যতক্ষণ আমার অস্ত্র ধরে রাখার শক্তি থাকবে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সাহস আছে তো লড়ে যাওয়ার ? বলেছিলাম, আমাকে সাহস দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপার আমার সৃষ্টিকর্তার। তবে স্যার এখনো আমি কিছুতে সাহস হারাই নি, ভয়ও পাই নি।

আমি আমার দেশ মাতার মুক্তির স্বপ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছি সকল ভয়-ভীতি, বাধা-বিপত্তিকে পেছনে ফেলে। কেননা, মুক্তির প্রশ্নে ভয় কখনো সাফল্য বয়ে আনতে পারে না। স্বপ্নের মূল্যায়ন করতে হয় সাহস দিয়ে।

ডিসেম্বর ও বিজয়

১৪ ডিসেম্বর থেকে আমি আমার গ্রুপ নিয়ে তিস্তা ব্রিজ এলাকায় অবস্থান করেছিলাম। ২ দিন ধরে, থেকে থেকে হালকা-পাতলা গোলাগুলি হল। ১৬ ডিসেম্বর সকালে হঠাৎ করে আমাদের জানানো হল ৯টা পর্যন্ত সময়, এরপর আর ফায়ার করা যাবে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং বিজয় ঘোষিত হয়েছে। তো আমরা সকাল ৯টা বাজার আগেই ছোট্ট একটি অপারেশন সারলাম। ৪ জন পাকিস্তানি একটি বাংকারের সামনে বসে চা খাচ্ছিল। সব কিছু পজিশন করে দিলাম ব্রাশ। ৪ জনের মধ্যে ২ জন মারা গেল আর ২ জন পালিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর ৯টা বাজলে পাকিস্তানিরা সাদা পতাকা টানিয়ে দিল। আমরা তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে রেল স্টেশনে গেলাম। দেখি রেল স্টাফরা গরু-খাশি জবাই করে আমাদের জন্যে খাবার তৈরি করছে। চারদিকে তখন বিজয়ের বিমুগ্ধ উৎসব। বাঙালির আনন্দের কত ধরনের প্রকাশ যে থাকতে পারে, সেদিন দেখেছিলাম।

খাওয়া সম্পন্ন করে ২টি গরুর গাড়িতে আমাদের সব বেডিং আর অস্ত্র নিয়ে আমি রংপুর গেলাম। উঠলাম রংপুর কলেজে। গ্রামের লোকজন আমাদের গরু জবাই করে খাওয়ালো।

সকালবেলা কলেজ গেটে দেখা হল অনেকগুলো আত্মসর্পণিকারী পাকিস্তানি সেনাদের সাথে। তাদের অনেককেই চিনতে পারলাম। কেননা, যুদ্ধের আগে আমরা এক সাথে থেকেছি, খেয়েছি, খেলেছি। আমাকে দেখেই তাদের কয়েকজন হাসিমুখে এগিয়ে আসল। অনেকদিন পরে ঘনিষ্ট কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে যেমন হয়, তেমনিভাবে বলে ওঠল, বাইঞ্চোদ ইউকে, তুমি এখনো মরো নি দেখছি। জবাবে আমি বললাম, শালা আমি এখনো বেঁচে আছি বলেই তোমাদের জীবিত দেখছি। এভাবে কিছুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ করে হাত মেলালাম। ওরা বলল, ভাই তোমাদের দেশ তোমাদেরই থাক্। সব কিছু ভুলে যাও, যা হয়েছে হয়ত বা ভালোই হয়েছে। তোমরা তো যাই হোক খেতে পেয়েছ। আমরা না খেয়ে মরছি। এসব শেষ হয়েছে ভালো হয়েছে। তোমাদের শুভ হোক। আমিও ওদের কল্যাণ কামনা করে পরস্পর বিদায় নিলাম।

অনাকাঙ্ক্ষিত

যুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অনভিপ্রেত নয়, খুবই স্বাভাবিক। এমন অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল যারা আদৌ যুদ্ধ করার ইচ্ছায় যায় নি, প্রাণ বাঁচাতে আর লুটপাটের সুযোগ নিতে গেছে। তেমনি একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। সেটা বাঙালিরা করেনি, মিত্র বাহিনীর সদস্যরা করেছিল। ঘটনাটা ঘটে ১৬ ডিসেম্বর রাতে। বাংলাদেশ তখন আনন্দে ভাসছে। তবুও লোকজন অনেকেই ঘর থেকে বেরতে ভয় পেত। শহরগুলো সব প্রায় ফাঁকাই ছিল। সবাই তখন গ্রামমুখী। ১৬ ডিসেম্বর আমি আমার দলের বেডিং ও অস্ত্র নিয়ে ২টি গরুর গাড়ি বোঝাই করে রংপুর শহরে আসি। শহর ক্রস করে কলেজে যাব এমন সময় দেখি বড়ো রাস্তার ওপর ৪-৫টি আর্মির গাড়ি লাইন করে দাঁড়ানো। গাড়িগুলো দাঁড়ানো ছিল শহরের বড়ো বড়ো দোকানগুলোর সামনে। সেগুলোতে দামি দামি জিনিসপত্র বিক্রি হত। ওরা দেখলাম, দোকানগুলোর ঝাপ খুলে ইচ্ছেমতো গাড়িতে মালামাল লুট করে ভরে নিচ্ছে। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, শেষে আগুনটা যেন লাগাবেন না। অন্তত এই অনুরোধটা রাখতে বলছি। এই বলে মনের কষ্ট মনে নিয়েই চলে আসি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভাবনা

ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করতে পারলেই আমাদের দেশটাকে আমরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিব। আমরা দেশের সবাই একসাথে গড়ে তুলব

আমাদের ভবিষ্যৎ। সুখে থাকার জন্যে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সুখ যেন অচিন পাখি। দেশের সাধারণ মানুষ আজও তার নাগাল পায়নি। সেই সেদিনের মতো আজও সাধারণ মানুষ অসহায়, কতিপয় অসাধারণ মানুষের কাছে। যারা স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে খুন করে, চাঁদাবাজি করে। ভেবেছিলাম দেশটা স্বাধীন হলে সংসদের সব মন্ত্রী এমপি হবে এদেশের মানুষ। ডিসি, এসপি, বড়ো বড়ো অফিসার হবে এদেশের মানুষ। তারা সবাই দেশের উন্নতির কথা ভাববে। কিন্তু যা দেখার কথা তা এখনো দেখি নি। এখন দেখছি, যাদের হাতে দেশ তার পরিচালনার ভার দেয়, তারাই তাকে লুটে পুটে খায়। কী লাভ হল এত রক্তের স্বাধীনতায় ?

আমি এদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্যে অবহেলা করিনি। যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম ইপিআর-এ। যুদ্ধের পরে তার নাম হল বিডিআর। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি আর্মিতে যাব নাকি বিডিআর-এ থাকব। আমি বলেছি, যেহেতু এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমি যুদ্ধ করেছি, সেহেতু আমার মেধা-শ্রম সবই এই ডিপার্টমেন্টকে দিতে চাই। তাই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমি আমার ফোর্সকে গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অসংখ্য নতুন নতুন সেনাদের ভর্তি করিয়ে নিজ হাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আর এসব করেছি এদেশের একজন নাগরিক হিসেবে কর্তব্যের খাতিরে।

যা চেয়েছি

আমি মনে করি, আমি যে আজও বেঁচে আছি- এটা আমার বোনাস লাইফ। শুধু আমি নই, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসা সব যোদ্ধাদেরই বোধহয় একই ভাবনা আমার মতো। স্বপ্নই জন্ম দেয় সম্ভাবনা, আর সম্ভাবনা থেকে রূপ পায় বাস্তবায়ন। আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা শুধু একটি শব্দ নয়, সকল ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তি, নিপীড়ন, অত্যাচার, লুণ্ঠনও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি। আমরা চেয়েছি এমন একটি দেশ যে দেশ তার সকল নাগরিককে মর্যাদা দেবে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিবে, সঠিক শাসন ব্যবস্থা, আইন-কানুন প্রনয়ন করবে, যার ফলাফল হবে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

যা পেয়েছি

অনেক পেয়েছি। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুন্দর পতাকা, নিজের দেশের বড়ো বড়ো মন্ত্রী, এমপি, অফিসার, সবই তো পেয়েছি। এমনকি দেশ আমাকে বীরত্বের জন্যে একটি উপাধিও দিয়েছে। আমার নাম এখন ইউকে চিং বীরবিক্রম। বাহ্ কী সুন্দর নাম ! আদিবাসী শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত ইউকে চিং মারমা। অথচ তার পেটে এখন ইঁদুর দৌড়ায়, বাইরে বৃষ্টি নামার আগে ঘরে পানি

পড়ে। তার কোনো জায়গা-জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। তার সন্তানদের কোনো চাকরি-বাকরি নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো তাদের কোনো আয়ের উৎসও নেই। তাঁর সন্তানরা এখন দিনমজুর। এই হল একজন খেতাবপ্রাপ্ত অসহায় মুক্তিযোদ্ধার সংসারের হালচাল।

অথচ কথা ছিল, যারা খেতাবপ্রাপ্ত তাঁদেরকে একটি ঘর করে দেবে, জায়গা-জমি দেবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে টাকা দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এসব অঙ্গীকার এখনো অঙ্গীকারের জায়গাতেই রয়ে গেছে। সম্প্রতি গরিব অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা দেওয়া চালু হয়েছে। চাকরি-বাকরিসহ আরও কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগের আকাঙ্ক্ষায় বছরের পর বছর বেড়ে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা। যারা এদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে নিচ্ছে তারাই আবার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছে।

আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর, আমি আমার প্রদেয় সুবিধার জন্যে হাহাকার করে মরছি। আমাকে কেউ দেখে না। জঙ্গলে থাকি বলে কেউ খোঁজ নেয় না। স্বচ্ছল হলে তো কখনোই চাইতে যেতাম না ৫০০ টাকার সম্মানী ভাতা। অস্বচ্ছল বলেই চাইতে গেছি। এক অফিসার আমার ছবি দেখে বললেন, উনি তো পেনশন পান। সম্মানী ভাতা তাকে দেওয়া যাবে না। আমি বললাম, দেখুন স্যার যুদ্ধ করলাম, তার জন্যে কি এই সামান্য সম্মানটা পেতে পারি না ? সরকার কেন এই অসহায়, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে তা দেবে না ? অথচ আজ সব পাচ্ছে স্বচ্ছল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা। তারা ভাতা নিচ্ছে, তাদের সন্তানরা মুক্তিযোদ্ধা নাম বিক্রি করে চাকরি পাচ্ছে। যুদ্ধের সময় তো মাটি আর গাছ ছাড়া একটি কাকও দেখতে পাইনি। আর আজ কত দাবিদার, শুধু আমি ঠাঁই পাই না।

ইউকে চিং ৬ নং সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর আব্দুল বাশার এবং সাব-সেক্টর কমান্ডার সুবেদার আরব আলী, সুবেদার বোরহান উদ্দিনের অধীনে নিজে দলীয় কমান্ডার হিসেবে পরিচালনা করেছেন অসংখ্য অপারেশন। অধিকাংশ অপারেশনেই স্বীয় মেধা, কৌশল এবং বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে অর্জন করেছেন সফলতা পেয়েছেন বীরবিক্রম খেতাব। কিন্তু পাননি এখনো ভালোভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন, সামান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা। চরম আর্থিক দৈন্যতায় হতাশ বীর মুক্তিযোদ্ধা।

মংসা থোয়াই মগ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মংসা থোয়াই মগ। পিতা মৃত কংহ্লাপ্রু মারমা। ১৯৪৮ সালে তিনি খাগড়াছড়ি সদরের পানখাইয়া পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এটাই তার স্থায়ী নিবাস। তিনি চট্টগ্রামের

রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে চাকরি নেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, শিক্ষকতায়। মুক্তিযুদ্ধের ১৯৭১-এ তিনি এই পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। দেশের সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে দেশকে মুক্তি করার প্রত্যয় তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংকল্প নেন। এ লক্ষ্যে তিনি নিজ এলাকা ও সম্প্রদায়ের ১০ জনের একটি দলের সাথে পানছড়ি ভাইবোন ছড়ি হয়ে ভারতের বঙ্কুল সীমান্তে যান। সেখান থেকে ১৫ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে প্রত্যাবর্তন করেন নিজ ভূমিতে।

দেশে ফিরে তিনি রাঙামাটির মারিশ্যা এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। ১ নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার নিত্তহ্লার নেতৃত্বে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। অপারেশনগুলোর মধ্যে রাঙামাটির মাইনীমুখ অপারেশনটি ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এ সময় ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোবাহিনীরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিজোরা পিছু হটে এবং তাদের বিপুল ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে মাইনীমুখ এলাকা মুক্ত হয়। এরপর যুদ্ধ শেষ হয় এক সময়। আসে বিজয়। বিজয়ের সেই ১৬ ডিসেম্বর তিনি রাঙামাটিতে অবস্থানরত ছিলেন। এরপর রাঙামাটিতেই ভারতীয় বাহিনীর এক কমান্ডারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পর মংসা থোয়াই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে আনসার ভিডিপিতে যোগ দেন। কিন্তু এখানকার স্বল্প বেতনে চলে না তাঁর ৬-৭ জনের সংসার। ছেলে মেয়েদের অনেক কষ্টে পড়াশোনা করিয়েও চাকরি দিতে পারছেন না। চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে পাচ্ছে না তারা মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের সুবিধা। অর্থহীন প্রহসনের এই সুবিধা আজ সুবিধাভোগীরাই পাচ্ছে। হতাশা ও গ্লানিতে মুক্তিযোদ্ধা মংসা থোয়াই আজ দিশেহারা।

থৈয়ং রিং মারমা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা থৈয়ং রিং মারমা। পিতা মৃত চাইরি প্রু মারমা। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানখাইয়া পাড়ায় তাঁর জন্ম। এটাই তার স্থায়ী নিবাস। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি আত্মনিয়োগ করেন গৃহস্থালীর কাজে। এরপর আসে একাত্তর সেই উত্তাল সময়ে থৈয়ং রিং এলাকার নিজ সম্প্রদায়ের যুবকদের অনুপ্রেরণায় মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এরপর তিনি দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১ নং সেক্টরের অধীনে বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করে তিনি বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দেখান। এরপর যুদ্ধ শেষে তিনি অস্ত্র সমর্পণ করে পুনরায় নিযুক্ত হন গৃহস্থালীর কাজে। দারিদ্র্যের কারণে হারাতে থাকেন নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি। এক সময়

তিনি পরিণত হন ভূমিহীন কৃষকে। দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাসিক ৫০০ টাকা সম্মানী ভাতা পান তিনি। কিন্তু এই সামান্য সম্মানী তাঁর সম্মান বাঁচাতে পারে না। তাই বর্তমানে স্ত্রী সন্তানসহ তিনি যাপন করছেন এখন এক মানবেতর জীবন। অর্ধাহারে-অনাহারে কাটছে থৈয়ং রিং মারমা, একজন আদিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধার শেষ বয়সের দিনগুলো, কাটছে তার অভিমানের সংসার।

মং শৈহ্লা চৌধুরী

আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মং শৈহ্লা চৌধুরী। পিতা মং শৈচা চৌধুরী। ১৯৫৬ সালে বান্দরবান শহরতলীর বিক্রিছড়া মুখ গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এটাই তার স্থায়ী নিবাস। বোমাং রাজের জামাতা হওয়ার সুবাদে বর্তমানে তিনি বান্দরবান শহরে অবস্থিত বোমাং রাজবাড়িতে আবাসিত।

১৯৭১-র ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মং শৈহ্লা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে প্রতিজ্ঞ হন। তখন তিনি বান্দরবান উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, ১৫ বছরের কিশোর। ছাত্রাবস্থায় প্রভাবিত হয়েছিলেন শিক্ষক দীপ্তি কুমার বড়ুয়ার ব্যক্তিত্বে এবং পাশাপাশি অনুগত ছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের আদর্শে। তার সম্প্রদায়ের আরও ৫ জন একইভাবে মুক্তির সংগ্রামে শামিল হন। মার্চ মাসের শেষেরদিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে বান্দানাইশের ঠোবাছড়িতে যান। সেখানকার এক গভীর জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী। মং শৈহ্লা এখানে কিছুদিন অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এরপর সপ্তম মাসে তিনি ট্রেনিং গ্রহণের জন্যে বিলাইছড়ি হয়ে ভারতের দেমাগ্রীতে যান। সেখানে গিয়ে নাম নিবন্ধন করেন। কিন্তু ট্রেনিং গ্রহণকালে ভারতীয় প্রশিক্ষক তাঁর দক্ষতা দেখে প্রশিক্ষণ না দিয়ে জানান, তার জানা প্রশিক্ষণ আরো বেশি কার্যকর। তাই ট্রেনিং না নিয়েই মং শৈহ্লা প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে। দেশে ফিরে তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর যুদ্ধ করেন রাঙামাটির বরকল অঞ্চলে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঁশখালী অপারেশনটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যুদ্ধ চলাকালে তিনি ১ নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার মোখলেসুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে এসব অপারেশনে অবদান রাখেন। এরপর ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় মিত্রবাহিনী প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তিনি মিত্রবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন।

এর অল্প কিছুদিন পরেই চলে আসে পরম আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ১৬ ডিসেম্বর। তখন তিনি রাঙামাটিতে অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি রাঙামাটি পুলিশ লাইনে অস্ত্র সমর্পণ করে ফিরে আসেন নিজ আবাসে। পুনরায় শুরু করেন অর্ধসমাপ্ত অধ্যয়ন। বান্দরবান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং বান্দরবান

কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে আচরেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে নিযুক্ত হন সাংবাদিকতায়। 'দৈনিক বাংলা'র বান্দরবান প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ৩ বছর কাজ করে রোষানলে পড়েন তৎকালীন স্বৈরশাসকের। এরপর সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি ছোটো ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও দেশের দুর্দশা-জর্জর অবস্থায় ব্যথিত হন মং শৈহ্লা চৌধুরী। ব্যথিত হন স্বাধীনতার নায়ক মুক্তিযোদ্ধাদের, বিশেষ করে দরিদ্র ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের গ্লানিকর জীবন যাপনে। আজ অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের পরিচয় নিয়ে গর্বিত নন, অন্যদের মতো শৈহ্লাও বরং প্রতিমুহূর্তে ভুগতে থাকেন আত্মস্মৃতির অনুশোচনায়।

রন বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা

আদিবাসী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রন বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। পিতা বরেন ত্রিপুরা। জন্ম ১৯৫১ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড়ে। শৈশব-কৈশোর কাটিয়েছেন রাঙামাটি জেলায়। রাঙামাটি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন এবং রাঙামাটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যয়নকালে যোগ দেন ১৯৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধে। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘর ছাড়েন কিশোর রন বিক্রম। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর ঘরে ফেরেন নি তিনি। ৭ মার্চের ভাষণের পর রন বিক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার এইচ টি ইমামের নেতৃত্বে গঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দেন। ২৫ মার্চের সেই ঘৃণিত হত্যাযজ্ঞের কালো রাতে তিনি পুলিশ বাহিনীর সাথে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টিতে অংশ নেন। এরপর রাঙামাটিতে পাকিস্তানিরা প্রবেশ করলে তিনি তার দলের সাথে পথে পথে যুদ্ধ করতে করতে চলে যান খাগড়াছড়িতে। এখান থেকে এক গ্রুপ মাটিরাঙা হয়ে রামগড় এবং অন্য গ্রুপ মহালছড়ি হয়ে রামগড় যায়।

সে সময় মহালছড়ি ও বুড়িঘাটে পাক বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বুড়িঘাটের সেই যুদ্ধেই শহীদ হন বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন। অন্যদিকে, মহালছড়িতে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজো বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হন ক্যাপ্টেন আবদুল কাদির। এরপর পাকিস্তানিদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় রামগড়ে। রামগড়ের যুদ্ধ শেষে রন বিক্রম প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশে রামগড় হয়ে ভারতের সাব্রুম-এ যান। সেখান থেকে ১৯-২০ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে মে মাসের প্রথমদিকে ফিরে আসেন বাংলাদেশে। দেশে ফিরে অংশ নেন পাতাছড়ি, সোনাইপুর, যুগাছোলা, গাড়ীটানাসহ বেশ কয়েকটি অপারেশনে। অপারেশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল যুগাছোলা অপারেশন। পাক

বাহিনীর আক্রমণে তিনি সেদিন ১ জন সহযোদ্ধা হারিয়েছিলেন। তবে সেই অপারেশনে পাকদের ২০-২৫ জন নিহত হয়েছিল। এরপর গোলা-বারুদ আনার জন্যে পুনরায় ভারতে গেলে দেখা হয় আওয়ামী লীগের নেতা এম এ হান্নান, এম এ মান্নান, এস এম ইউসুফের সঙ্গে। তারা রন বিক্রমকে শরণার্থী শিবির থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহের জন্যে রিক্রুটিং অফিসারের দায়িত্ব দেন। এ দায়িত্ব নিয়ে তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেন কয়েকশত ছাত্র ও যুবক। এদেরকে তিনি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে নিয়ে যান অলি নগর ক্যাম্পে। কিছুদিন পর নতুন আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে চলে আসেন গাড়ীটানা ক্যাম্পে।

তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আবার ভারতে যান। সেখানকার দেরাদুনে দেড়মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে আসেন বাংলাদেশে। তখন ডিসেম্বর মাসের প্রথম পর্যায়। ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পাকিস্তানিরা তখন কোণঠাসা। রন বিক্রম তার দল নিয়ে রামগড় থেকে হিয়াকু পর্যন্ত পাকবাহিনীর পেছনে অবস্থান নেন। একের পর এক অঞ্চল শত্রুমুক্ত করতে থাকে তার দল। বিজয়ের সন্ধিক্ষণে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর তারা মুক্ত করেন মানিকছড়ি ও গাড়ীটানা অঞ্চল। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ঘোষণার পরও তারা বিকেল পর্যন্ত পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে মুক্ত করেছিলেন মানিকছড়ি। যুদ্ধ শেষে ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে রাঙামাটিতে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন তিনি। রন বিক্রমের পিতা বরেন ত্রিপুরা ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার বোনের স্বামীও এ সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেই অস্থির দিনগুলোতে। এছাড়াও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে রন বিক্রম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু খুন হলে তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কারাবরণ করেন। শিকার হন জেলখানায় অমানুষিক নির্যাতনের। জিয়ার সামরিক শাসনের সময়ে টর্চারিং সেলে চট্টগ্রামে ২১ দিন এবং ঢাকায় ২ মাস বন্দি অবস্থায় তার উপর করা হয় অকথ্য অত্যাচার। এরপর বিশেষ ক্ষমতা আইনে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকেন। সে সময়ে হাইকোর্টে রিট করে ২ বছর ৮ মাস আটক থাকার পর মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও দীর্ঘ তিন বছর নিজ এলাকায় অবস্থান করতে দেয়া হয়নি রন বিক্রমকে। এরপর দীর্ঘদিন খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর জীবিকা হিসেবে বেছে নেন ঠিকাদারী পেশা। আজও তিনি এই পেশায়ে নিয়োজিত। ৫ সন্তানের জনক রন বিক্রম ত্রিপুরা স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরেও পাননি স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদ। আক্ষেপের সুরে তাকে আজ বলতে হয়— "একটি মানব সন্তান জন্মানোর জন্যেও ১০ মাস সময় লাগে। আর পুরো এই

দেশটা স্বাধীন হয়েছে মাত্র ৯ মাস সময়ে। তাই আমরা এর মর্যাদা বুঝতে পারছি না। যাচ্ছেতাইভাবে এর ব্যবহার করে যাচ্ছি। কারণে-অকারণে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রহসনের খেলা চলেছে । কখনো কখনো বক্তৃতার ছলে তাঁদের নামের সাথে বসিয়েছে বিশেষণের পর বিশেষণ। অথচ খোঁজ নেয়নি তাদের পেট চলে কি না ! বৎসরান্তে স্বাধীনতাসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আজ শো-পিস হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং কখনো কখনো তাদের গায়ে একটি গেঞ্জি পরিয়ে ডিসি-এসপিদের যৌথ সালাম দেওয়ায়। ছি ! এটা ভাবতেই লজ্জা হয় যে, স্বাধীনতা না পেলে ঐ ডিসি-এসপিরা বড়োজোর কোনো অফিসের কেরানি হতে পারত। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মহান মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন দলের ব্যানারে ব্যবহার করে। এটা পুরোপুরি অন্যায়। কেননা, মুক্তিযোদ্ধারা কোনো দলের নয়, তারা সমস্ত দেশের, সকল জনগণের। আরও দুঃখজনক বিষয় হল– যে পতাকার জন্যে একদিন নিজামীদের রক্ত নিতে চেয়েছি, সেই নিজামীরা আমার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পতাকা নিয়ে চলাফেরা করে। সদম্ভে ঘুরে বেড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের এখনো বিচার হয়। আর একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় না। বরং ওরাই এখন বিচারকের আসনে। বঙ্গবন্ধুকে খুন করার মাধ্যমে তারা বৈধতা নিয়ে নেয়, যাচ্ছেতাইভাবে দেশটা শোষণ করার। সেই শোষণের অন্যতম লক্ষণ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতন করা। এভাবেই দেশকে করেছে মেধাহীন।

আজও তার প্রবর্তিত ধারা সগৌরবে বয়ে চলেছে। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও এদেশে প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্ত অধিকার। "আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য ছিলাম দীর্ঘদিন। আমার ছোটো ভাই পুলিশের এডিশনাল ডিআইজি। অথচ আমার নিজস্ব রোজগার করা জমিতে অন্যায়ভাবে দখল নিয়ে বাড়ি করে ভাড়া দিয়েছে কতিপয় প্রভাবশালী। যেখানে আমার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধার এই অবস্থা হতে পারে, সেখানে সাধারণ এবং অতিসাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কী অবস্থা তা সহজেই অনুমেয় ! তবে, একটি আশার কথা ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে দুর্নীতি বিষয়ক পাঠ সংযোজন করা হচ্ছে। এটা একটা বিপ্লব। তবে স্বাধীনতা রক্ষা করা অন্তহীন বিপ্লবের মতন। আশা করছি, অচিরেই পাঠক্রমে আমাদের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি তা হয়, তবেই সম্ভব আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে দেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন।"

প্রীতিকান্তি ত্রিপুরা

হিন্দু ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের এক আদিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রীতিকান্তি ত্রিপুরা। তাঁর পিতা সত্য বিলাস ত্রিপুরা, মাতা বনদেবী ত্রিপুরা। জন্ম, বেড়ে ওঠা

এবং স্থায়ী নিবাস রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সদর থানার গর্জনতলী গ্রামে। ১৯৭১ সালে প্রীতিকান্তি রাঙামাটি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত হন শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ থেকে। তাঁর মতে, এরপর আর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এরপর তিনি রাঙামাটি থেকে চলে যান বান্দরবানে। সেখানে গিয়ে এপ্রিলের প্রথমদিকে গঠন করেন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। প্রাথমিকভাবে এই পরিষদের কার্যক্রম নির্দিষ্ট হয় কালুরঘাট ব্রিজে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর খাবার সরবরাহের। এরপর যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে ঐ স্থানের মুক্তিযোদ্ধারা কালুরঘাট এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ করে চলে আসে বান্দরবানে। এই পিছু হটায় মনোবল ভেঙে যায় প্রীতিকান্তির সংগ্রাম পরিষদের। মে মাসের প্রথমদিকে পরিবারের কাউকে না জানিয়ে রুমা হয়ে চলে যান ভারতের দেমাগ্রীতে।

শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেবার কালে দেখা পান স্থানীয় কয়েকজনের। তাঁদের সাথে দেমাগ্রী ট্রেনিং ক্যাম্পে মাসখানেক প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ৪০ জনের একটি দল দলীয় কমান্ডার আবদুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে বাংলাদেশে চলে আসে। দেশে অবস্থান নেওয়ার প্রথম পর্যায়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন সীতাকুণ্ড ওয়ারলেস টাওয়ার উড়িয়ে দেওয়ার। এ লক্ষ্যে তাঁরা ১২ জুলাই রুমায় পৌছেন। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলাপ করে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তা দলের অনুকূল না হওয়ায় রওনা দেন বান্দরবানের দিকে। পথিমধ্যে জলপথে তাদের সংঘর্ষ হয় রাজাকারদের সাথে। এদের এ্যামবুশে এই সময় সঞ্জিব চাকমাসহ ২ জন সহযোদ্ধা হারান প্রীতিকান্তি। আর তিনি নিজেকে রক্ষা করেন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে নদী তীরে উঠে দেখা পান ৪ জন সহযোদ্ধার। এরপর তারা গোপনে পায়ে হেঁটে চলে যান দোপাছড়ি এলাকায়। সেখানে দল নিয়ে অবস্থান করছিলেন তৎকালীন বান্দরবান আওয়ামী লীগ নেতা মোখলেসুর রহমান। প্রীতিকান্তি এরপর এই দলের সাথে যোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করেন পরবর্তী বেশ কয়েকটি অপারেশনে।

অস্থির সেই সময় থেমে আসে, স্বাধীন হয় দেশ। স্বাধীনতার পর ২২ ডিসেম্বর প্রীতিকান্তি ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তিনি ইন্টারমিডিয়েট এবং স্নাতক পাশ করে প্রবেশ করেন কর্ম জীবনে। বর্তমানে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা।

স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে আজও বাংলাদেশের অনুন্নত দুর্দশা ব্যথিত করে মুক্তিযোদ্ধা প্রীতিকান্তি ত্রিপুরাকে। তাঁর মতে, "দেশের এই করুণ আস্থার জন্য দায়ী এদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা।" অবিবেচক ও নীতিহীন নেতৃত্বকেও দায়ী করেন তিনি এজন্যে। তাঁর মতে, "যারাই ভার নেয়

দেশ রক্ষার, তারাই শেষ পর্যন্ত ভক্ষকের ভূমিকা নেয়। এজন্যই দেশ আজ কঙ্কালসার। মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দশা, রাজাকারদের উন্নতাবস্থাও এই একই কারণে।" এই দেশের জন্যে এত রক্ত, এত ত্যাগ স্বীকার করেন নি প্রীতিকান্তি।

মংসাথোয়াই চৌধুরী

মংসা থোয়াই চৌধুরী আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। পিতা মৃত কঞ্চো চৌধুরী। ১৯৫৫ সালের ৩০ জুন স্থায়ী নিবাস খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা থানার লুব্রেমং হেডম্যান পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান নিবাস খাগড়াছড়ি সদরের সড়ক উপবিভাগ-১এ। মংসা থোয়াই রামগড় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং খাগড়াছড়ি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বি.কম আলম স্যারের আদর্শে, যিনি ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র, ১৭ বছরের টগবগে তরুণ। সাধারণ জনগণের উপর পাক বাহিনীর অত্যাচার, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি অন্যায় অবমাননা এবং স্থানীয় রাজাকারদের ঘৃণ্য তৎপরতায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়াও হৃদয়ে জমানো ছিল পাকিস্তানিদের সৃষ্ট বিভিন্ন বৈষম্য ও শোষণের ফলাফল অসীম থেকে ক্ষোভ ও ঘৃণা। '৭১-র সেই যুগসন্ধিক্ষণ তাকে যেন দিয়েছিল শোষকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের সুযোগ।

এই লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে স্থানীয় ২৫-২৬ জন মারমা ছাত্র-যুবককে সাথে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। সেখানকার পালাডাঙ্গা কেন্দ্রে ৩৭ দিনের ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। সেই ট্রেনিং পর্যায়টি ছিল ২ ভাগে বিভক্ত– সাধারণ ট্রেনিং এবং জঙ্গল ট্রেনিং। এর মধ্যে জঙ্গল ট্রেনিংটি ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল। কারণ, ট্রেনিং স্পট হিসেবে বেছে নেওয়া জঙ্গলে ছিল বিশাল বিশাল সাপ ও ভয়ংকর প্রাণী। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ আহতও হত সেই প্রাণীদের দ্বারা। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৭ দিনের জঙ্গল ট্রেনিংয়ে অংশ নিতে হত।

ট্রেনিং শেষে মংসা থোয়াই তার দলের সাথে অক্টোবর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে পানছড়িতে অবস্থান নেন। এটা ছিল ২ নং সেক্টর অবিভক্ত এলাকা। দলীয় কমান্ডার মং চিয়ং এবং সহ-কমান্ডার ছিলেন তিনি নিজে। যখন পানছড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন তখন শত্রুপক্ষের অবস্থান জানার জন্যে রেকি করার প্রয়োজন পড়ে। এটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই লটারির মাধ্যমে রেকির জন্যে ৪ জন নির্বাচন করা হয়। কারণ, শত্রুপক্ষ পাকিস্তানিরা সব সময়ই দূরবীন নিয়ে বসে আছে। আর ধরা পড়লে তো কথাই নেই, শেষ করে ফেলবে। স্থানটি ছিল ভাইবোনছড়া। সেখান থেকে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে মংসা থোয়াইসহ তার দলের মোট ৪ জন রেকি করে অল ক্লিয়ার দেখতে পেয়ে অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় তাঁরা

নির্দিষ্ট সময় পড়ে শত্রুর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তুত হতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার আগেই তাদের বদলে আক্রমণ করে বসে শত্রুপক্ষ পাকিস্তানিরা। পাকিস্তানিদের অতর্কিত আক্রমণে দলের কয়েকজন সহযোদ্ধা আহত হওয়ার পাশাপাশি উভয় দলের ক্রসফায়ারে আশ পাশের কয়েকজন গ্রামবাসী সাধারণ মানুষ নিহত হয়। পরবর্তী অপারেশনের জন্যে মংসা থোয়াই তার দলের সাথে কুকিছড়িতে অবস্থান নেন। সেখানে অবস্থানকালে এক মধ্যবয়সী চাকমা পুরুষ তাদের জানায় যে, পাকিস্তানিরা নিকটবর্তী অবস্থান ছেড়ে চলে গেছে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তারা নির্ভয়ে সামনে এগুতে থাকলে কিছু দূর যেতেই অ্যামবুশে পড়েন। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যামবুশে কয়েকজন সহযোদ্ধা মারাত্মক আহত হন। কিন্তু এই অপারেশন অবশেষে একটি সফল অপারেশনে রূপ নেয়। কুকিছড়ি সেই অপারেশনে সেদিন শত্রুমুক্ত হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বেশ কয়েকজন মারা যায়। এরপর মংসা থোয়াই তার দলের সাথে চলে যান কুকিছড়ি থেকে দাছবানে। সেদিন ছিল ১৪ ডিসেম্বর। ১৫ ডিসেম্বর তিনি সদলবলে খাগড়াছড়ি পৌঁছেন।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় ঘোষিত হলে আনন্দ-উল্লাস পর্ব সেরে তিনি চলে যান জন্মস্থান গুইমারাতে। সেখানে তার প্লাটুন ১৫ দিন অবস্থান করে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশমনে ভূমিকা রাখে। সে সময় যেন কোনো ভালো মানুষকে রাজাকার সন্দেহ করে ক্ষতি করা না হয় সেদিকে তারা লক্ষ রাখতেন। তারপর দেশমাতার প্রতি সুমহান দায়িত্ব শেষ করে জানুয়ারি মাসে খাগড়াছড়িতে একজন সামরিক অফিসারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন।

যুদ্ধ শেষে মংসা থোয়াই চৌধুরী সড়ক ও জনপথ বিভাগে যোগদান করে দেশের কল্যাণে সব ধরনের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকেন।

কংক্য মগ

আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা কংক্য মগ। পিতা মৃত মংতু মগ। জন্ম ১৯৫১ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারায়। রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে তিনি গুইমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা বছরে তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রভাবিত হয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষক আব্দুল বারেক এবং মধুসূদন ভৌমিকের আদর্শে।

১৯৭১ সালের মে মাসে কংক্য মগ পার্শ্ববর্তী মহালছড়ি ও নিজ এলাকা গুইমারার ২৯ জন মুক্তিকামী যুবকের দলে মিশে ত্যাগ করেন নিজের বসতভূমির মায়া। এই দলের সাথে তিনি তবলছড়ি ও বৈষ্ণবপুর হয়ে পৌঁছেন ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে চলে যান উত্তর প্রদেশের

দেরাদুন জেলায় টান্ডুয়া ক্যাম্পে। শেখ মুজিব-পুত্র শেখ কামালও সেখানে প্রশিক্ষণরত ছিলেন তখন। ২৮ দিনের ট্রেনিং সম্পন্ন করে তিনি বাংলাদেশে ফিরে এসে অবস্থান নেন রাঙামাটি জেলার রাঙাপাহাড় এলাকায়। তিনি ছিলেন ১নং সেক্টরের অধীনে। দেশে ফিরে কংক্য মগ রাঙাপাহাড়, মাইনীমুখ, দুধছড়ি, আমতলী ইত্যাদি স্থানে মোট ৪টি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই অপারেশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল দুধছড়ির অপারেশন। তবে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজো বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জয়ী হতে পেরেছিল তার দল।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্থানীয় রাজাকারদের ইন্ধনে পাকিস্তানিরা কংক্য মগের বাবা এবং কাকাকে গুইমারা হাসপাতালে স্থাপিত ক্যাম্পের রেলিং-এর সাথে ঝুলিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে। এই ঘটনা প্রবল ক্ষোভের জন্ম দেয় তাকে। প্রতিজ্ঞ হয়– হয় বাঁচব নয়ত মরব। এই স্লোগান ভেতরে ধারণ করে বিপুল বিক্রমে কংক্য মগ চালিয়ে যান শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কেবল স্বাধীনতা পেলেই সম্ভব দেশ ও দেশের মানুষকে সব ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত করা। তিনি ভেবেছিলেন। এ যুদ্ধ সহজে শেষ হবার নয় কিন্তু চলে আসে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ, ঘোষিত হয় এদেশবাসীর বিজয়। বিজয়ের সেই মধুক্ষণে তিনি ছিলেন আমতলী অঞ্চলে। আজও তাঁর সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে সেই ক্ষণটি যখন স্মৃতিতে ভেসে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে এলে কংক্য মগ আমতলীতে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন বুলদেব সেনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। কিন্তু অচিরেই অনুভব করেন, দেশ যেন এখনো স্বাধীনতা পায়নি। স্বাধীনতা আসেনি দেশের সব শ্রেণীর মানুষের। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা যে লক্ষ্যে যুদ্ধ করেছেন, তা পূর্ণতা পায়নি। যে শোষণ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন সেই মুক্তি, সেই স্বাধীনতা আজও সুদূর পরাহত। যে নীতিহীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছিলেন তারা, আজ সেই নীতিহীন দুর্নীতি দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দেশ তার কর্তব্য হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে তেমন কিছুই করেনি। ভাতা ও চাকরির সেটুকু সুবিধা তারও সঠিক বাস্তবায়ন নেই। এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আজ দেশ যেন সম্মান করতেও কুণ্ঠিত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এঁদেরকে ডেকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কেবল বসিয়ে রাখে খালি মুখে। এই হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বরাদ্দকৃত সম্মান।

মংশোয়ে অং মগ

মুক্তিযোদ্ধা মংশোয়ে অং মগ আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর সন্তান। পিতা মৃত সুইহাঅং মগ। স্থায়ী নিবাস খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় থানার

জগন্নাথপাড়া গ্রামে। বর্তমান ঠিকানা খাগড়াছড়ি সদরের কালাঢেবা গোলাবাড়ি গ্রামে। কিন্তু মংশোয়ে অং মগ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালে রাঙামাটি পার্বত্য জেলায়। শৈশব সেখানেই কাটে। এসএসসি পর্যন্ত রামগড় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে মংশোয়ে অং মগ। আব্দুল বারি স্যারের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি প্রভাবিত হয়ে ছিল যা তাকে সারাজীবন আলোর পথে পরিচালিত হওয়ার সংকল্প জুগিয়েছে।

মহাকালের সেই '৭১-এ মংশোয়ে অং মগ ৩২ বছর বয়সের সুপুরুষ, চাকরি করতেন কৃষি বিভাগে। যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকে তিনি সপরিবারে অবস্থান করছিলেন খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে। সেখানে অবস্থানকালে পাকিস্তানি হানাদাররা কয়েক দফা আক্রমণ করলে স্থানীয় সবার সাথে তিনি ভারতে চলে যান। সেখানকার শরণার্থী শিবিরে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে শান্তি মিলছিল না তার অন্তরে। ভাবলেন– একজন শিক্ষিত মানুষ, বাংলাদেশে যার নাড়ি পোঁতা, আজ সেই দেশের দুর্দশায় বসে-খেয়ে-ঘুমিয়ে কাটানোটা অপরাধ। একজন প্রকৃত মানুষ এই অপরাধ করতে পারে না। মানুষ হিসাবে প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজের জন্মস্থান জন্মভূমি, নিজ মায়ের মতো, তাকে শোষকদের হাত থেকে মুক্ত করা, প্রয়োজনে জীবন দান করা। এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মংশোয়ে অং মগ ভারতের হরিণা ক্যাম্পে দীর্ঘ ৪ মাসের উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণ করেন। কেননা, তিনি ভেবেছিলেন এই যুদ্ধ হবে দীর্ঘমেয়াদি। তাই প্রস্তুতিটা জোরালো হওয়া বাঞ্ছনীয়। হরিণা ক্যাম্পের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ভারতীয় শিখরা।

ট্রেনিং শেষে সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলামের ১নং সেক্টরের অধীনে নভেম্বর মাসে মংশোয়ে অং মগ কাউয়ামারা হয়ে পানছড়িতে এসে অবস্থান নেন। তার দলের কমান্ডার ছিলেন বাবুল চৌধুরী। বাবুল চৌধুরীর অধীনে দুইটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন মংশোয়ে অং মগ। অপারেশন দুটি ছিল পানছড়ি– কুকিছড়ি অপারেশন এবং তবলছড়ি অপারেশন। তবে অপারেশন দুটির মধ্যে পানছড়ি– কুকিছড়ির অপারেশনটা ছিল খুবই ভয়াবহ। তাদের ছিল ৭০০ ফৌজ, যেখানে ছাত্র-যুবক, ইপিআর, পুলিশ সবাই ছিল। দলের রেকারকে পাঠানো হয়েছিল পাকিস্তানিদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নিতে। রেকার ফিরে এসে অল ক্লিয়ার ঘোষণা করলে সবাই যে যার মতো রিলাক্সে থাকেন। কিন্তু এরই মধ্যে আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনী ও মিজো বাহিনীর যৌথ দল। তাদের সেই অতর্কিত আক্রমণে অনেক সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এরপর ডিসেম্বর মাসে মিত্রবাহিনীর প্রবল প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যুদ্ধের গতি খুব দ্রুত ত্বরান্বিত হতে থাকে। ধরা দেয় আকাঙ্ক্ষিত বিজয়। আনন্দে ছিলেন সেদিন মংশোয়ে অং মগ। তাঁর মতে, বিজয় সেটা যে কি বস্তু তা কেবল তখন যারা যুদ্ধের ময়দানে ছিল তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। উন্মাদ হয়েছিলাম

আনন্দে সেদিন। এরপর যুদ্ধ শেষে তিনি চিটাগাং-এ এক ভারতীয় মেজরের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন।

স্বাধীনতা উত্তর সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হতাশ করেছে মুক্তিযোদ্ধা মংশোয়ে অং মগকে। আজও সেই হতাশা ধারাবাহিকভাবে বয়ে চলে তার হৃদয়ে, চেতনায়। সরকার আসে, সরকার যায়। বেড়ে চলে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা। যারা কেড়ে নেয় প্রকৃত অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বরাদ্দকৃত সুযোগ-সুবিধা। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আজ সর্বত্র বঞ্চিত। কারণ, তাঁরা মিথ্যা বলে সুবিধা আদায় করতে জানে না, অস্ত্র তাদেরকে সেই মিথ্য বলার শিক্ষা দেয়নি। আজ তাই এই মিথ্যার যুগে তারা সহায় সম্পত্তি-ওয়ালা স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির কাছে অসহায়। ৩৬ বছরের স্বাধীনতা শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ভিক্ষার ঝুলি। অথচ এমন একজন রাজাকারও পাওয়া যাবেনা যাদের অবস্থা অস্বচ্ছল।"

মংচিনু মারমা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী মারমা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মংচিনু মারমা। জন্ম ১৮ জানুয়ারি ১৯২৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলার উজানীপাড়া গ্রামে। মৃত্যু ২০০৬ সালের ২৬ অক্টোবর, এই উজানীপাড়াতেই। মংচিনু বান্দরবান কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারে বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করে ১৯৪৮ সালের ২১ মে ইপিআর-এ ভর্তি হন। অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৮ সালের ২০ মে, ৪০ বছর থেকে ১ দিন বাকি থাকতে। দীর্ঘ চাকরি জীবনে মংচিনু মারমা বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে সাধারণ সৈনিক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সুবেদার মেজরে। তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়াউর রহমানের জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি রাজশাহী শহর ছাড়াও দিনাজপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং হিলি সীমান্তে। অনেক পুরনো সামরিক সদস্য হওয়ায় পাকিস্তানিদের কাছে কদর ছিল তার। কিন্তু পাকিস্তানিদের অন্যায়-অবিচারের কারণে জড়ান নি কোনো প্রলোভনে। নিজের মেধা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগ করে পরিচালনা করেছেন একের পর এক অপারেশন, এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে অবদান রেখেছেন।

মনীন্দ্র চাক্‌মা

আদিবাসী চাক্‌মা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মনীন্দ্র চাক্‌মা। পিতা ধর্মরাজ চাক্‌মা। ১৯৫৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী থানার পোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ঠিকানা রাঙামাটি সদরের দক্ষিণ কালিন্দীপুর গ্রামে। মনীন্দ্র চাক্‌মা পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম

শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ভর্তি হন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এবং ঠিকাদারি পেশায় নিয়োজিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশে রামগড় সীমান্ত হয়ে ভারতের ত্রিপুরায় পৌছেন। হরিণা ক্যাম্পে দেড় মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফিরে আসেন বাংলাদেশে। তিনি ১ নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার খোদা বক্স এবং নূরুল আমিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ৪টি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে কাউখালী থানার রাংগীপাড়া অপারেশনটি ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সেই অপারেশনে তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

কংচাই মগ

মারমা সম্প্রদায়ের একজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা কংচাই মগ। পিতা মৃত মথু মগ। ১৯৪৯ সালে তিনি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কোতোয়ালী থানার পানখাইয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এটাই তার স্থায়ী নিবাস। তিনি খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেন। '৭১-র ২৫ মার্চ ভারতের সীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে গেলে তিনি সপরিবারে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অচিরেই যখন শুনতে পান যে, পাকিস্তানিরা ইপিআর আর ছাত্রদের ধরে ধরে মারছে তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের আরও ২০-২১ জন যুবককে নিয়ে মং রাজার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭১-এ মং রাজার প্রবল সহযোগিতাপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। রাজা সেদিন ছাত্র-যুবকদের সেই দলকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কংচাই এবং তার সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে জুলাই মাসের শেষের দিকে তবলছড়ি ছিলাছড়ি হয়ে ভারতের সাব্রুমে পৌছেন। হরিণা এবং সোনাইপুর ক্যাম্পে দেড় মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসেন বাংলাদেশে।

১ নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার নিত্তল্লার নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন কংচাই মগ। সৌভাগ্যজনকভাবে, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার কিছু দিন পরে স্বাধীন হয়ে যায় বাংলাদেশ। বিজয়ের সেই ১৬ ডিসেম্বরে তিনি রাঙামাটি জেলার আমতলী সদলে অবস্থান করছিলেন। রাঙামাটির তিনটিলায়ে অস্ত্র সমর্পণ করেন কংচাই মগ।

যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে যে বৈষম্যের শিকার হয়েছিল এদেশের মানুষ, কংচাই যুদ্ধ উত্তর সময়ে ভেবেছেন তা নির্মূল হবে। কিন্তু হয়নি, এদেশে এখন ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান পাকিস্তান আমলের চেয়ে বরং বেশি। সবচেয়ে বড়ো কথা– যে দেশ তার স্রষ্টাদের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দেয় না, সে দেশে সব ধরনের নীতিহীনতাই সম্ভব। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা অসহায়, মানবেতর অবস্থায় দিন কাটিয়ে মারা যাচ্ছেন, মরার পর তাকে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

অথচ বেঁচে থাকতে সে পায় কেবল অমর্যাদা। অন্যদিকে, সব ধরনের সুবিধা পাচ্ছে সবলরা, যাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা বিরোধী ছিল। মুক্তিযোদ্ধা কংচাই মগ আরও বলেছেন, এত ভয়াবহ যুদ্ধের পর পাওয়া স্বাধীনতা মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের। কিছু বিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় ঘটনার কারণে একটি সময় সাধারণ বাঙালি ও সরকার ধারণা করত পাহাড়ি মানেই দুর্ধর্ষ শান্তি বাহিনী। তারা মগ, সাঁওতাল, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেখত না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আবার পাহাড়িরাও বাঙালিমাত্রই সন্দেহ করত। সেই সময়ে সরকার যখন খোঁজ নিতে শুরু করল কারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং কারা বিপক্ষে, তখন অনেক পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধারা ভয়ে তাদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল ডক্যুমেন্ট পুড়িয়ে ফেলে। কারণ, শান্তিবাহিনীর লোকজন বলত– তোমরা যদি আমাদের সাথে না আস, তাহলে তোমরা সরকারি পক্ষের অর্থাৎ আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা তোমাদের দেখে নেব।"

এভাবে শান্তিবাহিনীর পক্ষে গেলে তা হয়ে যায় সরকার বিরোধী কাজ। আবার সরকারের পক্ষে গেলে শান্তি বাহিনীর রোষানলে পড়তে হয়। উভয় পক্ষ উভয় দিক দিয়ে ভীতির সঞ্চার করায় সে সময় অনেক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের সকল ডক্যুমেন্ট ধ্বংস করে দিয়ে আত্মগোপন করে। পরবর্তীতে যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে এবং সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়, তখন তাদের অনেকেই উপযুক্ত ডক্যুমেন্টের অভাবে বঞ্চিত হন।

আমরা ভেবেছিলাম, স্বাধীনতা মানে শান্তি, কিন্তু শান্তি তো আজো এলো না!

আ ক্য মং

আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের এক দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা আ ক্য মং। পিতা লুমং। ১৯৫২ সালে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপের গোরকঘাটা বড় রাখাইনপাড়ায় তার জন্ম। এই দ্বীপভূমিতেই কেটেছে শৈশব-কৈশোর-যৌবন। স্থানীয় ঠাকুরতলা বৌদ্ধ বিহারে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে পারিবারিক দরিদ্রতার কারণে মজুরের কাজ নিতে হয়। আজ জীবনের এই পড়ন্ত আলোতেও তিনি একজন দিনমজুর।

রক্তঝরা ১৯৭১-এ আ ক্য মং একজন তরুণ শ্রমিক। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন। সেই সময় রাখাইন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষরা নিজেদেরকে চায়না বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিলে পাকিস্তানিরা কিছু বলত না। কিন্তু আ ক্য মং-এর বড়ো ভাই, বাবা এবং চাচাকে যখন কিসে ভোট দিয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছে বলে জানান। এই অপরাধেই পাকিস্তানিরা ৩ জনকেই নির্মমভাবে খুন করে। অন্যদিকে, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দিরে ধ্বংস ও

হত্যাযজ্ঞও চালায় পাকিস্তানিরা। স্বজন হারানোর বেদনা এবং ধর্মীয় আঘাত এই উভয়বিধ কারণে ক্ষুব্ধ আ ক্য মং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার। তার সাথে রাখাইন সম্প্রদায়ের আরও ৫-৬ জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন সেদিন। এলক্ষ্যে তারা আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে ট্রেনিং গ্রহণের উদ্দেশে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রাঙামাটি গিয়ে জানতে পারেন, বাংলাদেশেই প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব। তাই আ ক্য মং তার দল নিয়ে নতুন মুরং পাড়ায় সোবাহান সাহেবের অধীনে ২ মাসে থ্রিনটথ্রি, এলএমজি ট্রেনিং শেষে ১ নং সেক্টরের অধীনে দলীয় কমান্ডার এস.এম বড়ুয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। অপারেশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল ডুলাহাজরার অপারেশনটি। এই অপারেশনে আ ক্য মং-এর দলের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। শত্রুর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তার দল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকৌশল ও আত্মোৎসর্গের মনোভাবে শেষ পর্যন্ত সফল হতে পেরেছিলেন তাঁরা। নিজের দলের কয়েকজন সহযোদ্ধার আহত হওয়ার বিনিময়ে আ ক্য মংয়ের দল ৫ জন পাকিস্তানিকে বধ করতে পেরেছিল এবং ওদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

আসে বিজয়ের ১৬ ডিসেম্বর। সেদিন সেই বিজয়ের বিস্ময়কর সময়ে আ ক্য মং কক্সবাজারে অবস্থানরত। বাবা, চাচা, ভাইয়ের হত্যার বদলার যথার্থ সফলতার উপলব্ধিতে আত্মহারা ছিলেন সে সময়। এরপর কক্সবাজারেই অস্ত্র সমর্পণ করেন তিনি। ফিরে যান তার পুরনো মজদুরি পেশায়। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশে কোনো প্রশাসনই দীর্ঘদিন তাকে ডাকে নি। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো তিনি দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মানী ভাতা পান। কিন্তু ২০০১ সালের পর রাজনৈতিক পট - পরিবর্তনে তার ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। আজও তিনি তা থেকে বঞ্চিত।

ব্যক্তিগত কোনো লাভালাভ নয়, দেশের মঙ্গলের জন্যে, দেশের সকল মানুষের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রাণবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন আ ক্য মং। স্বপ্ন ছিল, যে দেশের ভূমিতে তাঁর পূর্বপুরুষের নাড়ি পোঁতা, সেই দেশ স্বাধীন হলে দেশের সকল মানুষের মতো ভূমিতে তারা অধিকার পাবেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়া হয় তাঁদের ভূমি, ঘরবাড়ি সবকিছু। যে দেশের জন্যে প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন অস্ত্রের মাথায়, সেই দেশ তাকে মুক্তিযোদ্ধার সম্মানও দেয় না।

মং শৈফ্রু চৌধুরী

মারমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মং শৈফ্রু চৌধুরী। পিতা গেং হেডম্যান। ১৯৫২ সালের ১২ আগস্ট বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি

উপজেলায় গেং হেডম্যান পাড়ায় তার জন্ম। এটাই তার স্থায়ী নিবাস। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তিনি ভর্তি হন কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৭২ সালে তিনি এখান থেকে এসএসসি পাশ করেন। রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে প্রভাবিত হয়েছিলেন শিক্ষক অং হ্লা প্রু-র দ্বারা। অং হ্লা প্রু-র সততা ও সরলতার মাঝে আকরাম স্যারের নির্মল ব্যক্তিত্ব সংক্রমিত হয় সেই বালক বয়সেই। এরপর কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন পণ্ডিত স্যারের পাণ্ডিত্যে।

ছাত্রাবস্থায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র মং শৈফ্রু ভাবতেন, এদেশের ছাত্রদের ভবিষ্যত ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। সেই সময় থেকেই দেশের পরাধীনতা পীড়া দিত তাঁকে। দেখতেন, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ১২৪ জন সচিব, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১২ জন। একটি সাধারণ মানের চাকরি পাওয়াও তখন এদেশবাসীর জন্যে সুদূরের স্বপ্ন। অথচ সংখ্যায় এদেশীরা বেশি। পরাধীনতা এর চেয়ে ভালো ফল দেবে না। অন্যদিকে, দেশ স্বাধীনতা পেলে নিজের জনগণকে নিজের উন্নয়নের প্রয়োজনে সব ধরনের সুবিধা দিয়ে তৈরি করে নেবে এবং সব ধরনের বৈষম্যের বিলোপ হবে। স্বাধীনতার এই স্বপ্ন হৃদয়ের মাঝে ধারণ করে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন ১৯৬৬ সাল থেকেই। এই সময়ের ছয় দফা আন্দোলন থেকেই স্বাধীনতার সিঁড়িতে পা রাখা। এরপর আসে ১৯৭১। জীবন বাজি রাখলেন মং শৈফ্রু চৌধুরী অস্ত্রের মুখে।

১৯৭১-র উত্তাল সেই সময়ে তিনি ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা ছিলেন এলাকার হেডম্যান। তাই রাজাকার সংগঠনের উচ্চ পর্যায় থেকে চাপ ও প্রলোভন আসে তার ও তার হেডম্যান বাবার ওপর। তিনি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ হিসেবে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান এপ্রিল মাসের শেষের দিকে। যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের সাথে। সেই দলের সংগঠক ছিলেন তৎকালীন কক্সবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক। এর কিছুদিন পর কক্সবাজারের এক সার্কেল অফিসারের বাসা থেকে (তিনি ছিলেন মং শৈফ্রু চৌধুরীর বন্ধু লিয়াকতের বাবা ; '৭১-র অক্টোবর মাসে ওদেরকেও সপরিবারে খুন করা হয়) বের হয়ে কিছুদূর এগুলেই পথ আগলে ধরে ২ যুবক, স্থানীয় রাজাকার। সেটা ছিল চাঁদনী রাত, রাত ৯টা তখন। যুবক দুইজন মং শৈফ্রু চৌধুরী-র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে আপত্তিকর কথা বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। একসময় ওরা গায়ে হাত তুললে তিনি ২জনকে ধাক্কা মেরে ফেলে চলে আসতে থাকলে পেছন থেকে বন্দুক তাঁক করে ধরে আরও ৪ রাজাকার যুবক। এরপর ৬ জনে একত্রে ধরে পার্শ্ববর্তী ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে মারতে থাকে, যতক্ষণ না তিনি অবচেতন ও মুমূর্ষু হয়ে যান। মুমূর্ষু মং শৈফ্রু চৌধুরীকে এরপর নিকটবর্তী ব্রিজের পাশে ফেলে রেখে চলে যায় তারা। জ্ঞান ফেরার পর সামান্য সুস্থ হয়ে তিনি চলে

যান সোনাইছড়িতে। সোনাইছড়িতে তখন বার্মা থেকে আগত এক কম্যুনিস্ট নেতার জুমখোলা ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে ৭ দিন অবস্থান করে একটু সুস্থ হয়েই তিনি চলে যান রামু-তে। রামুর মাটুরাটায় একটি অপারেশনে তাদের কাছে মাত্র ৪টি থ্রিনটথ্রি রাইফেল ছিল। আর শত্রুর কাছে ছিল এলএমজি ও এসএমজি। সংখ্যায় ছিলেন মাত্র ৬ জন। কিন্তু নিজেদের যুদ্ধ কৌশলের কারণে শেষ পর্যন্ত তারা সেই অপারেশনে সফল হন। রামু থেকে কক্সবাজার গিয়ে সেখান থেকে ১২ জনের একটি দলের সাথে চলে যান আমিরাবাদ পশ্চিম মগদিঘীরপাড়-র সিন্দু এলাকায়। সেখানে কমান্ডার ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার নূর মোহাম্মদ। তার নেতৃত্বে মং শৈফ্রু চৌধুরী কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। আরেকজন কমান্ডার শংকর বড়ুয়ার নেতৃত্বেও অপারেশনে অংশ নেন তিনি।

এরপর ডিসেম্বর মাসের দিকে চলে আসেন নিজ এলাকা নাইক্ষ্যংছড়িতে। নাইক্ষ্যংছড়ি থানা তখন স্থানীয় রাজাকাররা দখল করে রাজাকার ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করত। ওদের কমান্ডার ছিল আবদুল জলিল। মং শৈফ্রু চৌধুরী তার দল নিয়ে ঐ থানা আক্রমণ করলে রাজাকাররা তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখেই পালিয়ে যায়। এরপর আসে ১৬ ডিসেম্বর। তখন তিনি নাইক্ষ্যংছড়ির নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বিজয় উল্লাসের আনন্দে তিনি মাতালের মতো আচরণ করেছিলেন সেদিন। যুদ্ধ শেষে মং শৈফ্রু চৌধুরী ১৯৭২-র ১৪ জানুয়ারি নিজে উদ্ধারকৃত সকল অস্ত্রশস্ত্র রামু থানায় সমর্পণ করেন।

১৯৭১-র ভয়াল সেই যুদ্ধের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে মং শৈফ্রু চৌধুরী বলেন, "আমরা মরণ ভুলে গিয়েছিলাম। আর কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে ভয় পেতাম না। তার ওপর মং রাজার সহযোগিতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার। কিন্তু দেশের তখনকার অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা তাকে হতাশ করে। হতাশ করে স্বাধীনতার জন্মদাতা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দেশের সরকারগুলোর অবহেলা। ১৯৯৭ সালে মং শৈফ্রু প্রথম বারের মতো কোনো প্রশাসনিক আয়োজনে সংবর্ধনা পান। এই সংবর্ধনা দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই পাওয়াই নতুন করে প্রেরণা যোগায় মং শৈফ্রুকে। হতাশার জীবন থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন আলো ও আশার জীবনে। তবুও কখনো কখনো ভেবে কষ্ট পান– এত ত্যাগের স্বাধীনতার নব্য পরাধীনতার কথা। দেশ রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সবক্ষেত্রেই পরাধীন। এখনও নীরবে, নিভৃতে, এক বুক অভিমান নিয়ে মারা যান অসংখ্য অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধা, যাঁদের রক্তের কালি দিয়ে লেখা এ দেশের স্বাধীনতা। আরও ব্যথিত হন দেশের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা দেখে।

ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী মং শৈফ্রু এখনও শিক্ষানুরাগী। এলাকার মানুষদের শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন বিশাল লাইব্রেরি। 'নাইক্ষ্যংছড়ি হেডম্যান পাড়া লাইব্রেরি' নামে পরিচিত সেই গ্রন্থশালায় ১ লাখ ৪০ হাজার বই আছে। এছাড়াও তিনি নিজ এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক মামলা-মোকদ্দমা ও জমি-জটিলতা সংক্রান্ত বিষয়, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রেখেছেন।

বিশ্বনাথ হেম্ব্রম

সুঠাম দেহের অধিকারী বিশ্বনাথ হেম্ব্রম ১৯৭১ সালে রাজশাহীর গোদাগাড়ির বিল্লি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

"২৬ মার্চ যুদ্ধ শুরু হলে পাকসেনা ও তাদের সহযোগিরা ললিত নগর সাঁওতাল পল্লীটি পুড়িয়ে দেয়। তখন যোগুনা এলাকার প্রভাবশালী বাঙালি ও আওয়ামী লীগ নেতা তাছির মিয়া বলেন- (তার সাহসে আমরা তখনও ভারত যাইনি) "তোমাদের বোধহয় আর দেশে থাকা ঠিক হবে না। তোমরা ভারতে চলে যাও।" তারপর আমরা ভারত চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে ছিল জীবনের এক চরম অভিজ্ঞতা। আমাদের গ্রামের সব লোকসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের লোক একসাথে একদিন ভোররাতে ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। এটা ছিল এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। প্রায় দশ হাজার লোক একসাথে হাঁটছি। মাথায়, কাঁধে বোঝা। যে যতটুকু সম্ভব সাথে করে নিয়ে চলেছে। আবার কোনোদিন মাতৃভূমিতে ফিরতে পারব কি না ! সকলের মধ্যে এ আশংকা কাজ করছে।

চলার পথে অধিকাংশ মুসলিম গ্রাম আমাদের অসহযোগিতা করেছে। তারা আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে দেয়নি। কোথাও কোথাও মুসলমানরা আমাদের আক্রমণ করারও চেষ্টা করেছে। আমরাও সেক্ষেত্রে সাথে থাকা তীর-ধনুক নিয়ে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। আক্রমণ প্রতিহত করে পথ চলেছি। নিয়ামতপুর (বর্তমান নওগাঁ জেলা) গিয়ে আটকা পড়ে গেলাম। শুনলাম আর্মিরা আসছে। সব লোকজন ছোটাছুটি শুরু করল। আমরা কেউ কেউ তীর-ধনুক নিয়ে রুখে দাঁড়াবার সংকল্প করলাম। এখান থেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আসলে আর্মি আসেনি। ঐ এলাকার লোকেরা আর্মির ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে তাদের এলাকা থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। তাদেরও ভয় ছিল। আমরা এত মানুষ তাদের এলাকায় চলাফেরা করলে তাদের নানা রকম সমস্যা হতে পারে। বিশেষত পাক আর্মি জানলে ঐ এলাকায় আক্রমণ হতে পারে। এরপর উকুনপুর বর্ডার দিয়ে ভারতের মাটিতে পা রেখে নিরাপদ অনুভব করলাম। চলতি পথে রাস্তায় যে

আতংক আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে পথচলা মানুষের আচরণ। কত ঘটনা ! রাস্তায় একটা মেয়ে সন্তান প্রসব করল। ঐ অবস্থায় তাকে নিয়ে পথ চলতে হল।

ভারতে গিয়ে উঠলাম কেস্ট পুকুরে। ওখানে দুদিন থাকলাম। নিজেদের কাছে খাবার-দাবার যা ছিল তাই সকলে মিলে ভাগ করে খাই। ওখানকার লোকেরা আমাদের বলল– তোমরা গাজল থানায় চলে যাও। ওখানে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। থাকা-খাওয়ার কোনো সমস্যা হবে না। সকলে ছুটলাম গাজল থানার উদ্দেশে। ওখানে গেলে আমাদের বলা হল– এখানে থাকা যাবে না, তোমাদের মালদার দিকে যেতে হবে। গরম খিঁচুড়ি খেয়ে রোজ বাতাসে হাঁটা যে কী কষ্ট। শুরু হল ডায়রিয়া। প্রায় সকলে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হল। মালদা থানায় গিয়ে শিবিরে আশ্রয় পেলাম। চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। কিন্তু ততক্ষণে শিশুসহ চার-পাঁচজন লোক মারা গেছে। কতুব শহর ছিল আমাদের শিবির। অনেক ছোটাছুটি করলাম চিকিৎসার জন্য। দুর্যোগ একসময় কাটল। কিন্তু শরণার্থী শিবিরের জীবন কার ভালো লাগে ! রেশন তোলা আর খাওয়া। মাতৃভূমির জন্য মন কাঁদে।

এরপর আমাদের শিবিরে একদিন সাগরাম মাঝি এলেন। তিনি আমাদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। তার সেদিনের ভাষণ মনে হল শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ। ভাষণে আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম। তখনি সিদ্ধান্ত নিলাম, মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করব, মুক্তিযুদ্ধে যাব। শরণার্থী শিবিরের ৭/৮ জন ছেলে আমরা ঐ দিনই সাগরাম মাঝির সাথে চলে গেলাম। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন গৌড় বাগান। ওখানে কয়েকদিন পিটি-প্যারেড করালেন। এরপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতে আমাদের ট্রেনিং কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন পানোয়ার। রাইফেল, এসএলআর, স্টেনগান, ২" মর্টার, ৩" মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং নিলাম। দুইমাস ধরে ট্রেনিং হল। ট্রেনিং শেষে আমরা ক্যাপ্টেন গিয়াস-এর নেতৃত্বে লালগোলায় এসে ক্যাম্প স্থাপন করলাম। শুরু হল প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ। এসময় আমরা প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করি।

প্রথম আক্রমণ করি দুই আড়ির ব্রিজ। এটি ছিল একটি সফল আক্রমণ। শত্রুপক্ষের চলাচলের ক্ষেত্রে ব্রিজটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ব্রিজটি উড়িয়ে দেই। এরপর আমরা আর একটি সফল আক্রমণ করি মোনেপুর ইউনিয়নের সাত্তকা গ্রামে, এখানে ছিল রাজাকারদের একটি ক্যাম্প। তাদের ক্যাম্প ঘেরাও করে আক্রমণ করলে কিছু রাজাকার মারা যায়। বাকিদের আমরা গ্রেফতার করি। এতে শত্রুর কিছু গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে আসে। এরপর আমরা বাগধানী ব্রিজ আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু জনৈক তথ্যদাতা আমাদের সাথে বেঈমানী করল। রাজাকার এবং পাক আর্মি আক্রমণের খবর আগেই পেয়ে যায়। আমরা দশজনের একটি দল আক্রমণে যাই। পাঁচজন পাহারায় থাকি আর

পাঁচ জন ব্রিজের কাছাকাছি যায় এক্সপ্লোসিভ বোমা সেট করার জন্য। ততক্ষণে পাক আর্মি এবং রাজাকার আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। পাক আর্মির ব্যারিকেড ভেঙে পাঁচজন বেরিয়ে আসতে পারলেও বাকি পাঁচজন ধরা পড়ে যায়। তাদের ওপর চলে অমানবিক নির্যাতন। তাদের তানোর থানায় বন্দি করে রাখা হয়। পরে আমরা তানোর থানা আক্রমণ করে নারায়নপুরের সুশীলকে উদ্ধার করি। কিন্তু ততদিনে তাকে অত্যাচার করে পঙ্গু করে দিয়েছে। পঙ্গু সুশীল আজও বেঁচে আছেন। এরমধ্যে আরো বেশকিছু ছোটোখাটো অপারেশনে অংশ নিই আমি।

এরপর রাজশাহীর রাজা ভাই-এর নেতৃত্বে রাজশাহী যাই। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় হল। পাক আর্মি আত্মসমর্পণ করল। সেদিনের আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। অনেকে আনন্দে হাউ–মাউ করে কেঁদেছে। সফল ফায়ার করে আমরা উৎসব করেছি। ১৭ ডিসেম্বর শোনা গেল, পলিটেকনিক্যাল কলেজে পাক আর্মির একটি ঘাঁটি রয়েছে। আমরা সেখানে মর্টার আক্রমণ করলাম। পাক আমিরা নাটোরের দিকে পালিয়ে গেল। পরে তারা নাটোরে আত্মসমর্পণ করে। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে উঠলাম। ওখানেই অস্ত্র জমা দিলাম। আমাদেরকে সার্টিফিকেট দেয়া হল। দেড়মাস জোহা হলে থাকার পর বাড়িতে ফিরে এলাম। এরপর ভারতে গিয়ে পরিবারের লোকদের নিয়ে এলাম। বাড়িঘর মাটির সাথে মিলে গিয়েছিল। নতুন করে ঘর তুললাম অনেক কষ্ট করে। তবুও নিজের বাড়ি বলে কষ্ট হলেও তা গায়ে লাগেনি। যুদ্ধ করেছিলাম মাতৃভূমির জন্য। জন্মভূমিকে স্বাধীন করতে হবে। আমার জন্মভূমিতে আমাকে বসবাস করতে হবে। এটা ছিল যুদ্ধে যাবার মূল কথা। আমার সম্পত্তি ভূতে খাবে তা হবে না। আত্মবিশ্বাস ছিল দেশ স্বাধীন হবে। ভারত ও রাশিয়া আমাদের পাশে ছিল। ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ না করলেও দেশ স্বাধীন হত। তবে তাতে সময় বেশি লাগত।

বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা ভালো নেই। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা একটা শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। দেশ গঠনের কাজে ভূমিকা রাখতে পারেনি। তৎকালীন সরকারও সে সময় সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে নজর দেয়নি। বর্তমানে সমাজে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কিছু সম্মান আছে। দীর্ঘদিন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে কোনো সম্মান-মর্যাদা ছিল না। ভাতা চালু হবার পর এবং মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেবার কারণে আমাদের সামাজিক মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে। এখন আমরা সমাজে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে পারি।

হোসেন ওঁরাও

হোসেন ওঁরাও আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। রাজশাহীর গোদাগাড়ির দরিদ্র কৃষি শ্রমিক হোসেন ওঁরাও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে একটু পিছন থেকে শুরু করলেন।

দেশে যুদ্ধ শুরু হলেও আমি তখন বাড়িতে কৃষিকাজ করি। ১৯৬৪ সালের দারুশা রায়টের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। পরিস্থিতিটা আমাদের জন্য প্রায় একই রকম। আশপাশের বাঙালি মুসলমানরা নানা রকম ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। পাকিস্তানিরা হিন্দুদেরও আগে আদিবাসীদের মারবে। তোমরা প্রাণ নিয়ে ভারত চলে যাও। এছাড়া আদিবাসী ও হিন্দু গ্রামগুলোতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাও ঘটছে। দারুশা রায়ট যখন হয় তখন আমি লাঙল চালাই। বয়স ১৫/১৬ বছর। আমাদের ইচরিপুর গ্রামে পাশের গ্রাম জয়পুরের মুসলমানরা এসে সব লুটপাট করে নিয়ে গেল। ধান, পাট, গরু, ছাগল সব। আমরা ভারতে চলে গেলাম। পরে আবার ফিরে এলাম। কিন্তু অনেকেই তখন ভারতে থেকে গেল। রায়ট দারুশা থেকে শুরু হল। একে একে মুসলমানদের দ্বারা আমাদের গ্রামগুলো আক্রান্ত হতে লাগল। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ ঢাকা থেকে শুরু হল। ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভারত চলে গেলাম। সামান্য কিছু ব্যবহার্য জিনিস সাথে নিয়ে পদ্মা পার হয়ে ভগবান গোলায় গিয়ে উঠলাম। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় হল। এখানকার লেখাপড়া জানা লোকেরা সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করল। রেশন কার্ড পেলাম। অনিশ্চিত জীবন। এরমধ্যে একদিন সাগরাম মাঝি ও তার ছেলে ভোলা আমাদের ক্যাম্পে এলেন। তারা বললেন, যুদ্ধে যেতে হবে। দেশ মুক্ত করতে হবে। মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে হবে। আমরা বললাম, চল যাই যুদ্ধ করতে। বাংলাদেশ স্বাধীন করতে। তাঁদের সাথে গেলাম ট্রেনিং-এ। ওখানে ১৫ দিন পিটি ট্রেনিং হল। ওখান থেকে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়ে গেল শিলিগুড়ির পানি-নিয়া। এসএলআর, এলএমজি স্টেনগান ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হল। আনুমানিক ২০ দিন ট্রেনিং চলল। ট্রেনিংয়ের পর মনে হল, যুদ্ধ করার জন্য তীর-ধনুকের চাইতে আধুনিক অস্ত্রই ভালো। আমার নামে একটি এসএলআর ইস্যু হল।

ওখান থেকে আমরা এলাম বাংলাদেশের পোড়াগ্রাম। ওখানে প্রথম যুদ্ধে ২/৩ শত মুক্তিযোদ্ধা মিলে আক্রমণ করলাম পাক সেনাদের ক্যাম্প। আক্রমণ ব্যর্থ হল। আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম। ফিরে গিয়ে দেখলাম, চারজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে দেখলাম কামান্ডারসহ অন্য কারো আগ্রহ নাই। তাদের সাথে আমাদের ঝগড়া হয়। আমরা ২০ জন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। তুমুল ঝগড়া করে ঐদিনই আমরা ভারতের লালগোলা চলে গেলাম।

ওখান থেকে আমাদের অন্য কোম্পানিতে যুক্ত করা হল। এরপর লালগোলা থেকে ঘরচাপা বর্ডার পার হয়ে আমরা তানোর-মোহনপুর এলাকা হিট করলাম। ঐ এলাকার লোকরা আমাদের ব্যাপক সহযোগিতা করেছে। আমরা রাতে অপারেশনে যেতাম। ভোর রাতে গ্রামের কোনো বাড়িতে গিয়ে উঠতাম। তারা আমাদের ঘরের ভেতরে থাকার ও গোসল করার ব্যবস্থা করে দিত। খাবার-দাবারের ব্যাপারেও যত্নবান ছিল। এ সময় আমরা দৈনিক অপারেশনে যেতাম, বিশেষত রাজাকার-বিরোধী অপারেশন। স্বাধীনতার ২ দিন আগে আমরা তানোর থানা আক্রমণ করলাম। কয়েক কোম্পানি মিলে ৪/৫ শত মুক্তিযোদ্ধা থানা দখল করলাম। দুজন পাক আর্মি জীবিত অবস্থায় ধরা পড়ে। তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধে একজন আদিবাসী গুলিতে আহত হয়। পরবর্তীতে সে ভারত চলে যায়।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দিন তানোরে ছিলাম। খবর জানার পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। এসএলআর এর সব গুলি খরচ করি আকাশের দিকে তাক করে। ১৭ ডিসেম্বর রাজশাহী গেলাম। আমাদের সার্টিফিকেট দেয়া হল। বাড়ি ফিরে এলাম। ভারত থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এলাম। নতুন করে ঘর বাঁধলাম।

যুদ্ধ করেছি দেশ স্বাধীন করার জন্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটা আনন্দ ছিল, জিতলে বেশি আনন্দ পেতাম। ভয় পেতাম না। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এলাকার লোকরা বর্তমানে কিছু সম্মান দেয়। স্থানীয় স্কুলের অনুষ্ঠানে ডাকে। চেয়ার দেয় বসতে। কোনো প্রোগ্রাম থাকলে উপজেলা থেকে চিঠি দিয়ে জানায়। ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর উপজেলা থেকে চিঠি দিয়ে ডাকে। ভাতা পাই ৬ মাস পর পর।

নিজের জমি নাই। পাইট (কৃষি শ্রমিক) খাটি, দৈনিক ৮০ টাকা। স্ত্রী পায় ৬০ টাকা। সংসারে পাঁচজন লোক। সব সময় কাজ থাকে না। কোনোরকমে চলে। দৈনিক কাজ থাকলে অভাব থাকত না।

শুকচাঁদ ওঁরাও

শুকচাঁদ ওঁরাও আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাড়ি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার গোগ্রাম। বর্তমানে একজন কৃষক। নিজের ৩ বিঘা জমি আছে। তাছাড়া বর্গা চাষ করেন। '৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি তখন নিজ গ্রামেই ছিলেন। স্মৃতিচারণ করে বলেন– মুসলমানরা নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখাতে লাগল। তাছাড়া, আমাদের জাতির অন্যরা ভারতে চলে যাচ্ছে। চৈত্র মাসের শেষের দিকে আমরা শরণার্থী হিসেবে ভারত চলে গেলাম। পুটলীতে চাল-ডাল হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে। আমরা এ পাড়ার ৫০/৬০ জন ওঁরাও। পদ্মা নদী পার

হয়ে ভারতের ভগবান গোলায় উঠলাম। ওখানে প্রথমে একটা স্কুলে উঠলাম। সাথে যা নিয়ে গিয়েছিলাম তাই খেতে লাগলাম। এরপর আমাদের রেশন কার্ড হল।

ক্যাম্প থেকে শুনলাম মুক্তিযুদ্ধে লোক নেয়া হচ্ছে। তখন আমি আর বন্ধু নেপাল মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। ততদিনে অনেক আদিবাসী যুবক মুক্তিযুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি, মায়ের সমান। দেশ মুক্ত করতে হবে। মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে হবে। যুদ্ধে নাম লেখালাম। পাহাড়পুর ক্যাম্পে পিটি-প্যারেড চলল কয়েকদিন। পিটি-প্যারেড শেষে অস্ত্র ট্রেনিং শুরু করেছি। এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। যুদ্ধে আর আসতে পারলাম না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশে ফিরে এসে দুজন রাজাকার ধরেছিলাম, মার ধর করে তাদের স্থানীয় দফাদারের হাতে তুলে দেই।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্থানীয় মানুষরা সম্মান করে, মর্যাদা দেয়। তবে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা আমাদের তেমন সম্মান দেয় না। তারা হয়ত ভাবে, মুক্তিযুদ্ধে তাদের কোনো লাভ হয়নি। আসলেই আমরা তাদের জন্য ভালো কিছু করতে পারিনি।

নবীন মুর্মু

নবীন মুর্মু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন দুঃসাহসী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়পুরহাটের নিক্তিপাড়া গ্রামে বাড়ি। বর্তমানে মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– ১৯৭১ সালে আমি খঞ্জনপুর হাইস্কুলের এস এস সি পরীক্ষার্থী। সামনে পরীক্ষা, জোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু মার্চ মাসে দেশের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেল। নানারকম গুঞ্জন, আশংকা। ভারতে আমাদের আত্মীয় ছিল। তাই আগে থেকেই আমাদের প্রায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। খোঁজ-খবর নিয়ে রেখেছিলাম, কোথায় উঠব। ২৬ মার্চ যুদ্ধ শুরু হলে পরিবারসহ ভারতে আত্মীয় বাড়ি গিয়ে উঠলাম। কামারপাড়া ফুফুর বাড়ি। আসলে পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র। আমরা আদিবাসীরা এখানে বেশ কোণঠাসা ছিলাম। যে কোনো বিশৃংখল পরিস্থিতিতে আমাদের ওপর আক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকত। তাই আগে থেকেই আমরা নিরাপদ অবস্থান নিতাম।

ভারতে যাবার আনুমানিক ২০ দিন পর শুনলাম, মাইকে প্রচার হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে লোক নেয়া হবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। তাছাড়া এলাকার অনেক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। বাঙালি-আদিবাসী মিলে আমরা প্রায় ২৫০ জন একদিনে মুক্তিযুদ্ধে নাম দিলাম। জয়পুরহাটের বীর মুক্তিযোদ্ধা আলম, কাবুল এরাও ছিল।

বুলু ওস্তাদ নামে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার (পাবনায় বাড়ি) আমাদের পিটি ট্রেনিং করাতে লাগলেন। প্রায় ৪ শত লোক। ২০ দিন ধরে পিটি-প্যারেড হল। ওখান থেকে আমরা উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য গেলাম রায়গঞ্জ। প্রথমে রাইফেল, এরপর ব্রিটিশ স্টেনগান, ১৫ দিন পর ফায়ারিং রেঞ্জে নিয়ে গেল। এরপর গ্রেনেড, ব্রিজ ভাঙা, কাটিং চার্জ, ডেটনেটর ইত্যাদি বিষয়ে ট্রেনিং হল। এরপর আবার কুমারল ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমার প্রথম আক্রমণ ছিল পাগলা দেওয়ান পাক আর্মি ক্যাম্পে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তিনদিন ধরে গোলাগুলি, রকেট লাঞ্চার এবং তিন ইঞ্চি মর্টার চার্জ করেছিলাম।

তিনদিন পর আমাদের ক্যাম্পে প্রত্যাহার করা হল। পরে জেনেছিলাম, বেশ কিছু পাক আর্মি মারা গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কমান্ডার ছিল জয়পুরহাটের বাবলু। ২৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল আমাদের গ্রুপে। এর মধ্যে আমরা আদিবাসী ছিলাম ১৫ জনের মতো। দ্বিতীয় আক্রমণটি ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসী। ভারতীয় ক্যাপ্টেন আমাদের গ্রুপ থেকে পাঁচজনকে বেছে নিল। আমি নবীন মুর্মু, সুশীল (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) ফিলিপস্ হেম্ব্রম ও জোসেফ। অর্থাৎ চারজনই আদিবাসী। উদ্দেশ্য হিলিতে পাক আর্মি বোঝাই ট্রেন লাইনচ্যুত করতে হবে। কঠিন অপারেশন। পাক আর্মি ঐ ট্রেনে করে সৈয়দপুর যাবে। রেকি করা হল। তালতলা নামক একটি স্থান থেকে অপারেশন চালাতে হবে। ওখানে পাক আর্মির কড়া নজর। কিন্তু সিদ্ধান্ত– অপারেশন চালাতে হবে। ট্রেন যেতে দেয়া হবে না। ১২ ভোল্টের একটি ব্যাটারি নিলাম। এক্সপ্লোসিভ বসালাম। তার টেনে নিয়ে গেলাম নদীর ধারে। ওখানে আমাদের একটি নৌকা ছিল। রাত ভোর হয়ে আসছে। মুরগি ডাকছে। ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি এবং দেখলাম ট্রেন চলে আসছে। আমরা চার্জ করলাম। লাইন উড়ে গেল এবং ট্রেন লাইনচ্যুত হল। সফল অপারেশন। প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। এই অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আমি ও নবীন মুর্মু। পরে জানতে পারি যে ট্রেনটা আমরা উড়িয়ে দিয়েছিলাম তা একটি মালবাহী ট্রেন। যাত্রীবাহী ট্রেনটি পাঁচবিবি স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছিল নওগাঁর রাঙামাটিতে। পাক আর্মি ঐ এলাকার স্থানীয় জনগণের গরু-ছাগল নিয়ে যায়। ঐদিনও তারা গরু-ছাগল নিয়ে ঐ পথে যাবে। আমরা পুরো এলাকা রেকি করি। তারপর ২৫০ জনের একটি দল পজিশন নিই। উদ্দেশ্য জীবিত পাক আর্মি ধরব। আমাদের কাঁধে দুই ও তিন ইঞ্চি মর্টার এলএমজিসহ প্রায় সব ধরনের হালকা অস্ত্র ছিল। উজ্জীবিত বাহিনী। আমরা এমনভাবে পজিশন নেই যে একদিক থেকে ফায়ার ওপেন করলে তারা পার্শ্ববর্তী বিলে নামবে এবং তখন তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করব। আমাদের এক

সহযোদ্ধা রঞ্জিত সাহা। বাড়ি চেলোপাড়া। তার হাতে এলএমজি ছিল। কমান্ড ছাড়া সে ফায়ার ওপেন করল। পরিকল্পনা শেষ। শুরু হল গোলাগুলি। ওদিকে রঞ্জিত এলএমজি নিয়ে এগিয়ে গেছে। সে ভেবেছিল যে পাক আর্মিদের ওদিক দিয়ে ঘিরে ধরবে। কিন্তু ততক্ষণে সে পাক আর্মি দ্বারা ঘেরাও হয়ে যায় এবং ধরা পড়ে। সে ছিল প্রচণ্ড সাহসী এক যোদ্ধা। আমার পাশে ছাত্তার নামে একজন সহযোদ্ধা ছিল। মাত্র মাথা তুলেছে সামনে দেখার জন্য। অমনি ঘাড়ে গুলি লাগল। আমার সামনে সে মারা গেল। আমার হেলমেটে গুলি লেগেছে। অবস্থা খারাপ। ক্যাম্পে সহযোগিতার জন্য খবর পাঠানো হল। রাত তিনটার দিকে ভারতীয় আর্মি আসল। বেলা ১২টার দিকে যুদ্ধ বন্ধ হল। কাভারিং ফায়ার দিয়ে আমাদের প্রত্যাহার করা হল। ফিরে গিয়ে দেখলাম রঞ্জিত নাই, ছাত্তার মরে গেছে। খুব খারাপ লাগছিল। আমরা তাদের ধরতে গেলাম উল্টা আমাদের ছেলেরা ধরা পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন খুব রাগ করলেন। পরে মাইকিং করে রঞ্জিত এর বাবা-মার খোঁজ পাওয়া গেল। ওখানে তার গায়েবি কাহা চিতা হল। এবং তাঁর পরিবারের ওখানে থাকার ও রেশনের ব্যবস্থা হল।

কয়েকমাস পরে জানা গেল রঞ্জিত বেঁচে আছে। সে মানকার চরে আছে। ক্যাপ্টেন ডগরার কাছে খবর এসেছে ওয়্যারলেসে। ক্যাপ্টেন ডগরা তাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠাবার নির্দেশ দিল। ঐ দিন আমরা রামকৃষ্ণপুর একটি অপারেশনে যাই। ফিরে এসে জানলাম রঞ্জিৎ এসেছে। ঐ অবস্থায় তাকে দেখতে ছুটলাম। গিয়ে দেখি হাড় জিরজিরে একজন মানুষ ক্যাপ্টেন ডগরার সামনে চেয়ারে বসে আছে। রুগ্ন, কথা বলার মতো অবস্থা নেই। কয়েকদিন রেস্ট নেয়ার পর তার গল্প শুনি। রাঙামাটি যুদ্ধে এলএমজি নিয়ে শত্রু সেনার ভেতরে ঢুকে পড়লে পাক আর্মি তাকে জাপটে ধরে। ওখান থেকে তাকে প্রথমে নওগাঁ জেলে পরে বগুড়া জেলে নিয়ে যায়। যে যে জেলার লোক তাকে ঐ জেলার জেলে রাখা হত। জেলে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলে। ওখানে এক আর্মির সহযোগিতায় পায়খানার ড্রেন দিয়ে পালিয়ে আসেন। দুঃসাহসী ও সদা হাসিখুশি এই মানুষটা '৭৫ সালে গুলিতে নিহত হন। অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছি। হিলি থেকে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা আমরা চষে বেড়িয়েছি। আমি ছিলাম আমাদের গ্রুপের বিশেষ বাহিনী টাইগার বাহিনীর সদস্য। এই বাহিনীতে অধিকাংশ ছিল আদিবাসী। কমান্ডার ছিলেন বাবলু ভাই (জয়পুরহাট)।

১৬ ডিসেম্বর ছিলাম হিলির ভুঁই ডোবাতে। ওখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল ঐদিন। ওখান থেকে পাঁচবিবি হয়ে পতাকা হাতে করে জয়পুরহাট এলাম। ১৮ ডিসেম্বর জয়পুর ঢুকে কলেজে অস্ত্র জমা দিলাম। বিজয়ের দেড়মাস পর। সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম। পরে যেমন ভুমিকা রাখা দরকার ছিল তেমন

রাখতে পারিনি। তাছাড়া সরকারও তেমন সহযোগিতা করল না। অস্ত্র জমা নিয়ে নিলে আমরা পাবলিক হয়ে গেলাম। তবু আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এলাকায় পল্লী মঙ্গল করে রাস্তাঘাট নির্মাণ, সাঁকো তৈরি, প্রাইমারি স্কুল তৈরি করেছি। রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় এলাকার লোকদের নিয়ে এসব করেছি।

যুদ্ধে গেলাম বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য। এটা আমার জন্মভূমি। যুদ্ধ করে এ ভূমিকে মুক্ত করতে হবে। আমরা কোনো জাতীয়তাবাদ বুঝতাম না। ঘরে ফিরতে হবে, দেশে ফিরতে হবে, এজন্য দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। এটা ছিল যুদ্ধে যাবার মূল কারণ। যুদ্ধের পর পর আমাদের কিছু মূল্য ছিল। অনেক লোক ছুটে আসত দেখার জন্য। এরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। স্বাধীনতার পর দেশে নানারকম বিশৃঙ্খলা শুরু হল। '৭৫-এর পর আরো বাড়ে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে জেলে দেয়া হয়, হত্যা করা হয়। এ সময় আমিও দুই বছর জেলে ছিলাম। সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জেলে যাই। বর্তমানে ভাতা এবং মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্মানের কারণে বোধহয় মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা একটু বেড়েছে।

মার্টিন হাঁসদা

আদিবাসী সাঁওতাল জাতির এ মুক্তিযোদ্ধার বয়স ১৯৭১ সালে ২৩ বছর। বাড়ি নওগাঁ জেলার পূর্ব জগদল। টগবগে যুবক। তখন পর্যন্ত অবিবাহিত মার্টিন হাঁসদা তিন ভাই-এর মধ্যে সকলের ছোটো। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন- "বাংলা বৈশাখ ইংরেজি মে মাসে ভারতে চলে যাই পরিবারের সব সদস্য মিলে। কিছু নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারি নাই। দেশে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। চারদিকে পাক আর্মি ও তাদের সহযোগীরা মারধর করছে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আর আমরা তো আদিবাসী হিন্দু জাতি। আমাদের ওপর বেশি টার্গেট। যে কারণে প্রিয় জন্মভূমি ছাড়তে হল। শরণার্থী হিসেবে ভারতের শরণার্থী শিবিরে উঠলাম। ভাবলাম শিবিরে বসে রিলিফের চাল খাব আর ঘুরে বেড়াব ? তারচেয়ে বরং দেশের জন্য যুদ্ধ করব। মাকে বললাম, মা যুদ্ধে যাব। মুক্তি বাহিনীতে লোক নিচ্ছে। ট্রেনিং দিবে অস্ত্র দিবে। মা বলল, যাও, যুদ্ধে যাও। তবে কোনো অন্যায় করবে না। যুদ্ধের পর বিজয় পাওয়ার পর তোমার সাথে দেখা হবে।

গঙ্গারামপুর থানার যে শিবিরে ছিলাম, ওখান থেকেই জেনেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে লোক নিচ্ছে। নাম লেখালাম। প্রাথমিক মেডিক্যাল হল। ওখানে ইয়ুথ ক্যাম্পে ৮ দিন পিটি-প্যারেড হল। এরপর উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য শিলিগুড়ির রায়গঞ্জ, কালিগঞ্জ নিয়ে গেল। ওখানে পনেরো দিন থাকলাম। ওটা ছিল নিচু জায়গা। বর্ষার পানি ওঠে থাকার পর ওখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে গেল শিলিগুড়ির

পানিঘাটায়। প্রথমে রাইফেল ট্রেনিং হল। এরপর এসএলআর, স্টেনগান, এলএমজি, গ্রেনেড, এন্টি ট্যাংক মাইন, ২″ ও ৩″ মর্টার, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদির ট্রেনিং হল। ২৫ দিনের ট্রেনিং শেষ করে এলাম বালুরঘাটের উত্তরে কুমারগঞ্জ থানায়। আমরা এক গ্রুপে ছিলাম ১৫ জন আদিবাসী। কমান্ডার ছিলেন দিনাজপুর সুঁইহাড়ি মিশনের পাতরাশ হাঁসদা।

প্রথম আক্রমণ করি ফুলবাড়ির একটি পাক সেনা ক্যাম্পে। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ভোররাতে আক্রমণ করি। দুপুর ১টা পর্যন্ত লড়াই চলল। এই যুদ্ধে স্পটে মারা গেল রংপুরের লোকমান। অন্য একজন কোমরে গুলিবিদ্ধ হয়, ১১ দিন পর বালুঘাট হাসপাতালে সেও মারা যায়। ভারতীয় কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধাদের এ যুদ্ধে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিল। কারণ, ভারতীয় আর্মি এ যুদ্ধে কোনো সহযোগিতা করতে পারবে না। শুধুমাত্র অনভিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধারা এরকম একটি ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধে কতটা সফলতা পাবে এ ব্যাপারে ভারতীয় আর্মি সন্দিহান ছিল। কিন্তু সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা সে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিল। শত্রুপক্ষের ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল।

এরপর আমরা গেলাম ফুলবাড়ির কঞ্জুয়ালে। একদিন থাকার পর বাঙালি কমান্ডারের সাথে আমাদের ঝগড়া হয়। আমাদের ক্যাম্পে অতর্কিতে একটি বোমা এসে পড়ে। একজন আদিবাসী যোদ্ধা কমান্ডারের কাছে জানতে চায় সে কোথায় পজিশন নেবে। কামান্ডার তাকে লাথি মারে। সে আদিবাসীদের কমান্ডার গাডরাশের কাছে ঘটনা বলে। এই নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ঘটে। আমরা ভারত চলে যাই। ওদিকে সীমান্তে তুমুল যুদ্ধ চলছে। সীমান্তের তিন ক্যাম্পের যোদ্ধারা ক্যাম্প ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতে ফিরে গিয়ে ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে এই ঘটনা জানালাম। তিনি আমাদের উপর রাগ করলেন। আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করে পুরাতন দলে ফিরে যাই। আমাদের গ্রুপও পরাজিত হয়ে ক্যাম্প ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। পরবর্তীতে আমরা ঐ ক্যাম্প আবার উদ্ধার করি।

এরপর আমাকে পাঠানো হয় আদিনাবাদ বরাহার ক্যাম্পে। ওখানে ভারতীয় অফিসার আমাকে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া ক্যাম্পে পাঠাতে চাইলেন। আমি বললাম, আমার বাড়ির কাছাকাছি একটি বড়ো ক্যাম্প আছে। পরে আমাকে ওখানে পাঠানো হল। ওখানে কিছুদিন থাকার পর আমাকে আবার তুলে নিয়ে গেল কালিয়াগঞ্জ। বলা হল, আর গেরিলাযুদ্ধ নয়। এখন থেকে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। ওখানে ১১ দিনের ট্রেনিং দেয়া হল। সম্মুখ যুদ্ধের কিছু কলা-কৌশল শেখানো হল এ সময়।

ওখান থেকে আমাদের প্রথম নিয়ে যাওয়া হল সোনা মসজিদ সীমান্তের বানিয়া দীঘিতে। শিবগঞ্জ থানা এলাকায় আমরা শেষ যুদ্ধ করলাম। দেশ স্বাধীন

হবার ২ দিন আগে ঐ যুদ্ধে শহীদ হন বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর। যুদ্ধটি ছিল পরিকল্পিত। চাঁপাই নবাবগঞ্জের বারঘরা। আমরা নদীর ঐ পাড়ে, পাক আর্মিরা এ পাড়ে। আমরা মাইকে তাদের সারেন্ডার করতে আহ্বান করলাম। ঐদিন রাতে কমান্ডো স্টাইলে আক্রমণ করা হল। নৌকায় করে নদী পার হয়ে বাংকারে গ্রেনেড ছোড়া হল। ঐ যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত– নিহত হল। ঘাঁটি দখল করার পর আমরা দেখলাম ওখানে কোনো পাক সেনা নাই– সব রাজাকার। ঐ সময় কোনো একটি ঘরের জানালা দিয়ে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে গুলি করা হয়। তিনি সাথে সাথে মারা যান। আমরা হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ছিলেন দুরন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান যোদ্ধা এবং অগাধ দেশপ্রেমিক। তিনি ভারতীয় আর্মির সহযোগিতা নিতে চাননি। শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চাঁপাই নবাবগঞ্জ শত্রুসেনামুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর মারা যাবার পর ঐ দিন বিকাল ৪টার সময় ভারতীয় আর্মি আমাদের সাথে যোগ দিল।

রাতে আবার যুদ্ধ হল। আমরা নদী পার হয়ে এলাম। পরদিন ১২টার সময় আমরা চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরে পৌঁছলাম। ঐ রাতে আমরা চাঁপাই নবাবগঞ্জেই থাকলাম। রাতে আমার ডিউটি ছিলনা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ১২টার দিকে ব্যাপক হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল। আনন্দ-উল্লাস। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। পাকবাহিনী সারেন্ডার করেছে। চারদিকে জয় বাংলা শ্লোগানে প্রকম্পিত হচ্ছিল। প্রচণ্ড আনন্দ পাচ্ছিলাম। সবাই গুলি ফুটিয়ে উৎসব করলাম। ভেবেছিলাম, স্বাধীনতার পর আমরা প্রথম সারির সৈনিক থাকব, তা আর হল না। স্বাধীনতার ৩/৪ দিন পর চাঁপাই নবাবগঞ্জে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আগে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে লজ্জা পেতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নানারকম রাজনীতি হত। কিন্তু তাতে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো লাভ হত না। বর্তমানে ভাতা ও মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কারণে সমাজে সম্মান ও মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে।

শ্রী চাম্পাই সরেন

আদিবাসী সাঁওতাল জাতির বীর মুক্তিযোদ্ধা চাম্পাই সরেন। রাজশাহী জেলার তানোর থানার ময়েনপুর গ্রামে তার বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধে পা হারানো এক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে কৃষি কাজ করেন। যুদ্ধ করেছেন ৭ নং সেক্টরে। ১৯৭১ সালে ১৭/১৮ বছরের তরুণ চাম্পাই তানোর থানার একটি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চাম্পাই সরেন বলেন– "১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে আমাদের মনে হয়েছিল দেশের অবস্থা খারাপ হবে। ২৬ মার্চের পর আমরা সাহস করে দেশেই ছিলাম। এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রাম লুহিত নগরে কারা যেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। এই ঘটনায়

পাড়ার সব আদিবাসীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯৬৪ সালে দারুসা রায়টের সময় আমরা দেশ ছেড়েছিলাম। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ফিরে এসেছিলাম। আগে থেকে জেনেছিলাম ভারত আদিবাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। এ সংবাদ আমাদের ভারত যাবার ব্যাপারে সাহস জুগিয়েছিল। ভারত হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ওখানে আমরা নিরাপদ বোধ করি। তাছাড়া আদিবাসীরা আছে। সবাই ফেরালেও তারা আমাদের আশ্রয় দেবে। দেউলা থেকে সারাদিন হেঁটে রাতে পৌঁছলাম নওগাঁর নিয়ামতপুরের দিঘীর হাট। রাতে ওখানে থাকলাম। ভোরে আবার রওনা দিলাম। জাসল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। ওখানে গিয়ে কালাই বাড়ি উঠলাম। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সুবিধামতো কেউ আত্মীয় বাড়ি, কেউ ক্যাম্পে, স্কুলের মাঠে বিভিন্ন স্থানে উঠল। আমরা মামাত ভাই-এর বাড়িতে উঠলাম। ১৫/২০ দিন ওখানে থাকার পর শরণার্থী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।"

ক্যাম্পে এলেন। তিনি তখন ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াতেন। আদিবাসী যুবক-তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। চাম্পাই বললেন, তার সাথে কথা বলে ঐ দিনই এ পাড়ার আমরা চার যুবক নাম দিলাম। ঐদিন আমাদের ক্যাম্প থেকে আরো কিছু যুবক যোগ দিল। দুই দিন পর ১৫/১৬ জন ছেলেকে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল গৌড়বাগানে। গৌড়বাগানে কয়েকদিন ধরে পিটি-প্যারেড হল। এরপর আর্মি ভ্যানে করে আমাদের নিয়ে গেল শিলিগুড়ি। ওখানে শুরু হল অস্ত্র ট্রেনিং। থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এসএলআর, এস এমজি এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার, গ্রেনেড ছোড়া, মাইন ব্যবহার এবং কীভাবে ব্রিজ ভাঙতে হবে এ ব্যাপারে একটি বিশেষ ট্রেনিং হল। ২১ দিনের ট্রেনিং শেষে আমাদের আনা হল তরঙ্গপুর। এখানে ২/৩ দিন থাকলাম। সকলকে অস্ত্র দেয়া হল। আমি থ্রিনটথ্রি রাইফেল পেলাম। যারা একসাথে যোগ দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে আমি এবং ঈশ্বর মুর্মু এক গ্রুপে থাকলাম। বাকিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আনুমানিক সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এসে ক্যাম্প করলাম 'মুশরীভূজা'। এটা চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার মধ্যে। পাগলা নদীর পাড়ে। ওখানে রহনপুরের একটি ছেলে আমাদের বিভিন্নরকম খবর পৌঁছে দিত। পাক আর্মি ও রাজাকারদের অবস্থান জানাত। প্রায় নিয়মিত রাতে সে আসত। গোমস্তাপুরের আড়াগাড়া হাটে পাক আর্মির একটি ক্যাম্প ছিল। সিদ্ধান্ত নেয়া হল ঐ ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি গ্রুপে মিলে যৌথভাবে আক্রমণ করা হবে। রাত ১০/১১টার দিকে রওনা দিলাম। রাত ১/২টার দিকে ফায়ারিং শুরু হল। সকাল ১০টা নগাদ তারা ঐ ক্যাম্প ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ক্যাম্প দখল করে আমরা ঐ ক্যাম্পের পাশেই ক্যাম্প করলাম। এই যুদ্ধে ৫/৬ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।

এরপর আমরা ক্যাম্প করলাম চাঁপাই নবাবগঞ্জের কলা বাড়িতে। সব ক্যাম্পই ছিল অস্থায়ী ক্যাম্প। বেস ক্যাম্প ছিল মহাদেবপুর। কলাবাড়িতে আমরা একটি এ্যামবুশ করি রাজাকার ধরার জন্য। অস্ত্রসহ ৫ জন রাজাকার আটক করি। কলাবাড়ি থেকে আবার মুশরীভূজা চলে আসি। এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ঐ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর শহীদ হন।

১৬ ডিসেম্বর মুশরীভূজা ছিলাম। বিজয়ের আনন্দে সবাই উল্লাস করি। পরদিন মুশরীভূজা থেকে রহনপুর আসি। রহনপুর এসে রেলগাড়ির একটি খালি বগি নিলাম। ব্যাগ, অস্ত্র সব বগিতে রেখে সবাই মিলে ঐ বগি ঠেলে আমনুরা নিয়ে এলাম। আমনুরা থেকে গেলাম চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ওখানে বাচ্চু ডাক্তারকে বললাম, রাজশাহী যাব ব্যবস্থা করে দেন। তিনি আমাদের একটি গাড়ি ঠিক করে দিলেন। রাজশাহী গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে উঠলাম।

জোহা হলে থাকতে একদিন গোসল করে কাপড় নাড়তে গেছি। এমন সময় মাইনের উপর পা পড়ল এবং মাইন ফেটে গেল। তারপর রাজশাহী মেডিক্যাল। ওখান থেকে পাঠানো হল ঢাকার কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে। '৭৬ সাল পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। পায়ে দুবার অপারেশন হয়। অবশেষে আমাকে একটি প্লাস্টিকের পা দেয়া হয়। হাসপাতালে থাকতে মাসে ৭৫ টাকা ভাতা পেতাম।

যুদ্ধকালীন সময়ে একমাত্র স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন করব। জীবন দিয়ে হলেও তা করব। স্বাধীন দেশে ফিরে আসব। সবাই মিলে একসাথে বসবাস করব। সমাজের লোকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন মূল্যায়ন করে না। আগে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে লজ্জা পেতাম। হীনমন্যতায় ভুগতাম। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন– স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ, সাহসকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে এ ব্যাপারটি রাজনীতিবিদরাই ভালো বলতে পারবেন।

বীরেন্দ্রনাথ হেরদুয়ার

আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ হেরদুয়ার। রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার বটতলী গ্রামে তার বাড়ি। ১৯৭১ সালে উচ্ছল যুবক বীরেন্দ্রনাথ হেরদুয়ার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, বৈশাখ মাসের দিকে ভারতে চলে গেলাম। কারণ এখানে আমরা একজন মুসলমান ডাকাতকে পিটিয়ে মেরে ফেলি। তার নাম ছিল কালু। যুদ্ধের আগেও সে ডাকাতি করত। যুদ্ধ শুরু হলে দিনে দুপুরে ডাকাতি শুরু করে। আমাদের গরু-ছাগল, ধান-চাল নিয়ে যায়। যুবতি মেয়েদের দিকে হাত বাড়ায়। একদিন সকাল ১০টার দিকে সে তার দলবল নিয়ে আমাদের পাড়ায় আসে। পাড়ায় ডাকাতি করে সে পাশের মুসলমান পাড়ার দিকে ওঠে। তখন আমরা পাড়ার সব লোকেরা সিদ্ধান্ত নিই

তাকে আজ ধরা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাড়ার সব লোকেরা তীর-ধনুক নিয়ে ঐ মুসলমানের বাড়ি ঘেরাও করি। তাকে ধরে এনে প্রহার করলে সে মারা যায়। এ ঘটনায় আশপাশের গ্রামের মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা এ পাড়ার সব লোকেরা একদিনে ভারতে চলে যাই। ঐ সময় আশপাশের গ্রামের হিন্দু এবং আদিবাসীরাও ভারতে পালাচ্ছিল। যাবার সময় সাথে চাল, ছাতু, শুকনা খাবার নিয়েছিলাম। গরু, ছাগল, ধান, চাল পরিচিত মুসলমানদের বাড়ি রেখে যাই। এখান থেকে খিদিরপুর গিয়ে নৌকায় পদ্মা পার হলাম। ভারতে গিয়ে প্রথমে ভগবানগোলায় উঠলাম। ওখান থেকে ট্রেনে করে গেলাম হাতিনগর। ওখানে আমরা একটি স্কুলের শরণার্থী ক্যাম্পে উঠলাম। ৭/৮ দিন পর রেশন দেয়া শুরু করল। সাগরাম মাঝির ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিই। তিনি একদিন আমাদের ক্যাম্পে এসে বললেন, দেশ মুক্ত করতে হবে। যুদ্ধে যেতে হবে। সব যুবকের যুদ্ধে যাওয়া উচিত। কীভাবে যুদ্ধ করব জানতে চাইলে তিনি বললেন, ট্রেনিং দেয়া হবে, অস্ত্র দেয়া হবে। তারপর দেশে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

প্রথম ট্রেনিং হয় গৌড়বাগান (ইয়ুথ ক্যাম্প) পিটি ট্রেনিং। বন্যার জন্য হায়ার ট্রেনিংয়ে যেতে দেরি হয়। পরে ওখান থেকে শিলিগুড়ি নিয়ে গেল। ওখানে ২১ দিনের ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং। ট্রেনিং শেষ হলে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। আমাদের গ্রুপে ১৭ জন আদিবাসী ছিলাম। ১৭ জনের কমান্ডার ছিল সাগরাম মাঝির ছেলে সুধীর মাঝি। আমাদের ট্রেনিং কমান্ডার ছিলেন ভারতীয় অফিসার দেবেন্দ্রনাথ ধীরেন।

বাংলাদেশে প্রথম পা রাখলাম কানসাটে। এরপর শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ওখানেই পাক আর্মির সাথে আমাদের যুদ্ধ হল। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে গোলাগুলি চলল। আমি স্টেনগান ব্যবহার করতাম। এটা গেরিলাযুদ্ধের উপযোগী একটি অস্ত্র। সম্মুখযুদ্ধের নয়। কিন্তু প্রথম যুদ্ধটি ছিল সম্মুখযুদ্ধ। এরপর গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে অনেক অপারেশনে অংশ নিয়েছি। আজ এখানে, কাল ওখানে।

১৬ ডিসেম্বর আমরা নওগাঁ এলাকায় ছিলাম। রাজশাহী গিয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি এলাম। বাড়ি এসে দেখি আমাদের গ্রামের কোনো চিহ্ন নাই। পুরো গ্রামে সরিষা ক্ষেত। সারা গ্রামে সরিষা ফুল ফুটে আছে। স্থানীয় পাকিস্তানপন্থী মুসলমানরা ভেবেছিল আমরা আর ফিরে আসতে পারব না। তাই তারা আমাদের সব জমি দখল করে। যাবার সময় যা রেখে গিয়েছিলাম তার মধ্যে গরু-মহিষ ফেরত পেয়েছিলাম। ধান-চাল ফেরত পাইনি।

বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজের কিছু লোক সম্মান করে। ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর উপজেলায় ডেকে সম্মান দেয়া হয়।

নারায়ণ মুরারী

আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা নারায়ণ মুরারী। তার বাড়ি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলায় গোগ্রাম। বর্তমানে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ। প্রান্তিক কৃষক নারায়ণ চন্দ্র মুরারী ১৯৭১ সালে একজন পূর্ণ যুবক ছিলেন। বর্তমানে তিনি গোগ্রাম ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, যুদ্ধ শুরু হবার বেশ কিছুদিন পর আমরা ভারতে যাই। ততদিনে আশপাশের গ্রামের আদিবাসীরা সব ভারত চলে গেছে। এ সময় একজন মুসলমান ডাকাত আমাদের গ্রামের ওপর অত্যাচার করত। একদিন তাকে ধরে পিটালে সে মারা যায়। এ ঘটনায় মুসলমানরা আমাদের হুমকি দিতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা ভারত চলে যাই। ঐ সময় আমরা মোটামুটি সচ্ছল কৃষক পরিবার ছিলাম। সাথে তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারিনি। ... ডাল-চাল, গরু-ছাগল ঘর-বাড়ি রেখে কাঁদতে কাঁদতে গ্রাম ছাড়ি।

খিদিরপুর দিয়ে পদ্মা পার হয়ে প্রথমে ভগবানগোলায় উঠি। পরে হাতিনগর শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিই। এ সময় সাগরাম মাঝি ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পরামর্শ দেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। প্রথমে গৌড়বাগা গণক্যাম্পে ২ মাস পিটি ট্রেনিং করি। বন্যার কারণে উচ্চতর ট্রেনিংয়ে যেতে পারছিলাম না। পরে শিলিগুড়িতে ২১ দিনের অস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হয়। এরপর তরঙ্গপুরে আবার পাঁচ দিনের টার্গেট প্রশিক্ষণ হয়। এরপর ১৭২ জনের দলের সদস্য হিসেবে দেশে প্রবেশ করি। গেরিলা যুদ্ধ ছিল আমাদের মূল টার্গেট। দলের কমান্ডার ছিল সাগরাম মাঝির ছেলে সুধীর মাঝি। প্রধান কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গিয়াস। গোদাগাড়ি, তানোর, মোহনপুর, কাঁকনহাট, আন্ধারকোঠা এলাকায় অনেক যুদ্ধে অংশ নিই। রাজাকার-বিরোধী অপারেশন আমরা বেশি চালাতাম। ১৬ ডিসেম্বর গোদাগাড়ি ছিলাম। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি আসি।

বাড়ি এসে দেখলাম, বাড়ি মাঠ হয়ে গেছে। কিছুই ফেরত পাইনি। নিজেদের জমি উদ্ধার করতেও কষ্ট হয়েছে। যুদ্ধকালে যে স্বপ্ন দেখতাম তা পূরণ হয়নি। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের একতাহীনতায় মনোবল ভেঙে যায়। দেশ গঠনের কাজে কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয় মুক্তিযোদ্ধারা। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের তেমন মূল্য নেই। তবে তরুণদের কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান করে।

গজেন্দ্রনাথ মুরারী

আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের এই মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে পঙ্গু। স্বাধীনতার পর পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে একটি পা কাটতে হয়। বর্তমানে কবিরাজি চিকিৎসক হিসেবে সামান্য কিছু উপার্জন দিয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছেন। গজেন্দ্রনাথের বাড়ি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলার বটতলী গ্রামে। '৭১ সালে পূর্ণ যুবক গজেন্দ্রনাথ মুরারী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে আমাদের গ্রামে একজন মুসলিম ডাকাতকে ধরে পেটানো হলে সে মারা যায়। এ ঘটনায় আশপাশের গ্রামের মুসলমানরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে আমরা ভারত চলে যাই। খিদিরপুর দিয়ে পদ্মা পার হয়ে প্রথমে ভগবানগোলায় গিয়ে উঠি। পরে ওখান থেকে চলে যাই হাতিনগর। ওখানে শরণার্থী শিবিরে উঠি। সাগরাম মাঝির আহ্বানে এবং প্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেই। বন্যার কারণে আমার ট্রেনিংয়ে যেতে বেশ দেরি হয়ে যায়। শিলিগুড়ি থেকে অস্ত্র ট্রেনিং নিই। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হয়। ট্রেনিং শেষ করে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে।

কয়েকদিন পরেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ফলে, প্রত্যক্ষ কোনো যুদ্ধে আমি অংশ নিতে পারিনি। বিজয়ের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ পাই। বিজয়ের পর রাজশাহীতে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে আসি।

বাড়ি এসে দেখলাম, আমাদের গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। সরিষা চাষ করা হয়েছে পুরো গ্রামে। নতুন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করি। পরে আর মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর রাখতে পারিনি। অসুস্থ হয়ে পড়ি। আজ পর্যন্ত আমার নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় ওঠেনি। সমাজে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অল্প কিছু লোক সম্মান করে। বিপদে মুক্তিযোদ্ধারা পাশে দাঁড়ায়।

শ্রী মতি কিস্কু

আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মতি কিস্কু। বর্তমানে ৪ মেয়ে ১ ছেলের পিতা মতি কিস্কুর পেশা শূকর পালন। বাড়ি রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে। ১৯৭১ সালে মতি কিস্কু ২০ বছরের যুবক। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কিশোর বয়সে আমার বাবা-মা মারা যায়। এক মুসলমানের বাড়িতে রাখালের কাজ করতাম। দেশে যুদ্ধ শুরু হলে গৃহকর্তার পরামর্শে ভারত চলে যাই। ভারতে গিয়ে হাতিনগর শরণার্থী ক্যাম্পে উঠলাম। ঐ ক্যাম্পে একদিন আদিবাসীদের নেতা সাগরাম মাঝি গেলেন। তিনি আমাদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণ শুনে সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। সিদ্ধান্ত সাগরাম মাঝিকে জানালাম। তিনি আমার নাম তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করলেন। শিলিগুড়িতে অস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে গেরিলা যোদ্ধা

হিসেবে বাংলাদেশে ঢুকলাম। গ্রুপে আমরা ১২ জন ছিলাম। কমান্ডার ছিলেন মনোরঞ্জন কুণ্ডু (হিন্দু)। ১২ জনের মধ্যে আমরা ৩ জন সাঁওতাল, ৭ জন ওঁরাও এবং ১ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান। মুসলমান সালাউদ্দিনের বাড়ি ছিল বরিশালে। সে যুদ্ধে শহীদ হয়। নওগাঁ এলাকায় অনেক গেরিলা আক্রমণে অংশগ্রহণ করি। ১৬ ডিসেম্বরের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে আসি।

জন্মভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে– এই চেতনা সাগরাম মাঝির কাছ থেকে পেয়েছিলাম। এই চেতনায় যুদ্ধ করেছি। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে কিছু লোক সম্মান করে। সরকারি কর্মচারীরা প্রতি ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ প্যারেডে আমাদের সহযোগিতার কথা বলে। কিন্তু পরে কোনো প্রয়োজনে গেলে চিনতে পারে না। আগ্রহ দেখায় না। বরং বিরক্ত হয়।

রাযোয়া মাহাতো

আদিবাসী মাহাতো সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রাযোয়া মাহাতো বাড়ি জয়পুরহাট জেলার বীরনগর গ্রামে। ১৯৭১ সালে যুবক রাযোয়া মাহাতো বর্তমানে কৃষি শ্রমিক। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে কোনোরকমে জীবনপাত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন- রাতারাতি পরিবারের সবাই মিলে ভারত চলে গেলাম। সাথে কিছু নিয়ে যেতে পারিনি। সব সময় ভয় আর আতংক নিয়ে ভারতে পৌঁছালাম। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পেলাম। কয়েকদিন পর মাইকে মুক্তিযুদ্ধে যাবার আহ্বান জানানো হল। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাব এটা ভাবিনি। বাবা একদিন আদেশের মতো করে বললেন- তুমি মুক্তিযুদ্ধে যাও। দেশের জন্য লড়াই কর। দেশকে মুক্ত কর। বাবার আদেশে মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। ট্রেনিং হল গঙ্গারামপুর এবং শিলিগুড়িতে। ট্রেনিং শেষ করে বীরগঞ্জ পাঠানো হল। যুদ্ধ তখন শেষের দিকে। ওখানে কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। ১৬ ডিসেম্বর বীরগঞ্জ ছিলাম।

দিনাজপুর শহরে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে নতুন করে ঘর করলাম। নিজের কাজে লেগে গেলাম। পরে আমাদের ডেকেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম দিল। এখন ভাতা পাই। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজের লোকেরা কিছু সম্মান-মর্যাদা দেয়। ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর পাঁচবিবিতে চিঠি দিয়ে ডাকে।

বিমল সিং ওঁরাও

আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার বীরনগর গ্রামে বাড়ি। ১৯৭১ সালে টগবগে তরুণ বিমল সিং ওঁরাও

বর্তমানে দরিদ্র কৃষি শ্রমিক। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– ১৯৭১ সালে দেশে যুদ্ধ শুরু হল। চারদিকে গুঞ্জন শুরু হল পাকিস্তান সেনারা আদিবাসী এবং হিন্দুদের মারছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেশের মায়া ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে আমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে ভারত চলে গেলাম। ওখানে গঙ্গারামপুর শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পেলাম। শুনলাম, মুক্তিযুদ্ধে লোক নিচ্ছে। আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। শিলিগুড়িতে ট্রেনিং হল। ট্রেনিং শেষে বিরল এলাকায় আমাকে পাঠানো হল। ঐ এলাকায় কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১৬ ডিসেম্বর বিরল ছিলাম। পরে দিনাজপুরে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। ভারত থেকে বাবা-মাকে নিয়ে এলাম।

স্বাধীনতার পরে আর কোনো খোঁজ-খবর রাখিনি। নিজের কাজ শুরু করি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে কোনো সম্মান নেই। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম দেশ স্বাধীন করার জন্য।

মহাদেব মিঞ্জি ওঁরাও

মহাদেব মিঞ্জি আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। মহাদেবের বাড়ি জয়পুরহাট জেলার বাদমপুর গ্রামে। একাত্তর সালে মহাদেব কিশোর ছেলে। পরিবারের সাথে ভারত চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন– ভারতে গিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে আছি। দেখলাম, যুবক-তরুণরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। আমারও মনে স্বচ্ছ একটা ইচ্ছা হল মুক্তিযুদ্ধে যাবার। প্রথমে নাম লেখাতে গেলে আমি ছোটো বলে নিতে চায়নি। পরে বয়স বাড়িয়ে বললাম। তখন নিল। ওখানে আমাদের পিটি-প্যারেড হল চারদিন। ওখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল মালঞ্চ। ওখানে অস্ত্র ট্রেনিং হল ১ মাস ১৮ দিন। ওখান থেকে নেয়া হল পাতিরাম। সবার মধ্যে সবার চেয়ে ছোটো। তাই আমাকে যুদ্ধে পাঠাত না। ক্যাম্পের বাজার আনা, রান্নার কাজে সহযোগিতার কাজ দেয়া হল। আমি আনন্দের সাথে তাই করতাম।

দেশ স্বাধীন হলে বাড়ি চলে এলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এলাকায় তেমন কোনো সম্মান নাই। তবে সরকারি ভাতা পাই, এটা সরকারের দিক থেকে একটা সম্মান। আমি গরিব মানুষ ভাতাটা আমার কিছু উপকারে লাগে।

দেওয়ান হেম্ব্রম

জয়পুরহাটের পাঁচবিবির দেওয়ান হেম্ব্রম আদিবাসী সাঁওতাল জাতির একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। ৭১ সালে তিনি কলেজের ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাঁচবিবি এলাকার আদিবাসী ও হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য

তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কাজ করেছেন। আদিবাসীরা যাতে নিরাপদে ভারত যেতে পারে এ লক্ষ্যে তিনি কাজ করেছেন। পাঁচবিবি এলাকার সকল আদিবাসী ভারতে যাবার পর তিনি ভারতে যান। তাঁর মতে, আদিবাসীরা প্রধানত পাক আর্মির ভয়ে ভারতে চলে যায়। তবে স্থানীয় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কিছু চিহ্নিত পাকিস্তান সমর্থক আদিবাসীদের অসুবিধা তৈরি করেছে। ভারতে যাবার সময় রাস্তায় তাদের মালামাল লুট করেছে এ জাতীয় লোকেরা।

ভারতে যাবার পর তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে তিনি আদিবাসীদের সাহস দিয়েছেন। আদিবাসী তরুণ যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যাবার প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর মতে মুক্তিযুদ্ধকালে আদিবাসী যুবক তরুণরা দেশমাতৃকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আদিবাসীরা দেশ ত্যাগের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেকে আর ফিরে আসেনি। অনেকে ফিরে এসে তাদের রেখে যাওয়া সম্পাদ ফেরত পায়নি। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের একতা থাকেনি। থাকলে ক্ষতি পূরণ করা যেত।

বুধু মুণ্ডা

আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা বুধু মুণ্ডা। জয়পুরহাটের দোগাছি বাড়ি বুধুর। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুধু মুণ্ডা বলেন– ৭১ সালে আমি বেকার যুবক। জয়পুরহাট শহরে সারাদিন আড্ডা দেই, রাতে বাড়ি এসে ঘুমাই। ২৬ মার্চ রাতে বাড়ি ছিলাম। গোলাগুলির শব্দ শুনে জয়পুরহাট গেলাম। শহরে বাবলু ভাই, কালু এদের সাথে দেখা। আমাকে বলল, কিরে বুধু একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস. গুলি খেয়ে মরবি। চল, আমাদের সাথে চল। নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা থ্রিনটথ্রি রাইফেল দিল। রাইফেল নিয়ে রাতে শহর পাহারা দেই। দুইদিন পর পাক আর্মিদের গাড়ি এল শহরে। কোনো কথা নেই, গুলি করতে লাগল নির্বিচারে। তিন-চারজন মারা গেল। সবাই ভারতের দিকে রওনা দিল। আমি ভারতে না গিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আমার কাছে রাইফেল। রাতে এদিক দিয়ে কিছু লোক ব্যাংক ডাকাতি করে পালাচ্ছিল। আমরা তাদের পাকড়াও করলাম। বাবলু ভাই তখনও ভারত যায়নি। ভোরবেলা তাকে খবর দিলাম। বাবলু এসে ওদের নিয়ে গেল। আমার রাইফেলটাও নিয়ে গেল। ঐ দিনই আমরা পাড়ার লোকেরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম– আর থাকা যাবে না। চারদিকে গণ্ডগোল। এছাড়া, প্রচুর হিন্দু আদিবাসী আমাদের সামনে দিয়ে ভারত চলে যাচ্ছে। পরদিন আমরা পাড়ার সব লোকেরা ভারত চলে গেলাম। সাথে তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারিনি।

ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে উঠলাম। বাবলু ভাইদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। সোবরা ক্যাম্পে ট্রেনিং হল। বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হল। ট্রেনিং শেষ করে অপারেশন ক্যাম্পে এলাম। গেরিলা যুদ্ধ। প্রতিদিন অপারেশন। আজ

এখানে, কাল ওখানে। রাজাকার ধরা, ব্রিজ ভাঙা, রেললাইন ওড়ানো, অস্ত্র যোগাড় করা ইত্যাদি ধরনের অপারেশন। ভারত থেকে রাতে দেশের ভিতর আসতাম। অপারেশন শেষ করে আবার রাতের মধ্যে ভারতীয় ক্যাম্পে ফিরে যেতাম। আমি নিজে এসএলআর ব্যবহার করতাম।

চেরাডাঙ্গিতে এক অভিযানে গেলাম। ওখানে এক রাজাকার আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। গোপনে আর্মিকে খবর দিলে তারা আমাদের ঘিরে ফেলে। ঐ যুদ্ধে একজন পাহাড়ি আদিবাসী শহীদ হন। তিনি বিডিআর (তৎকালীন ইপিআর) থেকে মুক্তিযুদ্ধে এসেছিলেন।

পরে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় তুরা পাহাড় এলাকায়। ওখানে গোয়ালপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আবার এক মাসের ট্রেনিং হল। ওখানে বিভিন্ন বাহিনীর লোক নিয়ে একটি যৌথ বাহিনী গঠন করা হল। এই ব্যাটেলিয়ানটি নিয়ে গেল সিলেট সেক্টরে। তামাবিলের কাছে আমাদের নামিয়ে দিল। এ সময় কোম্পানি কমান্ডার ছিল জাকির হোসেন ও মান্নান। আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল সিলেট শহরে ঢুকতে হবে। ওখানে শিমুলতলী নামক এক স্থানের যুদ্ধে আমরা ব্যাপক মার খেলাম। ভুল তথ্যের কারণে। পরে ভারত থেকে শেলিং করে শিমুলতলী জয় করা হল। আমরা অস্ত্র সরাতে লাগলাম। ততদিনে চারদিক থেকে আমাদের বিজয়ের সংবাদ আসছে। বিভিন্ন স্থানে পাক আর্মি সারেন্ডার, রাজাকার গ্রেফতার ইত্যাদি। এরপর আমরা সুরমা নদীর পাড়ে এসে ক্যাম্প করলাম। ১৬ ডিসেম্বর আমি সিলেটে ছিলাম। বিজয়ের খবর শুনে সবাই আনন্দ উৎসব করলাম।

বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি। মাতৃভূমি স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিলাম। যুদ্ধকালীন সময়ে রেডিওতে চরমপত্র শুনে খুব আনন্দ এবং উদ্দীপনা পেতাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বর্তমানে আমার গ্রাম বা সমাজের লোকেরা তেমন সম্মান করে না। তবে ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ জেলা শহর থেকে আমাদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

ধীরেন্দ্র রিছিল

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ধীরেন্দ্র রিছিল। তার বাড়ি নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বামন পাড়া। ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র ধীরেন্দ্র রিছিল মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন– ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমি গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। কয়েকদিন পর বিরিশিরিতে পাক আর্মি ক্যাম্প করে। তারা লোকজনকে মারধর এবং কোথাও কোথাও আগুন ধরিয়ে দিতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে আমরা পরিবারসহ ভারতে চলে যাই। ভারতে গিয়ে আমরা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলাম। শিবিরে নানারকম সমস্যা। ডায়রিয়াসহ নানারকম অসুখে চোখের সামনে মানুষ মারা যাচ্ছে। থাকার ঠিক

নাই, খাওয়া-গোসলের ঠিক নাই। এক মানবেতর পরিবেশ। আর রেশনের উপর চলতে কার ভালো লাগে ! সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। তখন অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। শরণার্থী জীবন থেকে বাঁচতে চাইলে দেশ মুক্ত করতে হবে, দেশে ফিরে যেতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখালাম। ট্রেনিং-এর জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ভুটান ওখানে এক মাস ট্রেনিং হল। রাইফেল, এলএমজি, মর্টার এবং গ্রেনেড ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া হল। ট্রেনিং শেষ করে ক্যাম্প করলাম রণসিংপুর, টাঙ্গাতির কাছাকাছি। ওখান থেকে আমরা পাক আর্মি ক্যাম্পে অপারেশন করি। এটা ছিল একটা এ্যামবুশ অপারেশন। সম্ভবত ২১ নভেম্বর। ৫৫ জনের একটি বাহিনী প্রস্তুত করা হল, এর মধ্যে ৩০ জন আদিবাসী গারো। অপারেশন কমান্ডার ছিলেন আদম আলী। রাত ১২টার সময় ফলইন করানো হল। যার যার ধর্মমতে ৫ মিনিট প্রার্থনা করার সময় দিলেন। রণসিংপুর বাজারের পাশ দিয়ে একটি ছোটো নদী। আমরা সারারাত নদীর পাড়ে এ্যাম্বুলেন্সে বসে আছি।

ভোরের দিকে পশ্চিম গুয়াতলা এলাকা থেকে পাক আর্মির বহর আসছে। রেঞ্জের মধ্যে এলে আমরা ফায়ার ওপেন করি। প্রথমে তারা সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু দ্রুতই আরো সৈন্য যোগ দিল। অপরদিকে আমাদের সাথেও আরো মুক্তিযোদ্ধা এবং পিছনে বিএসএফ যোগ দেয়। একটানা দুইদিন ধরে যুদ্ধ চলে। এটা ছিল দুর্গাপুরের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। আমরা না খেয়ে ছিলাম। এর মধ্যে খলিল মোড়ল নামে এক গ্রামবাসী আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসার সময় পাক আর্মির গুলিতে মারা যান। কাছাকাছি গ্রামের আমিনা ও রহিমা নামে ২ বোন আমাদের জন্য ভাত নিয়ে এসেছিলেন। তারাও মারা যান। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তিনজন নিহত হন। একজনের নাম ছিল হাবিব। পাক আর্মির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমাদের প্রথম আক্রমণেই ওদের কয়েকজন মারা যায়। এছাড়া মেজর সুলতান হাতে গুলিবিদ্ধ হন। এরপর তারা পশ্চাদপসরণ করে। অপারেশন কমান্ডার ছিলেন আদম আলী এবং কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন স্নিগ্ধেন্দু বাউল।

ক্যাম্পে মোট যোদ্ধা ছিলাম ১১৩ জন। রুটিন মাফিক টিম ভাগ করে গেরিলা অপারেশনে যেতাম। ক্যাম্প থেকে রাতে বের হতাম এবং ভোর হবার আগেই ক্যাম্পে ফিরে যেতাম। প্রায় প্রতিদিন কোনো-না-কোনো অপারেশন থাকত। বিশেষত রাজাকার-বিরোধী অপারেশনে নিয়মিত যেতাম। অক্টোবর মাসের কোনো একদিনের ভোর। চারদিকে প্রচণ্ড কুয়াশা। কাঁধের জিনিসও দেখা যায় না। পাক আর্মি অতর্কিত আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করল। আক্রমণের তীব্রতায় আমরা ক্যাম্প ছেড়ে গিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলাম। হারুন নামে একজন যোদ্ধা তার এস এল আর ফেলে যায়। এছাড়া, আমাদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র

ও ডায়রি তাদের হাতে পড়ে। কয়েকঘণ্টা পর বিএসএফ-এর সহযোগিতায় আমরা ঐ ক্যাম্প পুনরুদ্ধার করি।

১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। রেডিওতে খবর শুনলাম পাক বাহিনী সারেন্ডার করেছে। কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম ভাষায় বলা যাবে না। মিষ্টি খেলাম, গুলি ছুড়লাম। এরপর ময়মনসিংহ জেলায় ছিলাম প্রায় ৩ মাস। ওখানে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

পরে রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বললেন, যে যার কাজে ফিরে যাও। এরপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর প্রধান ভুল ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এভাবে ফিরিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সামান্য সম্মান পাওয়া যায়। বর্তমানে সম্মান পায় অর্থ বিত্ত বৈভব। এসব ছাড়া জ্ঞান বা বীরত্ব বা অন্য কোনো ভালো গুণাবলির সম্মান নেই। ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ আমাদের সংবর্ধনা দেয়া হয় উপজেলা পরিষদে। তাও মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব ফান্ড থেকে। মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ের একটি পুকুর আছে সেখানে মাছ চাষ হয়। সংবর্ধনার অর্থ সেখান থেকে আসে।

আমিন মুর্মু

আদিবাসী সাঁওতাল জাতির একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিন মুর্মু। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উজেলায় বাসুদেবপুর গ্রামে আমিনের বাড়ি। স্বাধীনতার পর তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রাইফেলস-এ চাকরি করেন। বর্তমানে অনেকটা মানসিক ভারসাম্যহীন আমিন মুর্মু এলোমেলো যে সকল কথা বললেন তাও যে গভীর হতাশা এবং ক্ষোভ থেকে তা বোঝা যায়। আদিবাসীদের অস্তিত্বের সংকটই তার এ হতাশার কারণ। তিনি এলোমেলোভাবে যেসব কথা বলেন তা অনেকটা এরকম– যুদ্ধের আগে আমাদের কথা কারো মনে ছিল না। যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের ডাক পড়ল। আমরা যোদ্ধা জাতি, রামের উত্তরসূরি। আজ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার ঘর নাই, জমি নাই, খাবার নাই, চিকিৎসা নাই, চোখে দেখিনা, ভাঙা চশমা চোখে দিয়ে থাকি। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম নিজেরা বাঁচার জন্য এবং দেশকে বাঁচানোর জন্য। দেশের মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। উপকৃত হয়েছে। অত্যাচারী পাকিস্তানিরা বিদায় নিয়েছে। কেন আজ দেশের মানুষ আমাদের বীরত্বের কথা ভুলে গেল, দেশ মনে রাখল না ?

পাকিস্তানি আমলে বাংলাকে উর্দু ভাষা করতে চাইল। এজন্য লড়াই হল। দেশ স্বাধীন হবার পর সব জায়গায় বাংলা হল। আমার ভাষার দিকে কারো খেয়াল থাকল না। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যুদ্ধ করলাম। তিনিও আমাদের দিকটা দেখলেন না। সবাই যুদ্ধ করেছে। কষ্ট স্বীকার করেছে। দেশের ঝাড়ুদার পর্যন্ত

বাঙালি। আদিবাসীরা বাঙালি না হলে কী হত ! শেখ মুজিব আমাদেরও অযথা বাঙালি বানাতে চাইলেন।

কার্তিকচন্দ্র ভূঁইমালী

আদিবাসী ভূঁইমালী সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা কার্তিকচন্দ্র ভূঁইমালী। রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার হরিদেবপুর গ্রামে কার্তিকের বাড়ি যুদ্ধাহত এই মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে মোটর সাইকেল মেকানিক হিসেবে কোনোরকমে জীবিকার সংস্থান করেন। ১৯৭১ সালে সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়া কার্তিকচন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন– ১৯৭১ সালে আমি তালাদ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এ সময় দেশে যুদ্ধ হয়ে গেল। আমরা আতংকে আছি। স্থানীয় কিছু পাকিস্তানপন্থী মুসলমান আমাদের ভারতে চলে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকে। আশপাশের গ্রামের আদিবাসী এবং হিন্দুরা আমাদের সামনে দিয়ে ভারত চলে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য আমাদের মনোবল ভেঙে দেয়। বৈশাখ মাসের কোনো এক শুক্রবার। আমরা দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। এ সময় গ্রামের আব্দুল মান্নান এসে বলল, সবাই ভারত চলে গেল, তোমরাও চলে যাও। আমরা বললাম, খাওয়া শেষ করে তারপর যাব। সে ভাতের হাঁড়ি লাথি মেরে ফেলে দিল।। তারপর ঐ দিনই ভারতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। বলতে গেলে শুধুমাত্র পরনের কাপড়ই সম্বল ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে নিয়ামতপুরের নিমদিঘী গিয়ে আশ্রয় নিলাম। স্থানীয় লোকজন কেউ ভয় দেখায়, কেউ সহযোগিতা করে। একদিন শুনলাম, আর্মি আসছে। ঐ দিনই বিল পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে গেলাম। ভারতে গিয়ে প্রথমে মালদার এক প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নিলাম। ওখান থেকে ভারত সরকার আমাদের গোবিন্দপাড়া শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যায়। ঐ শিবিরে আমরা প্রায় দশ হাজার লোক ছিলাম। এখানকার আব্দুর রাজ্জাক স্যারসহ আরো কিছু লেখাপড়া জানা ব্যক্তি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। রাজ্জাক স্যার এবং আনারুল একদিন আমার ক্যাম্পে গেলেন। তারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। আমার সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যাবার কথা বললেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। রাজ্জাক স্যার ঐ দিনই আমাকে মালদায় নিয়ে গেলেন। ওখানে রবীন্দ্র হলে এক রাত থাকলাম। পরদিন ভোর চারটার সময় গড়িতে উঠলাম। আমরা শরণার্থী শিবিরের মোট সাত জন গেলাম। রাজ্জাক স্যার গেলেন না। গেলাম শিলিগুড়ির পানিঘাটা পাহাড়ি এলাকায়। গায়ে তেমন কাপড় নেই। বলা হল সকাল পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে। সকালে কাপড় দিল। তাঁবু দিল। প্রতি তাঁবুতে ছয় জন করে থাকতে হবে। বলা হল, আজ সন্ধ্যা থেকে ট্রেনিং শুরু হবে। এটা আনুমানিক জুন মাস ছিল।

রাত-দিন ট্রেনিং চলত। এর মধ্যে একটি উচ্চতর ট্রেনিং-এর আহ্বান জানালে তাতে অংশগ্রহণ করি। ট্রেনিং কমান্ডার ক্যাপ্টেন ধীলন আমার যোগ্যতা দেখে মুগ্ধ হন। মোট ২৮ দিনের ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএলআর, স্টেনগান এলএমজি, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং হয়।

পানিঘাটা থেকে আমরা ১৫০ জনের বাহিনী এলাম বালুরঘাটে, ৫০ জন এদেশী, ১০০ জন ভারতীয় সৈন্য। কমান্ডার ছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন ধীলন ও ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী এবং বাঙালি সমীর কুমার দাস। প্রথম যুদ্ধ করি দিনাজপুরের চিরির বন্দর। চিরির বন্দরে পাক আর্মির একটি ক্যাম্প ছিল। আমরা ঐ ক্যাম্প আক্রমণ করি। ১৪ জন পাক আর্মিকে জীবিত আটক করি একজন আহতসহ। যাবার সময় তারা একটি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে যায়। যাতে আমরা আর অগ্রসর হতে না পারি।

এরপর আমরা পার্বতীপুরের একটি ক্যাম্প আক্রমণ করি। এটি ছিল একটি বিহারি অধ্যুষিত এলাকা। দুইবার আক্রমণ করেও আমরা ঐ ক্যাম্প দখল করতে ব্যর্থ হই। পরে পেছন থেকে ভারতীয় আর্মি এলে ঐ যুদ্ধের দায়িত্ব তাদের ওপর দিয়ে আমরা চলে যাই বগুড়ার দিকে। বগুড়ায় আমরা এক যুদ্ধে যোগ দেই। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় সেখানে। উভয় পক্ষই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়। রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে মানুষের লাশ পড়ে ছিল। বগুড়া থাকা অবস্থায় পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এই ঘোষণায় আমরা উল্লসিত হই।

এরপর আমরা গিয়ে থাকি বগুড়া শাহ আজিজুর রহমান কলেজে। ওখানে ১৫ দিন ছিলাম। এ সময় টহল দিতাম এবং মাঝে মাঝে রাজাকার আটক অভিযানে বের হতাম। ঐ এলাকা থেকে আমরা মোট ৭২ জন রাজাকার আটক করেছিলাম। বগুড়াতেই অস্ত্র জমা দেই। বঙ্গবন্ধু দেশে আসার পর ভারতীয় আর্মি গাড়িতে করে আমাদের রাজশাহী দিয়ে যায়। ওখান থেকে বাড়িতে আসি। বাড়ি এসে দেখলাম বাড়ি বলে কিছু নাই। গ্রামে কোনো লোকও পাচ্ছি না। পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সামাদ তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যায়। ওখানে তিন দিন থাকি। আবার বাড়িঘর তৈরি করে পরিবার দেশে নিয়ে আসি। স্কুলে আবার ভর্তি হলাম। '৭৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আনুমানিক ১৬টি ছোটো বড়ো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা একতায় থাকতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে শতকরা ৫ ভাগ লোক সম্মান ও মর্যাদা দেয়। ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ সরকারি কর্মকর্তারা অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে গেলে ঝামেলা মনে করে। এছাড়া কখনও কখনও সামাজিক অনুষ্ঠানে ডাকা হয়।

মঙ্গল মার্ডি

আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। রাজশাহীর তানোর উপজেলার দেউলা গ্রামের এই মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম নেই। এ ব্যাপারে তার কোনো আফসোস নেই। বর্তমানে নিজের কিছু জমির সাথে আধি বর্গা নিয়ে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মঙ্গল মার্ডি বলেন- ২৬ মার্চের পর একদিন কারা যেন লুহিত নগর গ্রাম পুড়িয়ে দিল। এর দুদিন পর আশপাশের কয়েক গ্রামের আদিবাসীরা আমাদের গ্রামে জড়ো হল। আগে থেকেও কিছু আদিবাসী আমাদের গ্রামে এসেছিল। একসাথে ভারতে যাবে বলে তাদের রেখে দেয়া হয়েছিল। কয়েক হাজার লোক একদিন ভোরে ভারতের উদ্দেশে অনিশ্চিত যাত্রা করলাম। আমার বয়স তখন ১৬/১৭ বছর। আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ পুরুষের হাতে তীর-ধনুক। আমার হাতেও তীর-ধনুক। সাথে একটা বস্তায় কিছু শুকনা খাবার। দুদিন ধরে হেঁটে জামুল বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। মাঝের রাতটি কাটালাম নিয়ামতপুরের মাঠে। ভারতে ঢুকলে শরণার্থী শিবিরে আমাদের আশ্রয় হল।

এর মধ্যে আদিবাসী নেতা সাগরাম মাঝি ক্যাম্পে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে অনেক কথা বললেন। তিনি বললেন, নিজ দেশ থেকে পালিয়ে এখানে শরণার্থী হিসেবে আছি। এভাবে কতদিন থাকব ! পাকিস্তানিদের দেশ থেকে তাড়াতে না পারলে দেশে ফিরতে পারব না। আর এজন্য যুদ্ধ করতে হবে। সব যুবকদের যুদ্ধে যেতে হবে। যুদ্ধে গেলাম। প্রথমে গৌড় বাগানে কয়েকদিন পিটি ট্রেনিং হল। এরপর নিয়ে গেল শিলিগুড়ি। ওখানে অস্ত্র ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএলআর, স্টেনগান, গ্রেনেড ছোড়া, ব্রিজ ভাঙার ট্রেনিং দেয়। ওখানে ২১ দিনের ট্রেনিং শেষ করে তরঙ্গপুর এলাম। এখানে সবাইকে অস্ত্র দেয়া হল। এর কয়েক দিন পর প্রথম অপারেশনে এলাম মরাগ্রাম ইসলামপুর। এটা চাঁপাই নবাবগঞ্জের মধ্যে। এখানে যুদ্ধ হল। কিছু রাজাকার ও পাক আর্মিকে আমরা হত্যা করে অস্ত্র দখল করেছিলাম। আমাদের কমান্ডার ছিল রহনপুরের কচি। এরপর আরো কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি।

১৬ ডিসেম্বর আমরা শিবগঞ্জ ছিলাম। ওখানে বিরাট যুদ্ধ হয়। তাতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর শহীদ হয়। শিবগঞ্জ থেকে নাচোল, আমনুড়া হয়ে চাঁপাই নবাবগঞ্জ গেলাম। ওখানে অস্ত্র জমা দিয়ে আমি ভারতে গেলাম বাবা-মায়ের কাছে। তাদের সাথে দেখা করে আবার বাংলাদেশে ঢুকলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লতিফ হলে থাকলাম। এরপর কয়েকদিন আমির আলী হলে থেকে বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে বাবার সাথে কৃষিকাজে লেগে গেলাম।

স্বাধীনতার পর দু-একবার মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিং এ গিয়েছি। তাদের কথাবার্তা আমার ভালো লাগেনি। তাছাড়া আমার তখন অনেক কাজ। সংসার দেখাশোনা করতে হয়। একারণেই বোধহয় মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আমার নাম ওঠেনি। সবাই জানে, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পাড়ার লোকেরাও সম্মান করে। আর না জানলেই বা কী ! সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, মরতে হয় দেশের জন্য যুদ্ধ করে মরব। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মরে যেতে পারতাম। বেঁচে আছি এটা কম কিসে ! অনেকে বলে মুক্তিযুদ্ধ করে তোমার কোনো লাভ হল না। বলি কী লাভ ? পরাধীন ছিলাম, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম। এই তো লাভ। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ও মানুষের জন্য ভালো কাজ করতে পারেনি। একতা ছিল না। যার যার স্বার্থ সে সে দেখেছে। এটাই সমস্যা। আমি ভালো আছি বাবা-মা, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে।

পল্টন হামদা

আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। রাজশাহীর তালোর উপজেলার ময়েনপুরের অধিবাসী। ১৯৭১ সালে টগবগে যুবক পল্টন হামদা। বর্তমানে নিজের সামান্য কিছু জমি আছে। মূলত অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন- ১৯৭১ সালে আমি পরিপূর্ণ যুবক। হালচাষ করি। এর মধ্যে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আমরা আদিবাসীদের যে কোনো ধরনের গোলযোগ মানেই আমাদের জন্য খারাপ খবর। ২৬ মার্চের ২/১ দিন পর পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রাম লুহিতনগরে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দিল। আমাদের আতংক বেড়ে গেল। এরপর আমরা কয়েক গ্রামের লোক মিলে একদিন ভারতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। জাসুল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকলাম, আশ্রয় নিলাম আলামপুর শরণার্থী শিবিরে।

শুকলাল মুর্মু একদিন বলল– চল মুক্তিযুদ্ধে যাব। কয়েকদিন ধরে আমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলল। এর মধ্যে একদিন সাগরাম মাঝি আমাদের শিবিরে এলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যাবার ব্যাপারে অনেক কথা বললেন। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল। এর ৩ দিন পর ট্রাকে করে আমাদের নিয়ে গেল গৌড়বাগান। ওখানে পিটি ট্রেনিং হল। কয়েকদিন পর শিলিগুড়ি নিয়ে গেল উচ্চতর ট্রেনিং করার জন্য। ওখানে ২১ দিনের ট্রেনিং হল। বিভিন্ন অস্ত্রের ট্রেনিং। রাইফেল, এসএলআর, স্টেনগান, মেশিনগান, বোমা ইত্যাদির। এরপর আমরা গেলাম তরঙ্গপুর। ওখানে আমাদের অস্ত্র দেয়া হল। আমাকে একটি রাইফেল দিল।

এরপর আমরা অপারেশনে গেলাম সরাগ্রাম ও ইসলামপুর। এটা চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায়। ওখানে আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। খুবই অসুস্থ। থাকতে পারলাম না। প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার পর আমি ক্যাম্প থেকে ফিরে গেলাম পরিবারের কাছে। এরপর আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে পারিনি।

১৬ ডিসেম্বরের ৩ দিন পর দেশে এলাম। এসে দেখলাম গ্রাম আর গ্রাম নেই। সব মাঠ হয়ে গেছে। কোনো ক্ষতিপূরণ পাইনি। মুক্তিযুদ্ধের কারণে এ এলাকার আদিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজের লোকেরা তেমন সম্মান করে না।

শুকলাল মুর্মু (মাস্টার)

আদিবাসী সাঁওতাল জাতির একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক শুকলাল মুর্মু। বাড়ি রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার ময়েনপুর গ্রামে। ১৯৭১ সালে কলেজ-পড়ুয়া যুবক। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– ১৯৭১ সালে আমি রাজশাহী কলেজের ছাত্র।। রাজশাহী থাকি। ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। ২৬ মার্চের আগে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। মিছিলে উত্তাল শহর। প্রতিদিনই মিছিল-মিটিং হয়। এরকম এক মিছিলে আর্মি এবং বিহারিরা গুলি চালায়। আমি সে মিছিলে ছিলাম। শান্তিপূর্ণ এই মিছিলে গুলি চালালে কয়েকজন আহত হয়। আমি একটি বাড়িতে আশ্রয় নিই। পরদিন রাজশাহী থেকে গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। গ্রামে এসে দেখলাম, নানারকম গুঞ্জন এবং মানুষের চোখে-মুখে আতংক। আশপাশের গ্রামের আদিবাসীরা ভারত চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী লুহিত নগর গ্রামে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিল। এ ঘটনায় আমরা এ গ্রামের লোকেরা সিদ্ধান্ত নিলাম-ভারতে চলে যাব।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কয়েক গ্রামের আদিবাসীরা দেউলা (পৌচন্দর ইউনিয়ন) গ্রামে একত্রিত হলাম। ভোরে যাত্রা শুরু করলাম। সন্ধ্যায় গিয়ে পৌছালাম নিয়ামতপুরের দীঘির হাট। কয়েক হাজার নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধা মাঠ ধরে পাশাপাশি হাঁটছি। প্রায় আধামাইল চওড়া লাইন। সকলের হাতেই পুটলি। যতটুকু সম্ভব নেয়ার চেষ্টা করেছে। ঘরবাড়ি গরু-ছাগল সবই রেখে আসতে হয়েছে। কেউ কেউ পরিচিত মুসলমান বাড়িতে গরু-ছাগল, ধান-চাল-ডাল রেখে এসেছে বা বাড়ির দায়িত্ব মুসলমান প্রতিবেশীদের হাতে রেখে এসেছে। রাতে দীঘির হাটে থাকলাম। পরদিন ভোরে জাসুল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম। কেস্ট পুকুরে এক আত্মীয় বাড়িতে উঠলাম। ৩ দিন থাকার পর গেলাম শরণার্থী শিবিরে। গাজল থানার আলমপুর শরণার্থী শিবির।

শিবিরে আমি যুবক ছেলে। ভাবছি কীভাবে দেশে ফিরে যাব ! মা আর মাটি এক। আজ সেই মাটি ছেড়ে এসেছি। শরণার্থীর অনিশ্চিত জীবন নিয়ে হতাশাগ্রস্ত। এরকম সময়ে জানতে পারলাম, মুক্তিবাহিনী গঠিত হচ্ছে এবং মুক্তি বাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছে। খবরটি আমাকে উজ্জীবিত করল, আশা জাগল। সিদ্ধান্ত নিলাম, মুক্তিযুদ্ধে যাব। বিষয়টি নিয়ে শরণার্থী শিবিরের যুবকদের সাথে আলোচনা করলাম। সিদ্ধান্ত হল, আমরা কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধে যাব। এর মধ্যে একদিন সাবেক এম,পি আদিবাসী নেতা সাগরাম মাঝি আমাদের ক্যাম্পে এলেন। যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যেতে আহ্বান করলেন। আমাদের সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এর তিনদিন পর গেলাম মালদা গৌড়বাগান ইয়ুথ ক্যাম্পে। সেখানে পিটি-প্যারেড চলল। সে বছর প্রচুর বৃষ্টির কারণে আমরা উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্য শিলিগুড়ি যেতে পারছিলাম না। বন্যা কমলে শিলিগুড়ি গেলাম। ওখানে ২১ দিনের অস্ত্র ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএল আর, স্টেনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি অস্ত্রের। আমাদের ওস্তাদ ছিল বিহারের খান বাহাদুর খান। তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের জাত ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছ। গুলি সাবধানে খরচ করবে। ট্রেনিংকালে লাথি খেয়েছি, নানাভাবে শাস্তি ভোগ করেছি তবু ত্যাগ করিনি।

ট্রেনিং শেষ করে এলাম তরঙ্গপুরে। সেখানে আমাদের অস্ত্র দেয়া হল। তরঙ্গপুর থেকে লালগোলা এলাম। ৫ দিন পর গ্রামে অপারেশনে গেলাম। চাঁপাই নবাবগঞ্জের মরাগ্রাম ইসলামপুর। ওখানে রাজাকার বিরোধী এক অপারেশনে আমরা ন'জন রাজাকার ও ২ জন পাক সেনাকে হত্যা করি। বেশ কিছু অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা এ্যাম্বুশ করেছিলাম রাস্তার উভয় পার্শ্বে। একসময় তারা আমাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেল। এ সময় তারা গুলি চালালে আমাদের পাল্টা গুলিতে পুরো বাহিনী খতম হয়।

পরের অপারেশন ছিল বাগধানী ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া। কিন্তু তথ্যদাতা আমাদের সাথে বেইমানী করেছিল। ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ল। তাদেরকে নিয়ে গেল তানোর থানা ক্যাম্পে। এদের উদ্ধার করার জন্য আমরা একটি যৌথ অভিযান চালিয়েছিলাম। কয়েক গ্রুপ মিলে চারিদিক থেকে তানোর থানা আক্রমণ করলাম। ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম গোদাগাড়ি থানা এলাকার পাকড়ি ইউনিয়নে। ওখানে বেশ কয়েকটি রাজাকার বিরোধী অভিযান চালালাম। পাকড়ি, কাঁকনহাট, গোগ্রাম প্রভৃতি এলাকা থেকে রাজাকার ধরে গণআদালতে তাদের বিচারের ব্যবস্থা হত।

১৬ ডিসেম্বর পাকড়ির পশ্চিমপাড়ায় ছিলাম। গুলি ফুটিয়ে আমরা উল্লাস করলাম। ওখান থেকে কালিগঞ্জ হয়ে রিজার্ভ বাসে করে রাজশাহী গেলাম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে উঠলাম। ওখান থেকে আবার নাটোরের তাহেরপুরে একটি অপারেশনে গিয়েছিলাম।

যুদ্ধকালীন সময়ে স্বপ্ন দেখতাম, আমার জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থাকুক। ইতিহাসে আমার নাম থাকুক, মা আর মাটির জন্য সে লড়াই করেছে। মুক্তিযোদ্ধা সবাই হতে পারেনি। অস্ত্র হাতে জীবনের বাজি ধরে সবাই যুদ্ধে যেতে পারেনি। যুদ্ধে যেতে সাহস লাগে। যারা যুদ্ধে যেতে পারেনি বা যায়নি তাদের এ সত্যটা বোঝা উচিৎ। তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের তারা প্রভূত সম্মান দিত। সমাজের লোকেরা কিছু মর্যাদা দেয়। তাছাড়া, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর উপজেলায় দাওয়াত করে আমাদের সামান্য সম্মানিত করা হয়। গেরিলা আক্রমণের সময় যখন বাংলাদেশে ঢুকতাম তখন দেশের মানুষরা যে ব্যাপক সম্মান, মর্যাদা ও সহযোগিতা দিত স্বাধীনতার পরে তা আর কোনোদিন পাইনি। আর বর্তমানে সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ৫০০ টাকা সম্মানী দিয়ে করুণা করছে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বলি, তাঁদের সম্মান পাওয়া উচিত বীরের মতো। যেমন মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদান করা হয়।

গারো মুক্তিযোদ্ধা

পৌল মানখিন

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা পৌল মানখিনের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায়। ১৯৭১ সালে তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বয়স ছিল ১৫ বছর। দেশপ্রেমিক কিশোর পৌল মানখিন মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। বর্তমান পেশা কৃষিকাজ।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পৌল মানখিন বলেন– ছোটো বেলা থেকেই দেশের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। দেশের সব খবরাখবর রাখতাম। মুক্তিযুদ্ধকালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপস্থাপনা আমাকে মুগ্ধ ও উদ্দীপিত করত। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চের পর আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে যে ভাবে উদ্বাস্তু লোকজন ভারতের দিকে যেত তা আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। দৈনিক হাজার হাজার মানুষ চলছে ভারতের দিকে। পথে এসব উদ্বাস্তু মানুষদের টাকা-পয়সা লুটপাট করত ডাকাতরা। আমরা মাঝে মাঝে এসব ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে যেতাম। এক সময় আমাদের পরিবারও ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

'৬৪ সালের দাঙ্গার সময় একবার আমরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এবার আবার যেতে হল। ডালু শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলাম। এর কয়েকদিন পর ডালু ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখালাম। এরপর আমাদের ট্রেনিং এর জন্য

নিয়ে যাওয়া হল মাদরাং পানি। ১ মাস ধরে ট্রেনিং চলল। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, এমএমজি, মর্টার, গ্রেনেড ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হল। ট্রেনিং শেষ করে এক সন্ধ্যায় ফিরে এলাম ডালুর কয়নাডুবি। রাতে বলা হল, দুয়নাকলি অপারেশনে যেতে হবে। আমাদের কোম্পানিতে ৮৪ জন ছিলাম। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ইপিআর থেকে আসা জিয়াউল হক. রাতেই রওনা হলাম বান্দরঘাটা ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু সিগনাল না পাওয়ায় ফিরে এলাম। দুদিন পর রাত ১২টায় আবার গেলাম। বৃষ্টি হচ্ছে, অবিরাম বৃষ্টি। আগস্ট মাস। ভারতীয় আর্মি কাভারেজ দিবে বলল। বোরাক নদী পার হয়ে ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। ভারতীয় আর্মি সিগনাল দিলে আমরা ফায়ার ওপেন করলাম। সারারাত ধরে গোলাগুলি চলল। আমরা তেমন আগ্রসর হতে পারছি না। আবার পিছাতেও পারছি না। আমাদের দুটো ছেলে আজিজ এবং অন্য একজনের নাম মনে পড়ছে না ; দুজনই খুব সাহসী ছিল। তারা জমির আলে দাঁড়িয়ে গুলি করছিল। দুজনই মারা গেল। আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বলে আমরা পরে প্রাপ্ত খবরে জেনেছিলাম।

যুদ্ধ যে ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত এটা আগে বুঝিনি। এই যুদ্ধে তা পুরাপুরি বুঝতে পারি। যুদ্ধে জিতলে আমাদের ভালো খাবারের অফার দেয়া হত। সে সময় ভালো খাবার একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতাম। মুক্তিযোদ্ধারা অল্প সময়ের ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান আর্মি। একটি দুর্দান্ত বাহিনী, তাদের ছিল উন্নত প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল দুর্দান্ত সাহস আর দেশপ্রেম। আমাদের এই সাহস আর দেশপ্রেমের কাছেই তারা পরাস্ত হত। অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। কোথাও পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে নিজেদের রক্ত ঝরেছে। কোথাও শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেছি।

গাজীর ভিটা অবস্থানকালে আমরা পাক আর্মি ও রাজাকারদের দ্বারা আক্রান্ত হলাম। সূর্য নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হল এবং সাথে হল আরো কয়েকজন। এরপর আমরা গুয়াতলি বড়ইকান্দি পাক হানাদার ক্যাম্প আক্রমণ করি। আমরা বিষগাঁও গ্রামে ক্যাম্প করে ভারতীয় আর্মির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতাম। শিববাড়ি ঘোষগাঁও হয়ে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করতে গেলাম। আমার কাঁধে দুটো ক্যারিয়ার একটি এলএমজি ও একটি এসএলআর। আমি নিজে এসএলআর ব্যবহার করতাম। বড়ইকান্দি ক্যাম্প আক্রমণে আমরা সফল হই।

যুদ্ধের সময় দেশে ঢুকলে দেশের মানুষ ভীষণ যত্ন এবং সম্মান করত। সহযোগিতা করত সবরকমভাবে। তাদের সহযোগিতার কারণে আমরা সফল

হতাম। আমরা কোনো অপরাধ করতাম না। কেউ করলে তার উপযুক্ত শাস্তি হত। আমাদের কোম্পানিতে আমরা কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতাম।

তেলেখালী যুদ্ধে ভারতীয় আর্মি আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দেয়। এতে আমাদের শক্তি ও সাহস অনেক বেড়ে যায়। আমরা তিনদিক থেকে ঐ ক্যাম্প আক্রমণ করেছিলাম। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ঐ ক্যাম্প দখল করি। এতে আমাদের বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা আহত-নিহত হয়েছিল। কিন্তু আমরা শত্রুপক্ষকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলাম। তেলেখালী যুদ্ধ ছিল আমার শেষ যুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর আমি হালুয়াঘাট হাইস্কুলে ছিলাম। খবর জানলাম, পাক আর্মি আত্মসমর্পণ করেছে। আনন্দে সব গুলি খরচ করে ফেললাম।

আমি একশতভাগ বিশ্বাস করতাম, দেশ স্বাধীন হবে। আমরা দেশকে স্বাধীন করবই। ভারতীয় আর্মি সক্রিয় সহযোগিতা না করলেও দেশ স্বাধীন হত। হয়ত দেরি হত। হয়ত বা দেশের অর্ধেক মানুষ এই স্বাধীনতার যুদ্ধে মারা যেত, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাকে কেউ আটকে রাখতে পারত না।

স্বাধীনতার পর ময়মনসিংহে ভারতীয় আর্মির কাছে অস্ত্র জমা দিলাম। এরপর বাড়ি এসে আবার স্কুলে ভর্তি হলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনেকেই সম্মান দেয়। তবে পাকিস্তানপন্থীরা আজও অসম্মান করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বর্তমানে মৃত্যুর পর গার্ড অব অনার দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান দেবার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের কাছে অর্থ-বিত্ত চাই না। সম্মান চাই, এটা পেলে মৃত্যুর সময় আমার কোনো আফসোস থাকবে না।

প্রাণ কুমার দ্রং

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ কুমারের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার সংরা গ্রামে। ১৯৭১ সালে ২৩ বছরের যুবক। প্রাণ কুমার দ্রং বর্তমানে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে নিজের সামান্য কৃষি জমি আর অন্যের জমিতে কঠা-ভাগা করে কোনোরকমে দিনাতিপাত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রাণ কুমার দ্রং বলেন- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের দিকে আমি আসামে ছিলাম। ঐ বছরের প্রথমদিকে আমি আসামে আমার আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাই। আসামে আমার চমৎকার দিন কাটছিল। এ সময় বাবার চিঠি পেলাম। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং আমাদের পুরো পরিবার ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকে দ্রুত চলে আসার নির্দেশ দিলেন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমি নেত্রকোনায় পরিবারের কাছে পৌছলাম। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা শুনলাম। এলাকার যুবক বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হল। সিদ্ধান্ত

নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। শত্রুকে মোকাবেলা করে দেশে ফিরতে হবে। বাবা-মায়ের কষ্ট লাঘব করতে হবে। এটা ছিল প্রধান চিন্তা। শরণার্থী শিবিরের কষ্টের জীবন। নানারকম ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

মুক্তিযুদ্ধে নাম দেবার পর ট্রেনিং-এর জন্য আমাদের নিয়ে গেল তুরা রংনাবাদ। সেখানে একমাস ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, মর্টার, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শেখানো হল। এরপর আমাদের চারদিনের জঙ্গল ট্রেনিং দিয়ে সীমান্তে অপারেশন ক্যাম্পে নিয়ে আসা হল। এখানে অস্ত্র দেয়া হল। আমাকে দেয়া হল রাইফেল।

দেশের ভেতরে অনেক গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। কমলাপুরে আমরা পাক সেনা ক্যাম্প আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে আমাদের দুজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। কিন্তু এ যুদ্ধে আমরা জয়ী হই। যুদ্ধে আমি একটি গ্রুপের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ভারতীয় আর্মির কোনোরকম সহযোগিতা ছাড়াই আমরা এ যুদ্ধ করি এবং সফল হই।

১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম।। পরে মিলিশিয়া ক্যাম্পে যোগ না দিয়ে বাড়ি চলে আসি। বাবা-মাকে আগে দেশে নিয়ে আসি। এরপর এলাকায় রাজাকার বিরোধী অভিযান পরিচালনা করি। এ সময় আমরা এলাকার বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা সক্রিয় ছিলাম। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু দেশে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের যার যার পেশায় ফিরে যেতে বললেন। এরপর আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ি এবং হাল গৃহস্থালির কাজ শুরু করি। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সামান্য সম্মান পাওয়া যায়। কেউ করে, কেউ করে না। দেশের ভালোর জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ করে দেশের কোনো লাভ হয়নি। যারা স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারা এখন দেশ চালায়। এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করেছে।

দিলীপ রিছিল

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার তেলেখালী গ্রামের আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা দিলীপ রিছিল। ১৯৭১ সালে তিনি ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। বন্ধুরা ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকায় তিনি ছিলেন এ ধারার একজন সমর্থক। বর্তমানে জিবিসি মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

দিলিপ রিছিল মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন– পড়াশোনার কারণে ১৯৭১ সালে ময়মনসিংহে ছিলাম। মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বাড়ি চলে আসি। ২৬ মার্চ গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। ২৬ মার্চের পর এ এলাকার গারো এবং হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে যেতে থাকে। এপ্রিল মাসের

দিকে স্থানীয় বাঙালিরা সংখ্যালঘুদের নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি বেড়ে যায় এবং আমাদের ভারতে চলে যাবার জন্য ভয়ভীতি দেখাতে থাকে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরিবারের সবাই ভারতে চলে যায়। যাবার সময় তেমন কিছুই নিয়ে যেতে পারিনি। তাছাড়া পরিস্থিতি এমন ছিল যে ধন-সম্পদের চাইতে জীবনের মায়া ছিল বেশি। আমার এক মামা এখানে থেকে গিয়েছিল। সে মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে চাইল না। পরে পাক আর্মি এ এলাকায় এলে তাদেরকে চাল, ডাল দিয়ে নানানভাবে সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছে। মিশনারির কারণে কিছুদিন পাক আর্মি গারো খ্রিষ্টানদের কিছু বলেনি। ভারতে গিয়ে কিছুদিন যাত্রাকোনা থাকলাম এক আত্মীয় বাড়ি। ওখান থেকে দিনপাড়া শরণার্থী শিবিরে গিয়ে উঠলাম। শিবিরে নানারকম সমস্যা জর্জরিত। ডায়রিয়াসহ নানারকম অসুখে লোকজন মারা যাচ্ছে। শরণার্থী শিবিরের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। সবসময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকতাম আর দেশে ফিরে যেতে পারব কি না।

মুক্তিযুদ্ধে যাব এমন সিদ্ধান্ত ছিল না। একদিন বন্ধুরা সব ডালু ট্রানজিট ক্যাম্পে যাচ্ছিল। আমিও তাদের সাথে গেলাম। তাদের সাথে আমিও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। এরকম আকস্মিকভাবে যুদ্ধে যোগ দেবার পর নিজের মধ্যে অন্যরকম সাহস এবং আনন্দ পাচ্ছিলাম। ডালুতে থাকলাম ১৫ দিন। এখানে পিটি-প্যারেড হল। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল তুরা রংনাবাদ ক্যাম্পে। রংনাবাদে এক মাসের অস্ত্র ট্রেনিং হল। রাইফেল, এলএমজি, মর্টার, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার কৌশলের ট্রেনিং হল। এছাড়া এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার কৌশলও শেখানো হল।

আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর-এ গেলাম। রংনাবাদ থেকে ধামালগিরি গেলাম এক সপ্তাহের জঙ্গল ট্রেনিং এর জন্য। জুলাই মাসের শেষের দিকে ধামালগিরি থেকে রংনাবাদ ফিরে এলাম। এখানে আমাদের নামে অস্ত্র ইস্যু হল। আমাকে দেয়া হল এসএমজি। ১ আগস্ট বর্ডারে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের গ্রুপে মোট সদস্য ছিলাম ৮০ জন। এর মধ্যে পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের। দাঙ্গা অপারেশনে পাঠানো হল। ভারতের ভেতর দিয়ে আমরা লক্ষ্যস্থানে গিয়ে অপারেশন না করেই ফিরে এলাম। আমাদের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং এ্যামুনিশন না থাকায় অপারেশন ব্যর্থ হল। ডালুতে ফিরে এলাম।

একদিন রাত ১২টার দিকে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের ভিতরে ঢুকলাম। উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে থেকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হবার কারণে দলের একটি অংশ ভারতে ফিরে যায়। এতে আমরা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং মনোবল কমে যায়। তাছাড়া, যারা ভারতে ফিরে যায় তাদের হাতে অধিকাংশ গুলি এবং এ্যামুনিশন থাকায়

আমরা অস্ত্রের দিক দিয়েও দুর্বল হয়ে পড়ি। তবুও আমরা আব্দুল গফুর-এর নেতৃত্বে বাকি অর্ধেক অংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করি। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে নৌকায় করে বোগাই নদী পার হলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলাম হালুয়াঘাট-নালিতাবাড়ির মাঝামাঝি একটি গ্রামে। এখানে রাতে থাকলাম। এরপর আমরা এক একদিন এক একটি গ্রামে থাকতাম আর রাতে বের হতাম অপারেশনে। এ বাহিনীতে আমরা আদিবাসী ছিলাম আনুমানিক ১০/১২ জন। এ সময় আমরা অসংখ্য চোরাগোপ্তা আক্রমণ করি। বিশেষত রাজাকার বিরোধী অপারেশন। তাছাড়া মাঝে মাঝে আমরা আর্মি ক্যাম্পে আকস্মিক গুলি ছুড়ে তাদের মধ্যে আতংক ছড়াতাম। এভাবে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমরা বেশ সাহসী হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমাদের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে আসছিল এবং নতুন গোলাবারুদ হাতে এসে পৌছাচ্ছিল না। তখন আমরা কালিগঞ্জে। একদিন পাক আর্মি ও রাজাকারদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যাই। সামান্য কিছু গোলাবারুদ নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করি। কিন্তু দ্রুত আমাদের গোলা-বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হই। এতে আমাদের বাহিনী বেশ এলোমেলো হয়ে পড়ে। এ সময় আরং রিছিল শত্রুপক্ষের গুলিতে শহীদ হন। ধরা পড়েন প্রাণকুমার নামে আরেক আদিবাসী গারো। পরে তাকেও নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। আমরা জীবিতরা ডালুতে ফিরে যাই। ইতোমধ্যে ভারতীয় আর্মি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু করেছে।

১৬ ডিসেম্বর ডালুতে ছিলাম। পরে ময়মনসিংহ মিলিশিয়া ক্যাম্পে যোগ দিই। পরবর্তীকালে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের স্ব স্ব পেশায় ফিরে যেতে বলেন। বাড়ি চলে আসি এবং পুনরায় কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে আলাদা কোনো সম্মান পেতাম না। তবে বর্তমানে ভাতা এবং মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মানের কারণে সমাজে মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে।

পংকজ রেমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা পংকজ রেমার বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায়। ১৯৭১ সালে তিনি বাঘাইতলী হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে শূকরের মাংসের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পংকজ রেমা বলেন– ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের দিকে আমি গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এই খবরে গ্রামের লোকেরা আতংকিত হয়ে পড়েছে। খবর আসছে পাক আর্মি যেখানে সেখানে মানুষ মারছে। গারো এবং হিন্দুরা এ সময় ব্যাপকভাবে ভারতে চলে

যেতে থাকে। আমাদের সামনে দিয়ে দৈনিক ভারতমুখী মানুষের লাইন। কাকরঅন্দি, সোহাগপুর, বড়ইজানি, পানিহাটা, তারানী এলাকার গারোরা ভারতে যাবার সময় পাহাড়ের উপত্যকায় তাদের উপর পাক আর্মি গুলিবর্ষণ করে। এতে কিছু লোক আহত-নিহত হয়।

এ খবর পাবার পর আমরা নতুন করে আতংকিত হয়ে উঠি। মে মাসের প্রথম দিকে আমি পরিবারসহ ভারতে চলে যাই। চাল, ডাল, কাপড়সহ কিছু গরু-ছাগল যাবার সময় নিয়ে যাই। এলাকার আরো অনেক লোক একসাথে যাচ্ছিলাম। যাবার সময় ভাবছিলাম এই অবস্থা একদিন দূর হবে। আবার দেশের মাটিতে ফিরে আসব। প্রথমে গিয়ে যাত্রাকোনা উঠলাম, তারপর ডিমাপাড়া শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলাম। ওখানে জীবিকার জন্য একটি পানের দোকান দিলাম। একদিন আচকিপাড়ার প্রদীপসহ আরো তিন চারজন গিয়ে বলল, তুমি এখানে পানের দোকান চালাচ্ছ ! ওদিকে দেশের মানুষ সব মারা যাচ্ছে। চল, দেশের জন্য যুদ্ধে যেতে হবে। তারপর ঐ দিনই দোকান বাদ দিয়ে ওদের সাথে চলে গেলাম ডাবগিরি এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখালাম প্রাথমিক মেডিক্যাল করার পর। ওখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল রংনাবাদ, তুরা এলাকায়। ওখানে আবার মেডিক্যাল করে একদিন বিশ্রাম দেয়া হল। পরদিন থেকে ট্রেনিং শুরু হল। ১ মাস ৪ দিন ধরে আমাদের ট্রেনিং চলল। বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শেখানো হল। রাইফেল, স্টেনগান, এলএমজি, ৩" মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদি। ট্রেনিং কমান্ডার ছিলেন রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া এবং প্রেমচাঁদ। ট্রেনিংকালে জেনারেল অরোরা আমাদের ক্যাম্পে একবার এসেছিলেন। এরপর জঙ্গল ট্রেনিং এর জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। তুরার ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ৪ দিন জঙ্গল ট্রেনিংয়ের পর রংনাবাদে কসম ট্রেনিং হল। এর পর পানিঘাটা মিশন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। এর মধ্যে কয়েকটি ছোটোখাটো অপারেশন করে আমরা কাশিগঞ্জে এসে শেল্টার নিলাম। বৃহস্পতিবার ভোরবেলা আমরা শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হই। কারণ, আমরা অস্ত্রে দুর্বল ছিলাম। তবু সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিরোধ করি। এ সময় আমরা ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করি। এখানে আদিবাসী গারো পরিমল দ্রং এবং আরং রিছিলসহ বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা নিহত এবং আহত হয়।

এই যুদ্ধে আমরা বাহিনীগতভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। যে যার মতো ভারতে চলে যাই। ওখানে সপ্তাহ লাগল বাহিনী নতুন করে তৈরি করতে। এরপর তেলেখালী ক্যাম্প আক্রমণে অংশগ্রহণ করি। এখানে যৌথবাহিনী অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলিতভাবে যুদ্ধ করে। দক্ষিণ-পশ্চিম-পূর্ব এই তিন দিক থেকে বিশাল বাহিনী সম্মিলিতভাবে তেলেখালী ক্যাম্প আক্রমণ করা হয়। প্রথমে আমরা সামনে থেকে আক্রমণ করি। পরে ভারতীয় বাহিনী সামনে চলে যায়।

পিছন থেকে ভারতীয় আর্মি ক্যাম্পে শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রচণ্ড যুদ্ধ। এরকম অবিরাম গোলাবর্ষণ আর কোনো যুদ্ধে করিনি। অবশেষে আমরা তেলেখালী ক্যাম্প দখল করি। পাক আর্মি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে জেনেছিলাম পাক আর্মির ২৪ জন নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা ৭ জন শহীদ হয়। আরো অনেকে আহত হয়। এই ক্যাম্প দখলের পর আমাদের আত্মবিশ্বাস ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

এরপর আমরা আর একটি বড়ো যুদ্ধ করি পশ্চিম পারোমারিতে। ১২০ জন ভারতীয় আর্মি নিয়ে আমরা এ্যাম্বুস করি। সিগনাল, ফায়ারিং, কাভারিংসহ চার ভাগে পুরো বাহিনীকে ভাগ করা হল। আমি ফায়ারিংয়ে ছিলাম। পাক আর্মির গাড়ি আসছে। প্রথমে একটি জিপ, পরে একটা ট্রাক। রেঞ্জের মধ্যে আমার সাথে সাথে আমাদের সবগুলো অস্ত্র একসাথে গর্জন করে উঠল। তারা পাল্টা আক্রমণ করার কোনো সুযোগই পেল না। পুরো বাহিনী খতম করা হল। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস ভারতে নিয়ে গেলাম।

বারোমারি থেকে আমি ছুটিতে এলাম গ্রামের বাড়ি। ১৬ ডিসেম্বর আমি বাড়িতে ছিলাম। এলাকার লোকেরা ব্যাপক আনন্দ-উৎসব করল। আর আমি ছিলাম এ উৎসবের মধ্যমণি। এরপর ময়মনসিংহে গেলাম। ভারতীয় আর্মির কাছে অস্ত্র সমর্পণ করলাম। এরপর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে থাকলাম বেশ কিছুদিন। বঙ্গবন্ধু দেশে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের যার যার পেশায় ফিরে যেতে বললেন। গ্রামে ফিরে এলাম। বাড়িতে রেখে যাওয়া আমাদের হারানো জিনিসপত্র এলাকাবাসী উদ্ধার করে দিল।

বাড়ি এসে বেকার হয়ে গেলাম। পড়াশোনাও করতে পারলাম না আর্থিক কারণে। কোনো কাজ নেই। এ সময় সরকারও আমাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নিল না। দেশকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কখনও কোনো সুবিধা নিই নি। এলাকার লোকেরা সম্মান করে। তাছাড়া ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ উপজেলায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

অরবিন্দ সাংমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার পূর্ব উৎরাইল। ১৯৭১ সালে তিনি বিরিশিরি পি.সি.এল হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে পঙ্গু অরবিন্দ সাংমা সাইকেল মেকারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন- আমাদের গ্রামের বাড়ি ছিল ধোবাউড়া থানায়। বাবা-মা সেখানেই থাকতেন। পড়াশোনার কারণে আমি আর আমার বড়ো বোন বিরিশিরি থাকতাম। দেশে যুদ্ধ শুরু হবার পর বাবা খবর

পাঠালেন দ্রুত গ্রামে ফিরে যাবার জন্য। ২৬ মার্চের কয়েকদিন পর আমি আর দিদি সাইকেলে করে গ্রামে চলে গেলাম। এর আনুমানিক সপ্তাহখানেক পর বিরিশিরিতে আর্মি এল। চারিদিকে তখন আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। আর্মিরা লোকজন পেটাচ্ছে। ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এসব খবর আমরা গ্রাম থেকে পাচ্ছি।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের পরিবার সিদ্ধান্ত নিল ভারত চলে যাবার। বাঘমারা সীমান্ত দিয়ে পার হয়ে আমরা নেলুয়াগিরিতে গিয়ে উঠলাম। ২ সপ্তাহ থাকলাম আমাদের এক আত্মীয় বাড়িতে। চারিদিকে প্রচুর বাংলাদেশী মানুষ। খুব কষ্ট করে সবাই থাকছে। মানুষের সে কষ্ট দেখার মতো নয়। এরপর আমরাও একসময় শরণার্থী শিবিরে চলে গেলাম। তখন মুক্তি বাহিনী আসেনি। শরণার্থী শিবিরের জীবন ভালো লাগে না। আমি চলে গেলাম সুনামগঞ্জ সীমান্তে এক আত্মীয় বাড়ি। সেখানেও একই অবস্থা। ওখানে এক মাস থেকে আবার বাবা-মায়ের কাছে শরণার্থী শিবিরে ফিরে এলাম। ততদিনে মুক্তিবাহিনী চলে এসেছে। তাদের সাথে আলাপ-পরিচয় হল। তারা আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিল। মুক্তিযুদ্ধে যাও, দেশের জন্য যুদ্ধ কর। দেশ মুক্ত কর। তখন মানুষের যে কষ্ট, লাঞ্ছনা তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দেশ মুক্ত করে দেশে ফিরে যাবার কোনো বিকল্প ছিল না। আমাদের শিবিরের কাছাকাছি কোনো রিক্রুটিং ক্যাম্প ছিল না। এ সময় যোগাযোগ হয় বিরিশিরির রফিক ফরাজির সাথে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তখন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। তিনি আমাকে কিছু পরামর্শ দিলেন। তাঁর কথামতো শিবিরে ফিরে এসে অনেকের সাথে কথা বললাম। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক যুবকের সাথে আলোচনা করলাম। এতে কাজ হল, অনেকে সাড়া দিলেন। ফলে, আমরা প্রায় ৪০ জনের মতো যুবক একদিনে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে নাম লেখাতে পারলাম। এর মধ্যে গারো, মুসলিম, হিন্দু সবই ছিল।

ওখানে আমরা আনুমানিক ১৫ দিন থাকলাম। ইয়ুথ ক্যাম্পে পিটি-প্যারেড চলল। এর মধ্যে লোক বাড়তে বাড়তে ১২৫/৩০ জন হয়ে গেল। একদিন মাঝরাতে আমরা মালটানা ট্রাকে করে চলে গেলাম রংনাবাদ। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় এখানে একটি উদ্বাস্তু ক্যাম্প ছিল। চারিদিকে জঙ্গল। মেডিক্যাল করা হল। এরপর আমাদের মূল ক্যাম্পে নিয়ে গেল। একদিন বিশ্রামে থাকার পর অস্ত্র ট্রেনিং শুরু হল। ২৭ দিন ধরে আমরা বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নিলাম। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, ৩″ মর্টার, ব্রিজ ভাঙা এবং মাইন অপসারণ বিষয়ে কিছু সাধারণ ধারণা দেয়া হল। অস্ত্র ট্রেনিং শেষে শপথ প্যারেড হল। এরপর একদিন বিশ্রাম দিয়ে আমাদের আনা হল বাঘমারা জাসোগ্রাম ক্যাম্পে। এটা অনেক বড়ো একটা ক্যাম্প। এখানে চারদিন থাকলাম। এখান থেকে

আমাদের অস্ত্র দেয়া হল। আমি পেলাম এসএলআর। অবশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে আমি এলএমজি ব্যবহার করতাম। ওখান থেকে হেঁটে রাঙাসরা এসে আমরা ক্যাম্প করলাম। এটা বাংলাদেশের ফারংপাড়া ক্যাম্পের বিপরীতে।

এই ক্যাম্প থেকে আনুমানিক ১০/১২ টি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। তার মধ্যে জুয়াতলী ও ধোবাউড়া এই দুটি অপারেশন ছিল বেশ ভিতরে। মাঝে মাঝে ক্যাম্পে খবর আসত পাক আর্মিরা এসে গ্রামের লোককে মারধর করছে। গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে বা মানুষের গরু-ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাৎক্ষণিক প্রতিহত করতে যেতাম। এরকম এক খবরের ভিত্তিতে আমরা পুয়াতলী গেলাম। দূর থেকে দেখছি পাক আর্মি সেন্ট্রি দিচ্ছে। আমরা পজিশন নিলাম। ফায়ার শুরু হল। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এভাবে অনেকক্ষণ ফায়ার চলার পর এক সময় দেখলাম প্রতিপক্ষ কোনো ফায়ার করছে না। আমরা সাবধানে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, তারা সরে পড়েছে। কিন্তু ঐ গ্রামের আপন দুই ভাইকে হত্যা করে রেখে গেছে।

ডিসেম্বর মাসে আমরা ধোবাউড়াতে রাতে এক অপারেশনে গিয়ে ভোরের দিকে একটা বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছি। সকলেই অপ্রস্তুত অবস্থায়। এমন সময় ফায়ার শুরু হল। যে যে অবস্থায় ছিল ঐ অবস্থায়ই হাতে অস্ত্র তুলে নিল। আমরা পাল্টা ফায়ার শুরু করলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারলাম না। পিছিয়ে চলে গেলাম বাংগাচ সীমান্তে। ওখানে ভারতীয় মেজর প্রীত এলেন। তিনি আমাদের কমান্ডার ফজলুর রহমান আকঞ্জির সাথে কথা বললেন। সিদ্ধান্ত হল অগ্রসর হতে হবে, তিনিও আমাদের সাথে আছেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম আমরা প্রায় তিনদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছি। তখন আমরা আবার পিছাতে শুরু করি। পিছনের পাহাড় থেকে বিএসএফ এক পাক আর্মিকে লক্ষ্য করে ব্যাপক ফায়ার শুরু করে। পাক আর্মি আমাদের পেছনে পাহাড়ের ঢালে শেল ফেললে আমরা সম্পূর্ণ আটকা পড়ে যাই। আমাদের কাছে সব হাল্কা অস্ত্র। এক সময় পাক আর্মি পশ্চাদপসরণ করে। অবশ্য এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষতি হয়নি।

এর পরপরই আমরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করি। সামনে ভারতীয় আর্মি। পেছনে মুক্তিবাহিনী। ময়মনসিংহে খাগডহর বিডিআর ক্যাম্প দখল অভিযানের একদিন আগে আমাকে এসএমজি দেয়া হয়। খাগডহর ক্যাম্প দখল করে আমরা ওখানে থাকলাম। ১৬ ডিসেম্বর সেখানেই ছিলাম। শহরের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে আনন্দ মিছিল করি। স্বাধীনতার পর খাগডহর ক্যাম্পে মেজর প্রীত-এর কাছে অস্ত্র জমা দেই। আমি খাগডহর থাকতেই বাবা মারা যান। এ সময় বাড়ি ফিরে এলাম। আবার স্কুলে ভর্তি হলাম। বঙ্গবন্ধু দেশে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের যার যার পেশায় ফিরে যেতে বললেন। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের একতা ভেঙে যায়।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে আগে লজ্জা পেতাম। বর্তমানে ভাতা এবং মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মানের কারণে সমাজে আমাদের মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে হত্যার প্রতিশোধ নিতে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেই। এ সময় আমরা অনেক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছি। প্রায় দুই বছর লড়াই করার পর ১৯৭৭ সালে আত্মসমর্পণ করি। কাদেরিয়া বাহিনীতে থাকা অবস্থায় এক যুদ্ধে আমার পা হারাই।

আইনল সাংমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা আইনল সাংমা। বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার কমলাবাড়ি। ১৯৭১ সালে তরুণ এ মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে অত্যন্ত দরিদ্র জীবনযাপন করছেন। নিজের কোনো জমি নেই। শারীকিভাবে অসুস্থ, চোখে ছানি পড়েছে। তবু জীবনযুদ্ধ থেমে নেই।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আইনল সাংমা বলেন- আমাদের বাড়ির পাশে বিজয়পুর ইপিআর (তৎকালীন) ক্যাম্প। যুদ্ধ শুরু হলে এখানে প্রায় প্রতিদিন ভারতের সাথে এই ক্যাম্পের গোলাগুলি হত। এ অবস্থায় আমরা পরিবারের সবাই ভারতে চলে যাই। যাবার সময় তেমন কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারিনি। সামান্য কিছু ব্যবহার্য জিনিস সাথে নিতে পেরেছিলাম। ভারতের বাঘমারা শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে উঠলাম। শরণার্থী শিবিরের কষ্টের কথা সারাজীবনে ভুলবার নয়। ডায়রিয়াসহ নানারকম রোগে প্রতিদিন লোক মারা যায়। এসব আর ভালো লাগছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিব। আগস্ট মাসের দিকে নাম দিলাম। আমরা ছিলাম, শেষ ব্যাচ। ভুটানে ট্রেনিং হল এক মাস ধরে। বিভিন্ন অস্ত্রের ট্রেনিং। রাইফেল, এসএলআর এলএমজি, মর্টার, গ্রেনেড ইত্যাদি। ভুটানে ট্রেনিং শেষে আমাদের তুরা আনা হল। তুরা ছিলাম ১৫ দিন। ওখানে অস্ত্র দেয়া হল। আমি পেলাম ৩০৩ রাইফেল।

তুরা থেকে বাংলাদেশের টাঙ্গাতি এসে ক্যাম্প করলাম। আমাদের কোম্পানিতে অধিকাংশ ছিল গারো, হাজং। অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছি। প্রায় প্রতিদিনই গেরিলা অপারেশনে বের হতাম। রাজাকার-আলবদর ধরা, পাক আর্মি ক্যাম্পে হঠাৎ গুলি ছুড়ে আসা। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ করেছি রণসিংহপুর এবং ফুল্লাগোরা।

রণসিংহপুর যুদ্ধে আমরা মক্কর টিলায় সারারাত এ্যামবুশ করে বসে থাকলাম। আমরা ১৫০ জন যোদ্ধা ছিলাম। ভোর হয়ে গেছে। আমরা চলে আসব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এরকম সময় জানা গেল পাক আর্মি আসছে। পুনরায় পজিশনে গেলাম। তারা রেঞ্জের ভেতর আসার পর আমরা ফায়ার শুরু করি। আমাদের প্রথম আক্রমণে পাক আর্মির বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। দীর্ঘসময়

ধরে এই যুদ্ধ চলে। পরে আরো মুক্তিযোদ্ধা ও বিএসএফ এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুলে অস্ত্র জমা দেই। এরপর বাড়ি চলে আসি। পরবর্তীতে তেমনভাবে আর ডাকা হয়নি। আমি সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। নিজে এবং বউ দুজন মিলে কামলা খাটি। কোনোরকমে বেঁচে আছি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেউ কেউ সম্মান করে। তবে আমি ওসব সম্মানের তোয়াক্কা করি না। দেশের জন্য রক্ত দিতে গিয়েছিলাম। কোনো লাভ-ক্ষতির চিন্তা করিনি। এখনও করি না।

পুষ্পক আরেং

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা পুষ্পক আরেং। নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বারইপাড়া গ্রামে ১৯৭১ সালে তিনি পৈত্রিক নিবাস কনিকা ছিলেন। পড়াশোনা করতেন দুর্গাপুর হাইস্কুলে। সে সময় নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পুষ্পক আরেং বলেন- যুদ্ধ শুরু হবার পর কোনো এক শুক্রবার পাক আর্মি বিরিশিরি আসে এবং ক্যাম্প স্থাপন করে। তারা লোকজনকে মারপিট করে এবং কিছু বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ তাদের ভয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। এর আগে থেকেই এলাকার হিন্দু এবং আদিবাসীরা ভারতে যাওয়া শুরু করে। এ সময় তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। আমরাও এ সময় ভারতে চলে যাই। ভারতে গিয়ে কিছুদিন বাঘমারা এক আত্মীয় বাড়িতে থাকলাম। এরপর গেলাম শরণার্থী শিবিরে। দুর্গাপুরের সন্তোষ দা (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সন্তোষ) আমাদের শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যান এবং আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। তার অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। বাঘমারা থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ভুটানে। ওখানে এক মাসের ট্রেনিং হল। থ্রিনটথ্রি রাইফেল, মার্ক ফোর রাইফেল, এলএমজি, মর্টার, গ্রেনেডসহ বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া হল। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দুই ধরনের ট্রেনিংই দেয়া হয়।

ট্রেনিং শেষ করে আমাদের নিয়ে আসা হল ডালুতে। কোম্পানিতে আমরা ১৪২ জন ছিলাম। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন হাবিবুর রহমান। আমি ছিলাম কোয়ার্টার কমান্ডার। ডালুতে আমরা প্রায় ৩ মাস ছিলাম। এখান থেকে নিয়মিত দেশের ভিতরে অপারেশনে যেতাম। আমাদের কিছু মুক্তিযোদ্ধা বিএসএফ এর আড়িয়াতলী ক্যাম্পে ছিল। পাক আর্মি পাঁচ জনকে তুলে নিয়ে যায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের উদ্ধার করব। ধমনীতলা ক্যাম্পে তাদের রেখেছিল।

আমরা ধমনীতলা ক্যাম্প আক্রমণ করি। কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধা, সাথে বিএসএফ-এর একটি অংশ। বিকাল ৪টার দিকে যুদ্ধ শুরু হয় এবং পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত থেমে থেমে যুদ্ধ চলে। অবশেষে আমরা ঐ ক্যাম্প দখল করি এবং অপহৃতদের দুজনকে আমরা জীবিত উদ্ধার করতে পারি। বাকি তিনজন মারা যায়।

আমরা প্রায় প্রতিদিন কোনো-না-কোনো অপারেশনে যেতাম। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমরা পাক আর্মিকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রাখতাম। দেশের ভেতর থেকে পাক আর্মির সহযোগী রাজাকারদের ধরে আনতাম। এসব পরিস্থিতিতে গ্রামবাসী সাধারণ মানুষেরা আমাদের ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করত। ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। অস্ত্র জমা দিয়ে ওখানে বেশ কিছুদিন থাকলাম। পরে ঢাকার রেসকোর্সে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশ হল। সেখানে বঙ্গবন্ধু বললেন, যে যার জেলায় ফিরে যাও। বাড়ি ফিরে এলাম। ১৯৭২ সালে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম। তারপর শিমুগঞ্জ মিশনে শিক্ষকতা করলাম দীর্ঘদিন। বর্তমানে টিউশনি করে কোনোরকমে চলি।

দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। দেশ মুক্ত হলে আমরা ভালো থাকতে পারব। দেশ মুক্ত হল বটে, কিন্তু আমরা ভালো নেই। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আলাদাভাবে কেউ তেমন সম্মান করে না। তবে ১৬ ডিসেম্বর এবং ২৬ মার্চে উপজেলা থেকে আমাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়।

প্রদীপ কুমার বিসিম

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রতীপের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার আচকিপাড়া গ্রামে। ১৯৭১ সালে তার বয়স ২০ বছর। ছাত্র ছিলেন মেকানিক্যাল ডিপ্লোমার। বর্তমানে এনজিও কর্মী।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন- ১৯৭১ সালে আমি ফরিদপুর মিশনারিতে মেকানিক্যাল ডিপ্লোমার ছাত্র ছিলাম। ৮ মার্চ আমি বড়ো বোনের বাড়ি ঢাকা আসি। ৯ মার্চ পল্টনে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর বক্তৃতা শুনি। তিনি সেদিন এক দিক নির্দেশক বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতা শুনে মনে হল দেশে বড়ো ধরনের একটা কিছু হতে চলেছে। ১০ মার্চ আমি ময়মনসিংহ হয়ে হালুয়াঘাট গ্রামের বাড়ি পৌঁছাই। গ্রামেও তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে। অসহযোগ আন্দোলন, আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের অবস্থা, পাকিস্তান প্রসঙ্গ সব বিষয় নিয়েই আলোচনা চলত। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমরা গ্রামের লোকেরা চিন্তা করতে পারি নাই যে দেশে যুদ্ধ হবে এবং আমাদের এখনই স্বাধীনতার লড়াই শুরু করতে হবে।

২৬ মার্চের পর থেকে দেখা গেল দলে দলে লোক ভারত চলে যাচ্ছে। হালুয়াঘাট গিয়েও একই দৃশ্য দেখলাম। বাবাকে পরিস্থিতি বললাম। তিনি খুব শক্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এটা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার মতো একটি ব্যাপার। তিনি ভারতে যেতে চাইলেন না। বললেন- কিছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাকে বললাম এটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট। পাক আর্মি বাঙালিদের হত্যা করছে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তবুও তিনি রাজি হলেন না। পরিস্থিতি তখন আরো খারাপ হচ্ছে। আশপাশের লোকজন সব ভারত চলে গেছে এবং আমরা প্রায় একা হয়ে পড়েছি। তখন তিনি মা-সহ পরিবারের এক অংশকে ভারতে যাবার অনুমতি দিলেন।

যাবার সময় গরু এবং মহিষের গাড়িতে এবং আমাদের দুটি পাওয়ার টিলার ট্রলি ছিল তাতে করে ধান, চাল, গরু, ছাগলসহ যাবতীয় ব্যবহার্য জিনিস সাথে করে নিয়ে গেলাম। আমরা উঠেছিলাম যাত্রাকোনা। ভারতের ভেতরের গ্রাম হলেও এখান থেকে কাছে। ফলে আমরা অধিকাংশ জিনিস নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তাছাড়া পথেও কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি। যাত্রাকোনা গিয়ে পাহাড়ের ঢালে থাকার জন্য ঘর নির্মাণ করছি। এ সময় কয়েকটা শেল আমাদের আশপাশে পড়ল। আমরা আরো দূরে সরে গেলাম। আমরা শরণার্থী শিবিরে উঠিনি। পাহাড়ের ঢালে ঘর করে সেখানেই ছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধে লোক নেয়া হচ্ছে। আদিবাসী ও বাঙালি যুবকরা নাম দিচ্ছে। আমরাও বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধে যাবার ব্যাপারে আলোচনা করছি। এ সময় আমার শিক্ষক মতিয়ার রহমানের সাথে দেখা হল। তিনি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যাবার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। আমাকেও বললেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে যাবার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত একটি কৌতূহল ছিল ; অস্ত্র চালনা এবং অস্ত্র সম্পর্কে জানার কৌতূহল। পাক আর্মি মারা বা স্বাধীনতার চাইতে আমার মনে তখন অস্ত্রের প্রতি কৌতূহলটাই যুদ্ধে যাবার ব্যাপারে আমাকে আগ্রহী করে তুলেছিল।

এরপর ডালুতে গিয়ে নাম লেখালাম। একরাত ডালু ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকলাম। পরদিন আমাদের নিয়ে গেল তুরা রংনাবাদ। এখানে এক মাসের ট্রেনিং হল। প্রথমে থ্রিনটথ্রি রাইফেল খোলা-লাগানো শেখানো হল। এরপর এসএলআর এসএমজি, স্টেনগান, গ্রেনেড, এন্টি পারসোনাল মাইন, এন্টি ট্যাংক মাইন ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রের উপর ট্রেনিং দেয়া হল। এরপর আমাকে এক সপ্তাহের একটি বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয়। এটি ছিল জেএল বা জুনিয়র লিডারশিপ ট্রেনিং। শেখানো হয় নেতৃত্ব। নতুন জায়গা ও নতুন পরিবেশে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হবে, জনগণের মধ্যে কীভাবে অবস্থান তৈরি করতে হবে ইত্যাদি। এছাড়া ম্যাপ রিডিং, কম্পাস রিডিং, ট্রুপস ম্যানেজমেন্ট এগুলোও ছিল। এরপর আবার এক

সপ্তাহের ব্যবহারিক জঙ্গল ট্রেনিং দেয়া হয়। এটি তুরা থেকে বেশ দূরে। গভীর জঙ্গলে নিয়ে এক সপ্তাহের খাবার সাথে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। সবকিছু এখানে নিজেকেই করতে হত।

ট্রেনিং শেষ করে ডালু থেকে পশ্চিমে এক ক্যাম্পে একরাত ছিলাম। এরপর ডালু আনা হয়। এখানে একরাত থাকার পর সিদ্ধান্ত হয় আমরা টাঙ্গাইলের মধুপুর চলে যাব। সেখানে কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে যুক্ত হব। ২০০ জন সদস্যের এক কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন আব্দুল গফুর। পুরো কোম্পানিকে আবার ৪টি উপ-কমান্ডে ভাগ করা হয়। আমি ছিলাম এ রকম একটির কমান্ডার। আমাদের কোম্পানিতে ১৫ জন আদিবাসী গারো ছিল।

ডালু ক্যাম্পে অস্ত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একজনের অস্ত্র থেকে ফায়ার হয়ে যায়। এতে কেউ আহত বা নিহত না হলেও ব্যাপারটি পুরো কোম্পানির মনোবলে আঘাত করে। আসলে আমাদের বাহিনীটি ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং লেখাপড়া না- জানা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষই ছিল বেশি। যুদ্ধ করার জন্য এদের সাহস ছাড়া আর কিছু ছিল না। এমনকি সকলে ট্রেনিংও ভালোভাবে রপ্ত করেনি। বাংলাদেশে ঢোকার জন্য আমাদের দুজন গাইড দেয়া হয়। কংশ নদী পার হয়ে আমরা বাংলাদেশে ঢুকব। পথটি ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পাক সেনারা এ পথে প্রায়ই এ্যামবুশ করে থাকে। যে কারণে ভারতীয় আর্মি শেল নিক্ষেপ করে পাক সেনাদের ব্যস্ত রাখে ; যাতে আমরা নিরাপদে পার হতে পারি। একটা ছোটো কোশা নৌকায় চেপে আমরা ৪/৫ জন করে নদী পার হচ্ছি। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে, আবার আকাশে চাঁদও আছে। সকলে নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি হঠাৎ সামনে থেকে দেখি সবাই ছুটে পালাচ্ছে। তাদের থামাতে আমি যা শিখেছিলাম সব কৌশল প্রয়োগ করলাম । কিন্তু কাজ হল না। পরে আমি নিজেও ছুটলাম। দেখি দলের একমাত্র এলএমজির আটটি ম্যাগাজিন গামছায় বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। পরে সব এক জায়গায় হয়ে জানতে চাওয়া হল কী হয়েছে ! কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। দেখা গেল, আমাদের সাতজন নেই। তাদের সন্ধান করার জন্য সবরকম সংকেত ব্যবহার করা হল। কিন্তু কোনো রিপ্লাই পাওয়া গেল না। পরে আমরা তিন কমান্ডার বসে সিদ্ধান্ত নিলাম, ফিরে যাব না। অগ্রসর হব। যদিও দলের এলোমেলো অবস্থা এবং মনোবল অনেক কমে গিয়েছে। বাহিনীতে শৃঙ্খলা এবং মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম।

এভাবে আমরা কাঁকরকান্দি পর্যন্ত পৌছলাম। এলাকাটা ছিল রাজাকার প্রধান। ফলে রাতে গ্রামে না থেকে আমরা গ্রামের পার্শ্ববর্তী এক কাশবনে আশ্রয় নিলাম। সারাদিন ঐ কাশবনে ঘাপটি মেরে থাকলাম। সন্ধ্যায় একজনের রাইফেল থেকে অসাবধানে ফায়ার হয়ে গেল। বাহিনীর সকলেই তখন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। ভাবলাম, জানাজানি যখন হয়ে গেছে তখন কিছু খাবারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা

যাক। পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে গিয়ে দু'কেজির মতো চাল পাওয়া গেল। ঐ চাল ভেজে সবাই একমুঠো করে খেয়ে পানি খেলাম। পরে ঐ গ্রামের এক গারো বাড়িতে রাতে খাবারের ব্যবস্থা হল। তারা রান্না করে কলাপাতায় মুড়ে ভাত-তরকারি পাঠিয়ে দিল। রাতে খেয়ে আবার এগুতে শুরু করলাম। ওভাবে সারারাত পথ চলতাম। ভোরের দিকে কোনো গ্রামে শেল্টার নিতাম এবং সেখানে কারফিউ মতো জারি করে দিতাম। গ্রাম থেকে কাউকে বের হতে দিতাম না। গ্রামে কেউ ঢুকলে তাকেই আমরা গ্রাম না– ছাড়া পর্যন্ত আটকে রাখতাম। এ ব্যবস্থা ছিল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল না। ফলে, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিল না। পথে কয়েকটি গ্রামে আমরা রাজাকারদের বিরুদ্ধে একশন নিয়েছিলাম। নেত্রকোনার কাছাকাছি যাবার পর আমিসহ ১৪ জন ভারতে ফিরে যাই। আমরা ফিরে আসার পর বাহিনীর অবশিষ্টরা রাজাকার ও পাক আর্মি দ্বারা আক্রান্ত হয়। শত্রুরা তাদের শেল্টার তিনদিক দিয়ে ঘেরাও করে। শত্রুর ব্যারিকেড ভেঙে অধিকাংশ বেরিয়ে আসতে পারলেও ধরা পড়েন আরং রিছিল ও পরিমল দ্রং। পরে তাদের হালুয়াঘাটে এনে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

আরং রিছিল ট্রেনিং পিরিয়ডে অসুস্থ ছিল। ফলে সে অস্ত্র ট্রেনিং ঠিকমতো নিতে পারে নি। কোনোরকমে থ্রিনটথ্রি রাইফেল চালনা শিখেছিল। তাকে আমরা আনতে চাই নি। কিন্তু সে ছিল শারীরিকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত সাহসী। সে জোর করে আমাদের সাথে চলে আসে। আবার সে অস্ত্র নিয়েছিল ভারতীয় এসএলআর বা সেমিঅটোমোটিক রাইফেল। এই অস্ত্রটির সমস্যা ছিল একটানা ৫/৭ রাউন্ড গুলি করার পর গ্যাস চেম্বার আটকে যেত। ফলে বারবার আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করতে হত। আর একবার আটকে গেলে পুনরায় ব্যবহার করা বেশ শক্ত ব্যাপার ছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে আরং রিছিলের অস্ত্রে কোনো সমস্যা হয়েছিল বলে আমরা অনুমান করি এবং সে ধরা পড়ে। আবার তার অতি আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও একটি কারণ হতে পারে।

অপরদিকে প্রাণ কুমার দ্রং দেশের মধ্যে ঢোকার পর নানাকারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। কয়েকবার ভারতে ফিরে যেতে চায়। তার সাহস বাড়াবার জন্য আমরা তাকে নিয়মিত সেন্ট্রির দায়িত্ব দিতাম। হতাশা এবং মানসিক দুর্বলতাই তার ধরা পড়ার কারণ হয়ে থাকবে।

ঐ যুদ্ধে আরো দুজন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছিল। পাক আর্মি তাদের ছেড়ে দিলে তারা ভারত ফিরে যায়। দুদিন পর তারা আবার পালিয়ে চলে আসে। পরে তাদের দেশ থেকে ধরে নিয়ে ভারতে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অনুমান করা হয়েছিল তারা শত্রুর চর হিসেবে কাজ করছে।

আমি ভারতে ফিরে যাবার পর বাবা-মা সব কথা শুনে বলল, তোমাকে আর যুদ্ধে যেতে হবে না। আমাকে পাঠিয়ে দিল বোনের বাড়ি গারো বাজার। কিন্তু সেখানে গিয়ে মন টিকল না। দুদিন পর ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ভারতীয় বাহিনী যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন আমি তাদের সাথে চলে আসি। ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। অভূতপূর্ব এক আনন্দ পেয়েছিলাম সেদিন।

১৬ ডিসেম্বরের পর ময়মনসিংহে কয়েকদিন থেকে বাড়ি চলে এলাম। এরপর আবার ফরিদপুর চলে গেলাম পড়াশোনার জন্য।

স্বাধীনতার পর দেখা গেল যে যে পদে ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সেই পদে রয়ে গেছে। যেমন হালুয়াঘাট থানার ওসি হিসেবে আগে যে ছিল পরে সেই রয়ে গেছে। ঐ একই লোককে দিয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। যেখানে একটি ব্যাপক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সকল সেক্টরে তখন দেশপ্রেমিক লড়াকু মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া উচিত ছিল। শুধুমাত্র ১ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাই যদি দেশ চালানোর দায়িত্ব নিত তাহলে দেশের অবস্থা অনেক ভালো থাকত। মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ সময় দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে স্থানীয় উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত করা যেত। তাহলে একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান বাড়ত, অন্যদিকে কাজের দক্ষতা থাকত। দেশও অনেক এগিয়ে যেত।

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি ভালো নেতা হলেও প্রশাসক হিসেবে ব্যর্থ হলেন। দেশে দুর্নীতি, অরাজকতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। দেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের তেমন মূল্যায়ন করা হল না। এ ক্ষেত্রে আওয়ামীকরণ করে দেশের ক্ষতি করা হয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়নি। তাদের ক্ষমা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাধীদের যদি এত বছর পরেও বিচার করা যেতে পারে তাহলে ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সমস্যা কোথায় ? তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী বিচার হওয়া উচিৎ। শেখ মুজিব অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও মানবদরদী মানুষ ছিলেন। আবার তিনি স্বাধীন দেশে সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ যে এক্ষেত্রে ভুল ছিল তা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাঝে দীর্ঘকাল পরিচয় দিতাম না। তবে বর্তমানে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে বিশেষ কোনো সম্মান নাই। কিন্তু স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে থাকা উচিৎ ছিল। কেন তা হল না তা আরো ভালো করে বলতে পারবেন দেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা।

মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি বিশেষ পাওনা। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অসুস্থ ও পঙ্গু

মুক্তিযোদ্ধাদের বাদে অন্যদের ভাতা না দিয়ে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত করা গেলে ভালো হত। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একই রকম ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। এক্ষেত্রে আদিবাসী-বাঙালি ভেদাভেদ করা উচিত না।

আগস্টিন সাংমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আগস্টিন সাংমা। বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ভুবনকুড়া । ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র। ১৯ বছরের যুবক। বর্তমানে মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে পরিবারের সবাই মিলে ভারতে চলে গেলাম। ২৬ মার্চের পর থেকেই আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে অসংখ্য মানুষ দৈনিক ভারতের দিকে যাচ্ছিল। প্রতিদিন নানা ধরনের গুজব এবং আতংক ছড়িয়ে যেত এসব ভারতমুখী পথচলতি মানুষেরা। এরকম পরিস্থিতিতে মা-বাবা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সামান্য কিছু ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে সীমান্তের জাকসো পাড়া উঠলাম। এক আত্মীয় বাড়ি কিছুদিন থাকার পর শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ হবে, মুক্তিযুদ্ধে লোক নেয়া হবে এটা জানার পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা হালুয়াঘাটের অনেক ছেলে একসাথে মুক্তিযুদ্ধে নাম দিলাম। নাম দেবার পর আমাদের ট্রাকে করে নিয়ে গেল তুরা, রংনাবাদ। রংনাবাদ-এর যেখানে আমাদের নিয়ে গেল, ওখানে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় শরণার্থী শিবির ছিল। ঐ এলাকাতেই আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। ট্রেনিং হল একটানা এক মাস ধরে। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদির ট্রেনিং হল। এরপর জঙ্গল ট্রেনিং এর জন্য আরো দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা ছিল গেরিলা যুদ্ধের ব্যবহারিক ট্রেনিং। বেশ কঠিন ট্রেনিং। নিজেকে রান্না করে খেতে হত। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তাও পারিনি। প্রচণ্ড জোঁক ছিল ঐ জঙ্গলে। কখন যে গায়ে ধরে যেত বোঝা যেত না। এরপর তুরা এলাম। এখানে হাতে-কলমে গ্রেনেড নিক্ষেপসহ আরো কিছু গেরিলা যুদ্ধকৌশল শেখানো হল। এরপর ব্যক্তিগত নামে অস্ত্র ইস্যু হল। আমার নামে ইস্যু হল ভারতীয় মার্ক ফোর রাইফেল।

তুরা থেকে আমাদের নিয়ে আসল ডালু বারিদাপাড়া। এখানে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি। এখান থেকে আমরা একটি পাক সেনা ক্যাম্পে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। কোম্পানি কমান্ডার নাজমুল হকের নেতৃত্বে আমরা আক্রমণ করি। গেরিলা আক্রমণ করে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত থাকলেও এখানে আমরা সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি। এটা ছিল আমাদের প্রথম যুদ্ধ। পুরোবাহিনী অনভিজ্ঞ। একসময় পাক আর্মি আমাদের তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কমান্ডার নাজমুল এদিন

দুঃসাহসী ভূমিকা নিয়ে পুরো কোম্পানিকে রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি নিজে পাক আর্মির গুলিতে শহীদ হন। আরো কয়েকজন আহত হন। সাইদ নামে একজন মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হলেও পরে উন্নত চিকিৎসা সেবার কারণে বেঁচে যান। এরপর আমাদের কোম্পানি কমান্ডার-এর দায়িত্ব নেন উইলিয়াম [বর্তমানে ডাক্তার]। আমাদের কোম্পানিতে অধিকাংশই ছিল আদিবাসী গারো যোদ্ধা। নাজমুল হকের মৃত্যুর শোককে আমরা শক্তিতে পরিণত করি। উইলিয়াম দ্রং-এর নেতৃত্বে আমরা অনেক সাহসী সব যোদ্ধা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করতাম। ডালু যাত্রাকোনা, গাছুয়াপাড়া, ঘমনি, মেনেং ইত্যাদি ক্যাম্পে। এছাড়া দেশের ভেতরে অস্থায়ী ক্যাম্প করে থাকতাম। আমাদের এরকম একটি ক্যাম্প ছিল গাছুয়াপাড়া বিএসএফ এক ক্যাম্পের পাশে, বাংলাদেশের সীমানায়। এ ক্যাম্প থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম– তেলেখালী পাক আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করব। আমাদের একটি দল এলক্ষ্যে কমান্ডার উইলিয়াম দ্রং-এর কমান্ডে অগ্রসর হচ্ছি। মেনেং শরণার্থী শিবির পার হয়েছি। এরকম সময়ে বর্তমান কয়লাডিপোর ওখান থেকে পাক আর্মি আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। এ পরিস্থিতিতে আমরা বিএসএফ এর সাথে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করলাম। সিদ্ধান্ত হল– দু'দিক থেকে আক্রমণকারী শত্রুদের পাল্টা আক্রমণ করা হবে। আমরা তখন শত্রুর প্রায় পেছন দিক থেকে অবস্থান নিয়ে নিঃশব্দে পজিশন নিয়েছি। ওদিক থেকে বিএসএফ এবং আমাদের ক্যাম্পে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা মিলে আক্রমণ শুরু করেছে। আমরা পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করি। আমাদের এ আকস্মিক আক্রমণে শত্রুসেনারা হতভম্ব হয়ে যায়। তবুও শত্রুরা ৬/৭ ঘণ্টা ধরে লড়াই চালিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। শত্রুদের সেদিন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমি সামান্যর জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণরক্ষা করি। এছাড়া বাদর কাটাতে আমরা আর একটি বড়ো যুদ্ধ করেছিলাম।

গেরিলা যোদ্ধা ছিলাম ; কোনো বিশ্রাম ছিল না। গুলির শব্দ না শুনলে ভাত হজম হতে চাইত না। ১৯৭১ সালে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছিল তারপর এত বৃষ্টি আর কখনও হয়নি। মানুষজন তো আরাম করে ঘুমাত। কিন্তু আমরা গেরিলা যোদ্ধা সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পথ চলতাম। বিরাট এলাকা চষে বেড়াতাম। কাদায় হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ক্ষয়ে গিয়েছিল।

একদিন বারোমারি আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করতে যাচ্ছি। বৃষ্টি হচ্ছে, আবার আকাশে চাঁদও আছে। সে বছর প্রচুর কাশফুল ছিল। এরকম রাতে কোনটা কাশফুল আর কোনটা নদী চেনা যায় না। দূর থেকে কাশবন আর নদী একই রকম। আমরা চলতে চলতে কাশবন মনে করে বোগাই নদীতে গিয়ে পড়লাম। আকস্মিকভাবে নদীতে পড়ে রাইফেল পানিতে পড়ে গেল। পরদিন সে রাইফেল

পানি থেকে তুলে ক্যাম্পে ফিরেছিলাম। কিন্তু আগের রাতে ঠিকই বারোমারি ক্যাম্পে গিয়ে গুলি চালিয়ে আসি। আমরা দশ/পনেরো মিনিট টানা ফায়ার করে ফিরে আসি। কিন্তু পাক আর্মি প্রায় তিনঘণ্টা ধরে গুলি চালায়। আমরা অনেক দূর থেকে তাদের গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

সর্বশেষ যুদ্ধ করি তেলেখালী। ভারতীয় আর্মি এবং মুক্তিযোদ্ধারা যৌথভাবে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাল। আমাদের বাহিনী ক্যাম্পের উত্তরদিকে অবস্থান নেয়। এটা সবচাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধে আমাদের কোম্পানির সেকেন্ড ইন কমান্ড শওকত আলী নিহত হন। তিনি ছিলেন সদা হাসি-খুশি ছেলে। তার মৃত্যুতে আমরা ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। ক্যাম্পে সেদিন ভালো খাবারের ব্যবস্থা ছিল। তেলেখালী ক্যাম্প আমরা মুক্ত করেছিলাম অনেক ত্যাগের বিনিময়ে।

যুদ্ধের সময় একমাত্র স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন করা। আমরা গারো, হিন্দু, হাজং, মুসলমান একসাথে নেচেছি, খেয়েছি, কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছি। কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা। বিভেদ, হিংসা ছিল না। সেই সম্প্রীতি আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। ভারতীয় আর্মি সরাসরি যুদ্ধে না এলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হত। তবে সময় বেশি লাগত। আমাদের ভারি অস্ত্র বা উন্নত ট্রেনিং ছিল না। তবু আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অনেক দুঃসাহসী গেরিলা আক্রমণ করেছি। সামান্য অস্ত্র দিয়ে পাক আর্মির অনেক ক্ষতিসাধন করেছি। আমরা দিনে দিনে আরো অভিজ্ঞ হয়ে উঠছিলাম।

যুদ্ধ করেছিলাম দেশকে মুক্ত করার জন্য। আজ বাঙালিরা দেশের মন্ত্রী, এমপি, বড়ো অফিসার। বাঙালি না হলেও এদেশের একজন মানুষ হিসেবে গর্ব বোধ করি। আগে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পেতাম, লজ্জা পেতাম। বর্তমানে মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও ভাতা চালু হবার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান-মর্যাদা একটু বেড়েছে। যুদ্ধের পর পর মুক্তিযোদ্ধাদের যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার খেসারত দিতে হচ্ছে। এখনও তাদের বিচার করা যায়। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কিছু চাওয়ার নেই। ভালো কিছু দেখলে ভালো লাগে। স্কুলের শিশুদের সাথে, নিজ সন্তানদের সাথে যুদ্ধের গল্প করি। তবে দেশে ভালো কিছু হয়নি বলে ঐ সব বীরত্ব গাথারকথাও পানসে লাগে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেখি, ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো লেখাপড়া শিখতে পারে না। ইন্টারভিউ ভালো দেয়ার পরেও ঘুষের জন্য চাকরি হয় না। এগুলো কষ্ট দেয়।

বকুল মারাক

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা বকুল মারাকের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ভুবনকুড়া গ্রামে। ১৯৭১ সালে যুবক বকুল

মারাক মুক্তিযুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরে। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন প্রথমে নাজমুল হক ও পরে উইলিয়াম দ্রং। বর্তমানে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ভারতে চলে যাই। প্রথমে গিয়ে জাকসোপাড়া আত্মীয় বাড়ি উঠি। পরে ওখান থেকে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিই। ভারতে আশ্রয় নেয়া সব যুবক-তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে হবে। মাতৃভূমিতে ফিরে এসে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে হবে। হালুয়াঘাটের অনেকের সাথে আমিও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। আমাদের নিয়ে গেল তুরা, রংনাবাদ। এক মাসের অস্ত্র ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএলআর, গ্রেনেড, মর্টার ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং হল। এরপর আবার সাতদিনের ব্যবহারিক জঙ্গল ট্রেনিং। এরপর আবার তুরা এলাম। এখানে কী করে গ্রেনেড ব্যবহার করতে হয় তার ওপর সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দেয়া হল। এরপর অস্ত্র দিল। আমি নিলাম মার্ক-ফোর রাইফেল। এরপর আমরা সীমান্ত এলাকার যুদ্ধ ক্যাম্পে এলাম। অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অপারেশন থাকত। গেরিলা যোদ্ধা ছিলাম। আমাদের কোনো বিশ্রাম ছিল না।

বারিদাপাড়া থাকাকালে আমরা একটি পাক সেনার ক্যাম্প আক্রমণ করি। এটা ছিল আমাদের কোম্পানির প্রথম অপারেশন। গেরিলা অপারেশন করতে গিয়ে আমরা শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যাই। এতে আমাদের কমান্ডার নাজমুল হক শহীদ হন। আরো কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর উইলিয়াম দ্রং আমাদের কোম্পানি কমান্ডার হন। তাঁর নেতৃত্বে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সর্বশেষ যুদ্ধ করি তেলেখালী। ভারতীয় আর্মি এবং মুক্তিযোদ্ধারা মিলিতভাবে আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে আমাদের সেকেন্ড ইন কমান্ড শওকত আলী শহীদ হন। কিন্তু আমরা তেলেখালী ক্যাম্প দখল করি। ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। শত্রুর আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে আমরা আনন্দে মেতে উঠেছিলাম। ময়মনসিংহে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে আসি। মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো একতা ছিল না। ফলে, এলাকার উন্নয়নে আমরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ এবং সাহসের কথা মানুষ ভুলে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে এখন তেমন সম্মান নেই।

শরচরণ সাংমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা শরচরণ সাংমা। তার বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট। ১৯৭১ সালের টগবগে তরুণ এই মুক্তিযোদ্ধা ১১ নং সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ করেন। তাঁর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন নাজমুল হক ও

ইউলিয়াম দ্রং। বর্তমানে চোখে ছানি পড়ে অসুস্থ শরচরণ সাংমা অন্যের বোঝা হয়ে বেঁচে আছেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন- ২৬ মার্চে দেশে যুদ্ধ শুরু হলে এলাকায় নানারকম গুজব ও আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া, প্রতিদিন লাইন ধরে অসংখ্য মানুষ আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে ভারতে যেত। তাদের মুখে আমরা পাক আর্মির নির্যাতনের কথা শুনতাম। তাছাড়া, আমাদের গ্রামেরও অনেকে ভারতে চলে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের পরিবারের সকলে ভারতে চলে যাই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। সামান্য কিছু ব্যবহার্য জিনিস সাথে নিতে পেরেছিলাম। জাকসো গ্রামের কাছাকাছি একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলাম। নানারকম অসুখ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ডায়রিয়ায় অনেক মারা গেল।

মে মাসের দিকে জানতে পারলাম মুক্তিযুদ্ধ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধে লোক নেয়া হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। আমাদের নিয়ে গেল তুরা রংনাবাদ। এখানে একমাসের অস্ত্র ট্রেনিং হল। রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, মর্টার, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া হল। এরপর সাতদিনের জঙ্গল ট্রেনিং দেয়া হল। এখানে ব্যবহারিকভাবে শেখানো হয় কীভাবে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। আবার আমাদের তুরায় অস্ত্র দেয়া হল।

এরপর কোম্পানি কমান্ডার নাজমুল হকের নেতৃত্বে আমরা সীমান্তের বারিঙ্গাপাড়ায় ক্যাম্প করলাম। প্রথম যুদ্ধে নাজমুল হক শহীদ হলেন। আমরা একটি পাক সেনাক্যাম্প আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম। প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয়। এরপর আমরা আরো অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমাদের কোনো বিশ্রাম ছিলনা। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অপারেশন থাকত। সর্বশেষ যুদ্ধ করি তেলেখালী। তেলেখালী পাক সেনাদের অনেক বড়ো একটি ক্যাম্প ছিল। এখান থেকে তারা নানাভাবে আমাদের উত্যক্ত করত। ভারতীয় আর্মি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত এক বিশাল বাহিনী তিনদিক থেকে তেলেখালী ক্যাম্প আক্রমণ করি। আমরা উত্তরদিকে অবস্থান নিয়েছিলাম। এই যুদ্ধটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও মারাত্মক যুদ্ধ ছিল। এখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। আমাদের কোম্পানির সেকেন্ড ইন কমান্ড শওকত আলীও এখানে মারা যান। শেষ পর্যন্ত আমরা তেলেখালী ক্যাম্প দখল করি।

১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। পরে ওখানেই ভারতীয় কমান্ডারের কাছে অস্ত্র জমা দেই। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো বাড়ি এসে নিজ পেশায় নিয়োজিত হই।

মুক্তিযুদ্ধের পরে দিন যত যেতে থাকে ততই আমাদের সম্মান কমতে থাকে, ১৯৭৫ সালের পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতাম না। বর্তমানে ভাতা এবং মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মান দেবার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে।

সুদর্শন চিরান

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ভুবনকুড়া তার বাড়ি। ১৯৭১ সালে কিশোর বয়সী এ যোদ্ধা আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং না নিয়েও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সুদর্শন চিরান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন– ১৯৭১ সালে গ্রামের সবাই যখন ভারতে চলে যায়, তখন আমাদের পরিবারও ভারতের জাকসোপাড়া শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। আমি তখন ছোটো, পরিবারের সাথে শরণার্থী শিবিরে থাকি। শিবিরে নানারকম সমস্যা। মুক্তিযুদ্ধে লোক নেয়া হচ্ছে জানতে পেরে আমিও মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং করে ফিরে এলে তাদের সাথে যোগাযোগ করি। সব সময় তাদের সাথে থাকতাম। অস্ত্র, গুলি নাড়াচাড়া করতাম। এক সময় আমাকে ক্যাম্পে রান্নার দায়িত্ব দেয়া হয়। ক্যাম্পে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতাম। মাঝে মাঝে গেরিলাদের সাথে অপারেশনে যেতাম। আবার আমাকে নানারকম খবর আদান-প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হত। সে সব দায়িত্ব পালন করতাম।

ট্রেনিং না থাকার কারণে স্বাধীনতার পর আমার নাম তালিকায় আসেনি। এ নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই। দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং বর্তমানে আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক এটাই আমার জন্য গর্বের ব্যাপার। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাকে কোথাও ডাকা হয় না। কিন্তু আমি নিজে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।

সুশীল সাংমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার জলছত্র গ্রামে। এই সাক্ষাৎকার দেবার কয়েকদিন পর তিনি মারা যান। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি কথা বলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি বেশ চাঙা হয়ে ওঠেন।

স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন– ১৯৭১ সালে আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৮/১৯ বছর । অনেক দেরিতে স্কুলে গিয়েছিলাম। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। পাক আর্মিরা বাঙালিসহ এই ভূ-খণ্ডের মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল। এপ্রিল মাসে মধুপুরে খসরুর নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। আমি যোগ দিলাম। সাথে বন্ধু ওয়াল্টার এবং বৃটিশ সাংমা। আঁমাদের রাইফেল দেয়া হল। নিয়মিত ট্রেনিং চলতে লাগল। আমরা এখানে পাক আর্মিকে বাধা দেই। প্রতিরোধ গড়ে তুলি। কিন্তু সামান্য অস্ত্র আর ট্রেনিং নিয়ে আমরা টিকে থাকতে ব্যর্থ হই। পাক আর্মির পাল্টা আক্রমণে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় আমরা তিন বন্ধু সিদ্ধান্ত

নিলাম– ভারতে চলে যাব। কাছে টাকা-পয়সা নেই। তিন জনের টাকা একত্র করে দেখা গেল ৮ (আট) টাকা হয়েছে। আমি বাড়ি থেকে একটা থলিতে করে ২/৩ কেজি চাল নিলাম। এরপর একদিন ভোরে পথ চলতে শুরু করলাম। পথে নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলাম। পথে আমরা সবাইকেই সত্যি কথা বলেছি। বলেছি ভারত যাব এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিব। কেউ সহযোগিতা করেছে, সাহস দিয়েছে। কেউ ভয় দেখিয়েছে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে উঠলাম শেরপুরের বদরামারী মিশনারিতে। রাতে মিশনে থাকলাম, খেলাম। পরদিন সকালে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে গেলাম।

ভারতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছি, কিন্তু পরিচিত কাউকে পাচ্ছি না। প্রচুর বাংলাদেশী মানুষ। আমরা তিনজন এখানে ওখানে থাকি। কখনও মিশনে কখনও শরণার্থী ক্যাম্পে খাই। দিমাপাড়াতে গিয়ে হালুয়াঘাটের একজন পরিচিত মানুষকে পাই। তিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে গেলেন। ঐ দিনই গোসল করে আসার সময় মধুপুরের কামরুজ্জামানের সাথে দেখা হল। তাকে সব কথা খুলে বললাম। পরদিন তিনি আমাদের গাছুয়াপাড়া হয়ে ডালু নিয়ে গেলেন। ডালুতে ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে যেন মুক্তি পেলাম। টেনশনমুক্ত হলাম। পরদিন দুটি গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে গেল তুরা। সেখানে ১ মাস ১৩ দিন ধরে ট্রেনিং হল। রাইফেল, এলএমজি, মর্টার, গ্রেনেডসহ বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হল। এরপর সাত দিনের জঙ্গল ট্রেনিং। এখানেই আমাদের নামে অস্ত্র ইস্যু হয়। এরপর আমরা ডালুতে এলাম। ডালু সীমান্তের কাছাকাছি আমরা ক্যাম্প করলাম। আমরা কোম্পানিতে যোদ্ধা ছিলাম ১২০ জন।

এখান থেকে আমরা প্রথম অপারেশনে যাই শেরপুর জেলার হলুদিয়া। ১৫ জনের একটি গ্রুপ পাঠানো হয়। এই গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন গিরেন। হলুদিয়ার একটি পাক আর্মি ক্যাম্পে আক্রমণ করলাম। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অপারেশনে যোগ দিতাম। বিশেষত নানারকম কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাক আর্মিকে অস্থির রাখতাম।

সর্বশেষ যুদ্ধ করি তেলেখালী। তেলেখালী অনেক বড়ো পাক আর্মি ক্যাম্প ছিল। ভারতীয় আর্মি এবং মুক্তিযোদ্ধারা মিলিতভাবে আক্রমণ করি সেখানে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত-নিহত হয়। অসংখ্য পাক আর্মি নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা ঐ ক্যাম্প দখল করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলাম। ১৬ ডিসেম্বর আমি ময়মনসিংহে ছিলাম। বিজয়ের খবর পাওয়ামাত্র আমরা গুলি ফুটিয়ে আনন্দ করলাম। প্রথমে ক্যাম্প করেছিলাম ময়মনসিংহ জুট মিলে। এখানেই মিত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র জমা দিলাম। এরপর ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ছিলাম ৩ মাস। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হল।

বাড়ি এসে আবার স্কুলে ভর্তি হলাম। কিন্তু পড়াশোনা আর ভালো লাগল না। ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভার হয়ে গেলাম।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনেকগুলো কারণ ছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে সবসময় বাবা-মায়ের চিন্তা করতাম। বাবা-মা দেশে ছিলেন। যে দেশ শত্রুর দখলে ছিল। দেশ মুক্ত করে তাঁদের কাছে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করতাম। তাছাড়া, প্রতিটি অপারেশনে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতাম যে পাক আর্মিকে পরাজিত করব। তাদের দেখাব আমরা তোমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই। বাঙালি নই কিন্তু বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি। মাতৃভূমির স্বার্থ আমার স্বার্থ।

যুদ্ধের পর কেউ কারো কথা মনে রাখল না। নেতারা সব বড়লোক হল। দেশের জন্য যুদ্ধ করলেও দেশ পরবর্তীকালে আমাদের আর মনে রাখেনি। কোনো কাজে আমাদের আর ডাকা হয়নি। যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

নিজে বর্তমানে ভালো নাই। স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেমেয়েরা দূরে থাকে। আমি একা অসুস্থ মানুষ এই বাড়িতে থাকি। একা একা ভালো থাকা যায় না।

পালখিন সাংমা (পালোয়ান)

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার পূর্বধরাটি পালখিনের বাড়ি। সুস্বাস্থের অধিকারী এই মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে পালোয়ান নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এলাকার লোকেরাও তাঁকে পালোয়ান নামে চেনে। তাঁর শরীরিক শক্তিমত্তা নিয়ে এলাকায় অনেক গল্প চালু আছে। ১৯৭৫ সালের পর কাদেরিয়া বাহিনীতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পালখিন সাংমা বর্তমানে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মধুপুর এলাকা থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। আমি ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে যাইনি। দেশে থেকে যুদ্ধ করেছি। কাদের বাহিনীর একজন হয়ে আমি যুদ্ধ করি। অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে আমাকে ভারতে পাঠানো হয়। ফলে, ১৬ ডিসেম্বর আমি ভারতে ছিলাম।

ভারতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং নিতে পারিনি বলে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আসেনি। তাতে আমার কোনো দুঃখ নাই। দেশের মানুষ আমাকে চেনে। মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশের জন্য। পাকিস্তানিরা আমাদের শোষণ-অত্যাচার করত। তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুদ্ধ করি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এলাকার লোকেরা আমাকে সম্মান করে। এটুকুই আমার জীবনে বড়ো পাওয়া।

শ্রী চীন সাংমা

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার ধরাটি গ্রামে। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। বর্তমান পেশা কৃষি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বন্ধু ধীরেন একদিন এসে বলল, দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত। এরপর আমি, ধীরেন এবং অমল এই তিন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। কীভাবে যাব এ ব্যাপারেও বিস্তারিত কথা হল। ভারতে যেতে হবে। ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে।

আষাঢ় মাসের ১০ তারিখ সকালে বাগানের ২৫টা কাঁঠাল ১২ টাকায় বিক্রি করলাম। ঐ টাকা নিয়ে বাড়িতে বললাম আত্মীয় বাড়ি যাব। আত্মীয় বাড়ি যাবার কথা বলে আমি আর অমল ভারতের দিকে যাত্রা করলাম। ধীরেন ঐদিন ভোরে আমাদের আগে আর একজনের সাথে ভারতের দিকে যাত্রা করে। পথে নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। চারাগুরি নামক এক জায়গায় গিয়ে ধীরেনের দেখা পাই। ওখানে ধীরেনরা যে বাড়িতে উঠেছিল সে বাড়িতে রাতে থাকলাম। পরদিন সকালে আবার হাঁটা শুরু করলাম। সন্ধ্যার দিকে জামালপুরের কাশিগঞ্জ চরোমির্জার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পরদিন কাশিগঞ্জ থেকে তালবাড়ি গিয়ে এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে উঠলাম। এই বাড়িতে আমাদের খুব ভালো আপ্যায়ন করা হল। এখানে বাংলাদেশ থেকে ভারতমুখী আরো কিছু যুবক ছিল। এটি ছিল সীমান্তের কাছাকাছি একটি গ্রাম। ভারত থেকে কিছু মুক্তিযোদ্ধা এই বাড়িতে এল। আমাদের সাথে কথা বলল। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, কী উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা জানতে চাইল। সব সত্যি কথা বললাম। উদ্দেশ্য বললাম, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। তারা আমাদের এই কথায় খুব খুশি হল। তারা আমাদের সাথে করে নিয়ে গেল। আমরা গেলাম ডালু, বারিঙ্গাপাড়া। এখানেই মুক্তিযুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম লেখালাম। থাকার জন্য আমাদেরকে তাঁবু দেয়া হল।

এর মধ্যে আমার কিছু আত্মীয়ের সাথে দেখা হল। আমরা তিনজন ঐ আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। এসে দেখি আমার সাথিরা সবাই ট্রেনিং-এ চলে গেছে। ফলে আমরা তিনজন দুদিন পর রংনাবাদ ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌছলাম। এখানে আমাদের নতুন করে মেডিক্যাল করা হল। পরদিন থেকে ট্রেনিং শুরু হয়। যুদ্ধ কৌশল এবং অস্ত্র ব্যবহারের উপর ২৪ দিন ট্রেনিং হল। এরপর ৪ দিনের জঙ্গল ট্রেনিং দেয়া হল। থ্রিনটথ্রি, মার্ক-থ্রি রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, এসএমজি, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ট্রেনিং হল সেখানে।

ট্রেনিং শেষ করে আমরা আবার ডালু ফিরে এলাম। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার করা হয় আনিসুর রহমান আনিসকে এবং প্লাটুন কমান্ডার কাজী নুরু। আমাদের কোম্পানিতে আমরা আদিবাসী ছিলাম ১৭ জন। আমরা প্রথম যুদ্ধ করি কামারপাড়ায়। এখানে আমরা আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করি। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত পাক আর্মি ঐ ক্যাম্প ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েকজন পাকসেনার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমি অনেক অপারেশনে অংশ নিয়েছি। দালাল রাজাকার আলবদরদের ধরা, ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া, পাক আর্মির ক্যাম্প আক্রমণ ইত্যাদি করেছি। অধিকাংশ আক্রমণে আমরা সফলতা পাই। ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ছিলাম। এরপর বাড়ি চলে আসি। পরে ধনবাড়ি ক্যাম্পে কিছুদিন ছিলাম। ওখান থেকে আমাদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনে বললেন, যে যার পেশায় ফিরে যাও। বাড়ি এসে নিজ পেশা কৃষিকাজে নেমে গেলাম।

মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে ভালো লাগে, গর্ব হয়। এলাকার লোকেরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান করে। স্বাধীনতার পর এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এলাকার উন্নয়নে কোনো যৌথ উদ্যোগ নিতে পারিনি। তবে ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে আমরা তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম।

মণিপুরী

বসুন্তকুমার সিংহ

বসুন্তকুমার সিংহ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার মাধবপুর গ্রামের আদিবাসী। চাকরি করতেন কমলগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বসন্তকুমার সিংহ ২৮ বছরের যুবক। দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন বসন্তকুমার জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বসন্তকুমার ও তার বড়ো ভাই কুঞ্জবাবু সিংহ (শহীদ মুক্তিযোদ্ধা)সহ মোট আট জন ভারতে পাড়ি জমান। ত্রিপুরার ফটিকছড়ায় সীমান্ত হয়ে ভারতে পৌঁছেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন শীলচর লোয়ার বর্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে এক মাসের গেরিলা ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। ট্রেনিংয়ে থ্রিনটথ্রি রাইফেল এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, স্টেনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ শেখানো হয়। ৪ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন বসন্তকুমার সিংহ।

ট্রেনিং শেষে জুন মাসে দেশে প্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢোকেন। পরদিন সকালে খুব স্বাভাবিকভাবে অফিসে যান। অফিসের লোকজন অবাক হয়। কারণ সবাই জানে বসন্ত ভারতে পালিয়ে গেছেন। তার একজন সিনিয়র অফিসার সে কথা জিজ্ঞেসও করেন। কিন্তু অস্বীকার করেন বসন্ত। জানান অসুস্থতার কারণে কিছুদিন অফিসে আসতে পারেননি। আসলে ট্রেনিংয়ের পর বসন্তের দেশে ফেরার মূল উদ্দেশ্য হল– পাঞ্জাবি সেনাদের অবস্থান ও গতিবিধি জানা। কিন্তু ভানুগাছ বাজারে পাকিস্তানি মেজর আজিজ খান ধরে ফেলেন বসন্ত কুমারকে। নিয়ে যান শমসেরনগর ডাক বাংলায়। বসন্ত সিংহসহ আরো কয়েকজনকে ডাক বাংলার বারান্দায় লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হয়। বসন্তকুমার ছিলেন সবার পেছনে।

সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। মেজর আজিজ এক এক করে সবাইকে প্রশ্ন করলেন কে কোন মার্কায় ভোট দিয়েছে। কেউ বললেন, খেজুর গাছে ভোট দিয়েছে, কেউ বলল লণ্ঠনে ভোট দিয়েছে। ক্ষেপে গেলেন মেজর আজিজ। উর্দুতে গালাগালি শুরু করলেন যে, আওয়ামী লীগ তবে ৭৪ ভাগ ভোট কী করে পায় ! মৃত্যুদণ্ড দিলেন ক'জনকে। অবশেষে এল বসন্তকুমারের পালা। বসন্ত ভাবলেন মরতে তো হবেই। সত্যি কথাই বলবেন। তাকে প্রশ্ন করতে তিনি স্বীকার করলেন যে নৌকায় ভোট দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তিনি ভোট দেয়া ছাড়া আর কিছু অর্থাৎ রাজনীতি বোঝেন না। মেজর 'ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়' বলে কাঁধ চাপড়ে দিলেন বসন্তের। তারপর বসন্তকে শরবত দিতে নির্দেশ দিলেন এক সেন্ট্রিকে এবং বসন্তকে বললেন, সেদিনই চাকরিতে জয়েন করতে। মেজরের কথায় সায় দিয়ে চলে এলেন এবং সে রাতেই পায়ে হেঁটে আবার রওয়ানা হলেন ভারতের দিকে। কালারার বিলের পূর্বদিকের বর্ডার ক্রস করার লক্ষ্যে কাঁঠালকান্দিতে পৌছেন। তখন বর্ষাকাল চলছিল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। কাঁঠালকান্দির চম্পা সিংহ তাঁকে ডেকে তোলেন ঘুম থেকে। চম্পা সিংহকে অনেক গভীর জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে ভারতে ঢোকার পথ পর্যন্ত এগিয়ে দেন। সারারাত হেঁটে পরদিন দুপুরে কৈলাশহর হয়ে শিলচর ক্যাম্পে পৌছেন।

মুক্তিযুদ্ধে বসন্ত সিংহ মোট তিনটি অপারেশনে অংশ নেন। প্রথম অপারেশনটি পরিচালিত হয় ৯ আগস্টে ধলাই ক্যাম্পের মাগুরছড়ায়। সে অপারেশনে তাঁর ভাই কুঞ্জবাবু সিংহও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। বসন্ত ভাইকে কাঁধে তুলে টিলায় ওঠেন। টিলার ওপর ভাইকে রেখে সহযোদ্ধাদের নিয়ে রেললাইন পুলের কাছে গিয়ে পুলটি উড়িয়ে দেন।

দ্বিতীয় অপারেশনটি চালান নুরজাহান চা বাগানে। এ অপারেশনে শত্রুসেনার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে চলে যান হাসনাবাদ চা বাগানে।

তৃতীয় অপারেশন করেন ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট জেড ফোর্সের গাইড হিসেবে। জেড ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান বসন্ত সিংহকে ক্যাম্পিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে গাইড হিসেবে নিযুক্ত করেন। জেড ফোর্স চারটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল। যথাক্রমে আলফা, ব্রাভো, চার্লি ও ডালডা। বসন্তকুমার ছিলেন ব্রাভো কোম্পানিতে। ব্রাভোর গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন হাফিজুর রহমান। তৃতীয় অপারেশনটি ডিসেম্বরে। সেটি ছিল শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জে। কলকাতায় তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির ভাষণের পর ৬ ডিসেম্বর ফোর্থ বেঙ্গলের দুই/আড়াই শ' জনের এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ অপারেশনে অংশ নেয়। বসন্তকুমারও সে অপারেশনে অংশ নেন। কিন্তু দুদিন পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ভারতের ক্যাম্পে ফিরে যান। সেখানে দশদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ট্রেনিং ক্যাম্পেই অস্ত্র জমা দিয়ে বিজয়ী হয়ে ঘরে ফেরেন। কিন্তু একা। তাঁর ভাই কুঞ্জবাবু সিংহ ফেরেননি তার সাথে। তিনি শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বসন্তকুমার পূর্বের চাকরিতে যোগ দেন। বছর দুই-তিন হল তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তার সন্তানরা গর্বিত পিতার বীরত্বে। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কতটুকু মূল্যায়ন হয়েছে সেসব প্রসঙ্গে যেতে চান না মুক্তিযোদ্ধা বসন্তকুমার সিংহ।

বাবুসেনা সিংহ

বাবুসেনা সিংহ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায় আদমপুরের উত্তর ভানুবিল গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় একজন গৃহস্থ। বর্তমানে ৫৬ বছর বয়সে বাবুসেনা স্ত্রী ও পাঁচ মেয়ে নিয়ে নিজ বাড়িতেই বাস করছেন। তিনি উত্তর ভানুবিল প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পাকসেনারা তাদের গ্রামে আসে ১৯৭১'র জুন মাসে। স্থানীয়দের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করত। বাংকার তৈরি করার জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ করাত। বাবু সেনা তখন যুবক। বয়স কম। তাই তাকে বেশি পরিশ্রম করতে হত। সিদ্ধান্ত নিলেন পালাবেন। এর মধ্যে বাংকার তৈরির কাজে অবহেলার জন্য পাকসেনারা বাবুসেনাকে নির্যাতন ও গালাগালি করে। সুযোগ বুঝে একদিন বাবুসেনা ও আরো দুজন যুবক পাকসেনাদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে ভারতে রওয়ানা দেন। ধলাই চা-বাগান সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরার কৈলাশহরে যাবার পথে বাংলাদেশের পৃথ্বিমপাশার রাজা সাহেবের সাথে দেখা হয়। তিনি বাবুসেনাকে ভারতের সেনা অফিসার বলদেব সিংহের কাছে নিয়ে যান। মেঘালয় রাজ্যের লোয়ারবনে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেন বলদেব সিংহ। বাবুসেনার সাথে তাদের সম্প্রদায়ের আরো ছিলেন কৃষ্ণকুমার

সিংহ, বিদ্যাধন সিংহ, ব্রজমোহন সিংহ, নীলমনি সিংহ, নিমাই সিংহসহ আরো কয়েকজন।

একমাসের ট্রেনিং কালে বাবুসেনা থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, হ্যান্ড গ্রেনেড, ল্যান্ড মাইন ইত্যাদির প্রশিক্ষণ নেন।

ট্রেনিং শেষে বাবুসেনা ৪ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। প্রথমে অবস্থান নেন ধলাই চা-বাগানে, পরে মৌলভীবাজারের শেরপুরে। ধলাই ক্যাম্পে অবস্থানকালে বর্ডার অতিক্রম করে বাবুসেনাসহ ১০/১২ জনের মুক্তিযোদ্ধার একটি দল পাকসেনার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। বাবুসেনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপ শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও বাগানে অপারেশন চালায়। এ গ্রুপেও বাবুসেনা ছিলেন। কিন্তু অপারেশন শেষ করে ফেরার পথে বাবুসেনা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। আশ্রয় নেন একজন চা শ্রমিকের বাড়িতে। সঙ্গীরা অসুস্থ বাবুসেনাকে ঐ চা শ্রমিকের বাড়িতে রেখে অন্য অপারেশন পরিচালনা করতে চলে যান। ২৫ দিন টাইফয়েড জ্বরে ভোগার পর কিছুটা সুস্থ হন বাবুসেনা। তারপর আশ্রয়দাতার কাছে অস্ত্র রেখে রওয়ানা হন ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু শ্রীমঙ্গল ঢোকার মুখে ধরা পড়েন রাজাকার ও পাকসেনাদের হাতে। সেখানে ১৫/১৬ দিন বন্দি ছিলেন। এই সময় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শ্রীমঙ্গল থানার ওসির কাছে সোপর্দ করে। ওসিও জিজ্ঞাসাবাদ করে, মারধর করে। তার ১০/১২ দিন পর বাবুসেনাকে নিয়ে দুজন পুলিশ শ্রীমঙ্গল পশ্চিম বাজারে হাঁটতে হাঁটতে বাবুসেনার কাছে জানতে চায় তিনি কিছু খেতে চান কিনা। কারণ তাকে মেরে ফেলা হবে। একজন পুলিশ বাবুসেনাকে এক প্যাকেট বিস্কিট কিনে দেয়, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর শেষ খাবার। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেদিন অফিসার না আসাতে বাবুসেনাকে থানার সেলে বন্দি করে রাখা হয়। যেদিন বাবুসেনাকে মেরে ফেলা হবে তার একদিন আগে দেশ স্বাধীন হয়, বাবুসেনা বেঁচে যান।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। কিন্তু তিনি তখনও শ্রীমঙ্গল থানায় বন্দি। বাইরে বিজয়ের উল্লাস শুনে বাবুসেনা আঁচ করেন যে দেশ হয়ত স্বাধীন হয়ে গেছে। তিনি চিৎকার করতে থাকেন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা থানায় প্রবেশ করে থানা হাজত ভেঙে বাবুসেনাকে বের করে আনেন।

বর্তমানে বাবুসেনা সিংহ নিজের সামান্য কিছু জমিতে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

বীরেশ্বর সিংহ

বীরেশ্বর সিংহ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ইসলামপুরের দুই নম্বর ভাণ্ডারী গাঁওয়ের অধিবাসী। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সিনিয়র ওয়ারেন্ট

অফিসার ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বীরেশ্বর নিজ বাড়িতেই স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে বাস করছেন। তার স্ত্রী ২ নম্বর ভাণ্ডারী গাঁও প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। বীরেশ্বর সিংহ ১৯৬৯ সালে রাজারবাজার সরকারি হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এপ্রিলে বাল্লা সীমান্ত ও খোয়াই হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। ট্রেনিং নেন ত্রিপুরার ওমপি নগরে। যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান। যুদ্ধে বীরেশ্বর মূলত ডিফেন্সের দায়িত্ব পালন করতেন। ডিফেন্সে থেকেই তিনি বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। এরপর পাঠানো হয় বেলুনিয়া আক্রমণে। বেলুনিয়া বিজয়ের পর অগ্রাভিযান করেন ঢাকা অভিমুখে। ঢাকায় পৌঁছেন ১৩ ডিসেম্বর। যুদ্ধকালীন সময়ে বীরেশ্বর সিংহ অগণিত সহযোগী হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মণিপুরী মৈতে সম্প্রদায়ের নীলমণি সিংহ, নীলচানদত্ত বীরেশ্বরের সহযোদ্ধা ছিলেন। সেই সময় গ্রামবাসীরা যেভাবে সহযোগিতা করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বীরেশ্বর সিংহ আজো সকৃতজ্ঞ চিত্তে সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন কোম্পানি কমান্ডার বীরেশ্বরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন শত্রু ক্যাম্পের কাছে বাংলাদেশের একটি পতাকা টাঙিয়ে দিতে। জায়গাটার নাম হবিগঞ্জের দোরাললের দক্ষিণে ভারতের বামুটিয়া। নির্দেশ পেয়ে বীরেশ্বর সিংহ বাংলাদেশের পতাকাটা রোল করে পানিতে সাঁতার কেটে সেখানে যান। তিনি শত্রু ক্যাম্পের দেড় থেকে দু'শ গজ দূরে পতাকা টাঙিয়ে চলে আসেন। কিন্তু বুঝতে পারেননি এখানে পতাকা কেন টাঙানো হল।

বুঝতে পারলেন পরদিন। কারণ শত্রুক্যাম্প থেকে যেই বাংলাদেশের পতাকাটা নামাতে আসে সাথে সাথে বীরেশ্বরদের ক্যাম্প থেকে কোম্পানি কমান্ডারের নির্দেশে গুলি করেন। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে বীরেশ্বর সিংহ যখন ঢাকার ডেমরায় আসেন তখন কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল এই ঢাকাকে আর এরকম পাওয়া যাবে না। বদলে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ঢাকার তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। শেষে বীরেশ্বর সিংহ নিজস্ব ইউনিট দ্বিতীয় বেঙ্গলে অস্ত্র জমা দেন।

যুদ্ধে যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন কিনা এ প্রসঙ্গে বীরেশ্বর সিংহ বলেন– তিনি নিজের জন্য কিছু চাননি। একটা দেশ চেয়েছিলেন, সেটা পেয়েছেন। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেসব উদ্দেশ্যের কিছুই পূরণ হয়নি। আর অন্যদিকে যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের বিচার হওয়াটা একান্ত জরুরি। কেননা তারা যুদ্ধের নয় মাসে দেশের যে ক্ষতি করেছে স্বাধীনতার এই ৩৭ বছরেও তা পূরণ হয়নি। তবে বীরেশ্বর সিংহের বড়ো প্রাপ্তি হল– তার উত্তরাধিকারীরা খুব

গর্বিত যে তাদের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। বীরেশ্বর সিংহ ঢাকার মিরপুরে যুদ্ধ করেছেন বিজয়ের আগ মুহূর্তে। সে যুদ্ধে ৪২ জন সহযোদ্ধা একসাথে হারিয়েছেন। সেখানে তাদের প্লাটুন কমান্ডারও ছিলেন। তাদের কোথায় কীভাবে সমাহিত করা হয়েছে বীরেশ্বর এসব কিছুই জানেন না। এখন যেভাবে বিজয় দিবস পালন করা হয় তা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। বীরেশ্বরের কাছে বিজয় দিবসের অর্থটা একটু অন্যরকম। বিজয় দিবস বীরেশ্বর সিংহকে স্মরণ করিয়ে দেয় ৪২ জন সহযোদ্ধা হারানোর ব্যথা।

মন্ত্রী সিংহ

মন্ত্রী সিংহ সেনাবাহিনীতে ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন নিজ বাড়ি ভানুবিল গ্রামে। একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে গ্রামটি, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার আদমপুরে ভানুবিল গ্রাম। বড়ো হয়েছেন এ ভানুবিল গ্রামেই। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে আদমপুর বাজারে একটি ওষুধের দোকান করেন। স্ত্রী এবং চার মেয়ে নিয়ে তাঁর বর্তমান জীবন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকসেনারা মন্ত্রী সিংহের গ্রাম থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় এবং রাজাকাররা কয়েকটা বাড়িতে ডাকাতি করে। মন্ত্রী সিংহের বড়ো ভাইকে মারধর করে। মন্ত্রী তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। তখন আশপাশের সব বাড়ি থেকে একজন করে ধরে নিয়ে যেত কামারছড়া ক্যাম্পে মাটি খোঁড়ার কাজ করাতে। একদিন মন্ত্রী সিংহকে ধরে নিয়ে যায়। প্রথমদিনেই পালিয়ে যান মন্ত্রী। তার সঙ্গী হয়েছিলেন বিদ্যাধন সিংহ, কৃষ্ণকুমার সিংহসহ আরো কয়েকজন। সবাই মিলে পাহাড়ি পথে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের কয়লাশহরে চলে যান। সেখানে গ্রেপ্তার হন সন্দেহমূলকভাবে। কিছুদিন বন্দি করে রাখা হয় তাদের। ব্রজেন্দ্রসিংহ ও পৃথ্বিমপাশার রাজার সহযোগিতায় মুক্ত হন জেল থেকে। সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিযুদ্ধে যাবার। ভারতের লোয়ার বন ট্রেনিং ক্যাম্পে এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ট্রেনিং ক্যাম্পে থ্রিনটথ্রি, এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি, গ্রেনেড, ডিনামাইট, পিস্তল ইত্যাদি চালনা শেখেন। ট্রেনিং ক্যাম্পে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের আরো ছিলেন নিমাই সিংহ, নীলমণি সিংহ প্রমুখ। ৩ নম্বর কোম্পানিতে ছিলেন রবীন্দ্র সিংহ, বিদ্যাধন সিংহ, কৃষ্ণকুমার সিংহও বাবুসেনা সিংহ ব্রজমোহন সিংহ।

ট্রেনিং শেষ হয় সেপ্টেম্বরের দিকে। ট্রেনিং শেষে ৪ নম্বর সেক্টরাধীন ধলাই ক্যাম্পে অবস্থান নেন। অক্টোবরের শেষের দিকে প্রবেশ করেন বাংলাদেশে। পাত্রখোলা চা বাগান, মাধবকুঞ্জ, কমলপুর সীমান্ত। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানও সে এলাকাতেই যুদ্ধ করেন। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান শহীদ হওয়ার কিছুদিন পর

মন্ত্রী সিংহ আহত হন। তার বাম পায়ে গুলি লাগে। আহত অবস্থায় মন্ত্রী সিংহকে আগরতলা নিয়ে যান ভারতীয় সেনা সদস্যরা। সেখানেই তার চিকিৎসা হয়।

মন্ত্রী সিংহ ২১ থেকে ২৫টি অপারেশনে অংশ নেন বলে জানান। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ একটি অপারেশন হল– ২ নভেম্বর ১৯৭১ সালে পাথরখোলা অপারেশন। ধলাই নদী ব্রিজের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থান নিয়েছিলেন তারা। হঠাৎ টের পান রাজাকার ও পাকসেনারা তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। তখন মন্ত্রী সিংহের দল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাসতে ভাসতে অনেক পথ অতিক্রম করে। শত্রুর নাগালের বাইরে এসে নদী থেকে ডাঙায় ওঠেন তারা। তখন স্থানীয় গ্রামবাসীরা পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়ই ক্যাম্পে ফেরেন।

কমলগঞ্জ মুক্ত করার সময় শত্রুসেনাদের একটি ট্রাক ধ্বংস করেন মন্ত্রীরা। ট্রাকের সাথে প্রায় ২৫ জন পাকসেনাকেও হত্যা করতে সমর্থ হন সে সময়।

যুদ্ধের সময় স্বপ্ন দেখতেন দেশের জন্য কিছু করার। সে কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে দ্রুত সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। সেনাবাহিনী থেকে ফেরার পর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ছিলেন ১০ বছর। বর্তমানে ওষুধের দোকান করেন সংসারের প্রয়োজনে।

যুদ্ধে সাতজন সহযোদ্ধাকে হারিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ফিরোজের কথা মনে পড়ে খুব। দেশ স্বাধীন হওয়ার ১০ দিন আগে মন্ত্রীরা তাদের এলাকা পাথরখোলা সীমান্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন, যুদ্ধ শেষে সে বাংলাদেশ গড়া হয়নি। এখনো পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রতাপ চন্দ্র সিংহ

প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান প্রতাপ সিংহ পেশাগত জীবনে ছিলেন স্কুল শিক্ষক। জন্ম ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯। বড়ো হয়েছেন নিজ গ্রাম ভাণ্ডারী গাঁওয়ে। ডাক-কর্মধা, উপজেলা-কুলাউড়া, জেলা-মৌলভীবাজার। শিক্ষকতা পেশা থেকে ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে অবসর নেন। ২ ছেলে ১ মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। বড়ো ছেলে সরকারি চাকুরে, মেয়ে ডিগ্রি শ্রেণীর ছাত্রী এবং ছোটো ছেলে ইলেক্ট্রনিক মেকানিক। প্রতাপ চন্দ্র লেখাপড়া করেছেন ললধরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আলী আমজাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক এবং কুলাউড়া মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

১৯৭১-এ বাইশ বছরের তরুণ প্রতাপ চন্দ্র পাকিস্তানিদের কলোনিয়ালতন্ত্র থেকে দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকায় তাঁর মনোজগতে স্থির ছিল শোষণমুক্ত এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। তাই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার দুই-তিন মাস পর মে মাসের শেষ অথবা জুন মাসের প্রথমদিকে প্রতাপ চন্দ্র সিংহ সঙ্গী সনাতন সিংহ, লৈরীজাউ সিংহ, ললিত সিংহসহ মোট চারজন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে ভারতে পাড়ি জমান। এদের মধ্যে সনাতন সিংহ যুদ্ধে শহীদ হন এবং বাকি দুজন যুদ্ধের পরে ভারতের চলে যান। মড়ইশরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ট্রেনিং সমাপ্ত করেন ত্রিপুরায়, কয়লাশহরের টিলাবাজারে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদকাল ছিল একমাস। ট্রেনিংকালে থ্রিনটথ্রি রাইফেল, ২" মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড, এলএমজি, স্টেনগান ইত্যাদি অস্ত্র চালনা শেখেন। ট্রেনিং শেষে চাতলাপুর, কয়লাশহর এসব ক্যাম্পে অবস্থান নেন। চাতলাপুর এলাকাটি মুক্ত এলাকা ছিল। সেখান থেকে দেশে ঢুকে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করে আবার সাব ক্যাম্পে ফিরে যান। অক্টোবরে প্রতাপ সিংহ কোম্পানির সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং দেশেই ক্যাম্প স্থাপন করে অপারেশন পরিচালনা করেন। যেখানে তাঁদের ক্যাম্প ছিল তার স্থানীয় নাম ছিল কুকীর্তন বা ট্যাপা। এই এলাকাকে আমরা কালাইগিরী নামে জানি।

তাদের কোম্পানি ৪ নম্বর সাব সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছে। সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন হামিদ। যুদ্ধের শেষ তিন মাসে প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নিয়েছেন। তবে কয়টি সে সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না। উল্লেখযোগ্য স্মৃতি জানতে চাইলে তিনি জানান, কর্মধা ইউনিয়ন কার্যালয়ে রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সিকিউরিটি খবর দিল যে, রাজাকাররা দুপুরের খাবার খেতে গিয়েছে কিন্তু তাদের অস্ত্রগুলো ইউনিয়ন কার্যালয়ে রেখে গিয়েছে। তখন প্লাটুন কমান্ডার গফুর আহমদের নেতৃত্বে প্রতাপ চন্দ্রসহ আরো কজন মুক্তিযোদ্ধা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় রেইড করে। সেখানে ৫/৭টা থ্রিনটথ্রি রাইফেল পাওয়া যায়। এগুলো মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে যান । এমনি আরো অনেক ঘটনা রয়েছে যার অনেক কিছুই এখন প্রতাপ চন্দ্র সিংহ স্মরণ করতে পারেন না। তবে স্থানীয় গ্রামবাসী ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছিল অভূতপূর্ব। অপারেশন সম্পন্ন করে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন। দুই/তিন দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। তারপর অবস্থা বুঝে কৃষকের ছদ্মবেশে লোকালয়ে আসতেন। স্থানীয়দেরকে প্রশ্ন করে পাকসেনাদের অবস্থান জানতে চাইতেন। দু-একজন ছাড়া মোটামুটি সবাই খুব আগ্রহ করে সহযোগিতা করতেন। প্রতাপ চন্দ্র সিংহ মনে করেন, সাধারণ মানুষের এই যে পূর্ণ সহযোগিতা, এটা যদি না থাকত তাহলে এত দ্রুত দেশ স্বাধীন হওয়া সম্ভব হত না।

তার অনেক স্মৃতির মধ্য থেকে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি হল– বর্তমান বিআইটিসির পার্শ্বে মোহনপুর চা বাগানে । রাতের বেলা প্রতাপদের কাছে খবর এল যে সেখানে একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তখন ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল মোহনপুর চা বাগানে যান। প্রতাপ ছিলেন ওই দলের লিডার। যাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল তিনি ছয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন। এই ঘটনার কথা বলতে বলতে প্রতাপ চন্দ্রের চোখ সজল হয়ে উঠছিল বারবার। যাহোক ধর্ষককে ধরা হল এবং শাস্তিস্বরূপ মেরে ফেলা হল। প্রতাপ চন্দ্রের ভাষায়, "যারা রাজাকার বা দেশদ্রোহী ছিল তাদের মধ্যে যারা বিশেষ করে নারী নির্যাতন করেছে তাদের আমি ক্ষমা করি নাই। আমার অপারেশনের মধ্যে এ রকম যতগুলো ঘটনা ঘটেছে কোনো ধর্ষককেই আমি ক্ষমা করিনি।"

পাক বাহিনীর কবল থেকে কোনো এলাকা মুক্ত করতে গিয়ে মুক্তিবাহিনী এবং পাক বাহিনী দু'পক্ষেরই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এমনটা বেশি হয়েছে চাতলাপুর এলাকায়। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারও শহীদ হয়েছেন। সব অপারেশনে নয়, ৩টা কি ৪টা অপারেশনে পাক বাহিনীর বেশ ক্ষতিসাধন করেছে প্রতাপের বাহিনী। প্রতাপ চন্দ্র সিংহের বাবা, লৈরীজাও সিংহের বাবা, ললিত সিংহের বাবা এবং আরো দুই/তিন জন হিন্দু বাঙালিকে ধরে রবির বাজার পাকবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। এর আগেও কর্মধা ইউনিয়ন কার্যালয়ে রাজাকাররা নির্যাতন করেছে। এমনকি গণহত্যার ঘটনাও ঘটেছে রবির বাজারে। রিকশাচালক ছগীর আলী, ডাক্তার প্রমথ বাবু, অক্ষয় বাবু এরা গণহত্যার শিকার। নময় ও অক্ষয় বাবুকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়।

যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল তখন প্রতাপ চন্দ্র সিংহ স্বপ্ন দেখতেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে গরিব মেহনতি মানুষের রাজত্ব কায়েম হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এটাই ছিল প্রতাপ চন্দ্র সিংহের মূল স্বপ্ন। এ স্বপ্নই লড়াই করতে তাকে উদ্দীপনা যোগায়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি। মাত্র ৯ মাসেই দেশ স্বাধীন হবে। তিনি ভেবেছিলেন যুদ্ধটা আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

১৬ ডিসেম্বরে প্রতাপ চন্দ্র সিংহসহ পুরো কোম্পানি আলী আমজাদ নবাব বাড়িতে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হল। এখন সবার বাড়ি ফেরার পালা। কয়লাশহর চেকপোস্টে অস্ত্র জমা দেন। আলী আমজাদ গার্লস হাইস্কুলে (বর্তমানে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) পাকবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। তখন সময় সকাল ৮টার মতো। এক পার্শ্বের একটা ঘরে পাঁচ/ছয়টা এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন ছিল। ঘরে বেশ কয়েকজন বসে গল্প করছিল। বাকিদের রেখে দুজন ক্যাম্পে এসে খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়ায়। হঠাৎ বিস্ফুরণের শব্দ শুনতে পেল সবাই। জানা গেল, ওই ঘরে রাখা এন্টি ট্যাঙ্কগুলো বিস্ফুরিত হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেন সকরুণ এক দৃশ্য। যেখানে ঘর ছিল সেখানে বিরাট এক গর্ত। আর যেসব মুক্তিযোদ্ধারা ওই ঘরে বসে গল্প

করছিলেন তদের কেউই নেই। কতজন ছিল তারও কোনো হিসাব নেই। মৌলভীবাজার শহীদ মিনারে শহীদদের তালিকায় এই শহীদদের নাম আছে।

মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছি ...। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল এখনো পর্যন্ত স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস লেখা হয়নি। এটা একটা বড়ো ব্যর্থতা এবং এটাকে আমি দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য বলব। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত যে দলই ক্ষমতায় এসেছে তাদের দলীয়করণের কারণেই স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসটা এখনো পর্যন্ত লেখা হয়নি।"

কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে প্রতাপ চন্দ্র সিংহ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন সে স্বপ্নের ছিটেফোঁটাও বাস্তবতার মুখ দেখেনি। স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়া তো দূরের কথা, উল্টোটাই ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়েও প্রতাপ চন্দ্র সিংহের অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু তিনি সেগুলো উচ্চারণ করতে চান না।

মনমোহন সিংহ

মনমোহন সিংহ পেশায় একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার গাজিপুরের ভুবনখোলাবাগ গ্রামে। শৈশব সেখানেই কাটিয়েছেন। লেখাপড়া করেন হালহালি জুনিয়র হাইস্কুলে (ভারত) হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত। ভুবনখোলা গ্রামটি সীমান্তবর্তী হওয়ায় স্কুলে যাতায়াতে কোনো সমস্যা হয়নি মনমোহন সিংহের। বর্তমানে মনমোহন সিংহের বয়স প্রায় ষাট বছর হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পূর্ণ যুবক। বয়স বড়োজোর ২৩/২৪ বছর।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই পাক আর্মি তাদের গ্রামে ঢুকে পড়ে। সব মানুষ আতংকিত হয়ে ভারতে পালাতে শুরু করে। কে হিন্দু, কে মুসলিম আর কে মণিপুরী কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মনমোহন তখনও পালাননি। তার মতো আরো কয়েকজন যুবকও রয়ে গিয়েছিল। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষদিকে পাকসেনারা রাজাকারদের সাথে নিয়ে এল তাদের বাড়িতে। সময় তখন সকাল ১১টা। সবার আগে ধরল মনমোহনের কাকাকে। তারপর একে একে হাতিন কূলচন্দ্র, বাণী সিংহ, কৃষ্ণমোহন, লুখাই– এদের সবাইকে ধরে চুনারুঘাট নিয়ে খোয়াই নদীর পাড়ে বেয়োনেট চার্জ করে মেরে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। পরদিন সকালে মনমোহন ও আরো কয়েকজন খোয়াই নদীর পাড়ে যান স্বজনদের খোঁজে। একমাত্র বাণী সিংহ ছাড়া আর কাউকেই জীবিত পাওয়া যায়নি। বাণী সিংহ উলঙ্গ অবস্থায় আহত হয়ে পড়েছিলেন।

বন্ধু কাইয়ুম ও মনমোহন সিদ্ধান্ত নিলেন দেশের এ অবস্থায় এখানে থাকা ঠিক হবে না। কাইয়ুম ও মনমোহন আরো ক'জনকে সংগ্রহ করলেন এবং যুদ্ধ

করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন সকালে আবু মিয়া নামে একজন এল মনমোহন সিংহকে ডাকতে। তার কথা– মনমোহনকে তার সাথে যেতেই হবে।

পরিকল্পনা হল আবু মিয়া দুজন পাক আর্মিকে সকালে খাবারের দাওয়াত দেবে এবং তাদের মেরে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী টিলাবাড়ি এলাকায় আবু মিয়ার বাসায় দুজন পাঞ্জাবি সৈনিককে দাওয়াত করে আনা হল। খবর পেয়ে মনমোহনসহ আরো সাত/আটজন সঙ্গী ওঁৎপেতে রইলেন। এদের মধ্যে আবু, মতিলাল, সুরুজ'র নাম স্মরণ করতে পারেন মনমোহন। দুই সৈনিককে চা-নাস্তা খাওয়ানো হল। চা-নাস্তা শেষে অস্ত্র পাশে রেখে আয়েশে গল্প করছিল। এ সময় পাশের ঘরে ওঁৎ পেতে থাকা মনমোহন ও সঙ্গীরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেড়ে নিল দুজনের অস্ত্র। তারপর ঝটপট দুজনকে বেঁধে ফেলা হল। দুজনের গায়ে দড়ি বেঁধে টেনে-হেচড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে গেল। খবর ছড়িয়ে পড়ল যে কয়েকজন যুবক দুজন পাকসেনাকে ধরে এনেছে। খোয়াই থানার ওসি এলেন। তিনি ঘটনা শুনে খুব হাসলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও খবর শুনে হাসলেন। হাসলেন মুখ্যমন্ত্রী শচীন সেন, মন্ত্রী বাবু বন্দিয়া, সিপিআইএম নেতা দশরথ দেব বর্মা। দুজনকে খোয়াই হাসপাতালে রেখে মনমোহনের দল দুই পাকসেনার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া দুটি চায়নিজ রাইফেল নিয়ে আবার দেশে চলে আসেন।

দেশে আসার দুই-তিন দিনের মধ্যে তাদের সঙ্গীর সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৬৪ জনে। এই ৬৪ জনের মধ্যে মনমোহন সিংহসহ চারজন মণিপুরী সম্প্রদায়ের। অন্য তিনজন হলেন কবি কারাম নীলবাবু সিংহ, নীলমণি দত্ত, আরেকজনের নাম স্মরণ করতে পারেন না মনমোহন সিংহ। এপ্রিল মাসের ২০/২২ তারিখে ৬৪ জন দলবদ্ধ হয়ে খোয়াই নদী বরাবর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে এমপি মোস্তফা শহীদের সাথে দেখা করেন। মোস্তফা শহীদ সেদিন বিকেলেই কয়েকটি ট্রাক এনে ৬৪ জনকে অমর কলোনি ইয়ুথ ক্যাম্পে পৌঁছে দেন। সে ক্যাম্পে বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিতে আসা যুবকদের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারে পৌঁছে যায়। ইন্ডিয়ান অফিসার দেখলেন যে এতে একটা কোম্পানি হয়ে যায়। মনমোহন সিংহ ট্রেনিং নেন সেকেন্ড ব্যাচে অমরপুর ওমপি ইয়ুথ ক্যাম্পে। জায়গাটা ত্রিপুরা থেকে দেড়/দুশো কিলোমিটার ভেতরে, এক জঙ্গলে। ট্রেনিং প্রশিক্ষকরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে চাইতেন না। মনমোহনদের প্রশিক্ষক ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক শিখ অফিসার।

এক মাস মেয়াদি গেরিলা ট্রেনিংয়ে মনমোহন থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, স্টেনগান, টুই ইঞ্চ মর্টার, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন ইত্যাদি অস্ত্র চালনা শেখেন। ট্রেনিংয়ে গ্রেনেড চার্জ করতে গিয়ে মনমোহনের দুজন সহযোদ্ধা শহীদ হন, যাদের নাম এখন তিনি মনে করতে পারেন না।

ট্রেনিং শেষে আগরতলা সীমান্তে মোহনপুর হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয় মনমোহনদের। তারা যখন পৌছেন তখন সেখানে মিটিং চলছিল। উপস্থিত ছিলেন মেজর হেলাল, মেজর মঞ্জুর, কর্নেল রব এবং জেনারেল ওসমানি। হেডকোয়ার্টারে পৌছে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর দেড় হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি গ্রুপ করা হয়। পাঁচশো, চারশো, তিনশো, একশো যোদ্ধার বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে পাঠানো হয় কাঁচামাটি ক্যাম্প, বাঘাইছড়া ক্যাম্প, সিংছড়া ক্যাম্প ও মুদিবাড়ি ক্যাম্পে।

মনমোহন সিংহ যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে। তাঁদের আঞ্চলিক কমান্ডার ছিলেন এজাজ আহমেদ চৌধুরী। এঁর অধীনে তিনি প্রায় ২০/২২টি অপারেশনে অংশ নেন।

ক্যাম্পে হাত ভাঙা সুবেদার বলে সবাই চিনত এক সুবেদারকে। তাঁর কাছ থেকে মনমোহন জানতে পারেন বর্ডারের কাছেই পাকিস্তানিদের একটি ক্যাম্প রয়েছে। সে ক্যাম্প থেকে আক্রমণে বহু মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়েছেন। ক্যাম্পটি দখল করা খুব প্রয়োজন।

পরদিন রাত তিনটায় মনমোহন বারো জনের একটি দল নিয়ে এ্যাডভান্স হন। রেকি করবার জন্য একজন রানার ছিল যার কাজ হল ছদ্মবেশে পাঞ্জাবিদের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর এনে দেয়া। রানারের তথ্য অনুযায়ী তাঁরা এগুতে থাকেন। হঠাৎ খবর পেলেন, কাছেই পাকবাহিনীর একটি ট্রাক অবস্থান নিয়েছে। আর এগুলেই জীবন বিপন্ন। ওদিকে স্থানীয় রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান নেয়ার খবর পেয়ে গেছে। এ সময় রানার ডানে বা বামে যাবার পরামর্শ দেয়। কেননা সামনে এগুলে বা পিছু হটলে বিপদ হতে পারে। মনমোহনদের সাথে দূরবীন বা ওয়ারলেস কিছুই ছিলনা। বারোজনের গ্রুপ নিয়ে সুবেদারকে মেসে পাঠালেন একটা টুইঞ্চ মর্টার এবং দুজন এলএমজি ম্যান পাঠাতে।

পরদিন ভোররাতে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায় চারজন রাজাকার ও তিন জন পাকসেনা। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে একজন পাকসেনা ধরাশায়ী হয়। বারোজন মুক্তিযোদ্ধার একযোগে আক্রমণে বাকি দুই পাকসেনা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় ও রাজাকার চারজন ধরা পড়ে। চার রাজাকারকে ক্যাম্পে এনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাতে সোপর্দ করে মনমোহনের দল।

মে মাস পর্যন্ত ওই এলাকাতেই অবস্থান করেন মনমোহন। সেখানে আরো চারটি অপারেশনে অংশ নেন। চার অপারেশনে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও তিনজন আহত হন। অপরদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা ১১ জন পাকসেনাকে হত্যা করে এবং ৬ জনকে বন্দি করে। মুক্তিযোদ্ধারা নিহত পাকসেনাদের অস্ত্র ও ইউনিফর্ম জব্দ করে।

ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে কাঁচামাটিতে একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। কর্নেল রব মনমোহন ও তাঁর কিছু সহযোদ্ধাকে সে ক্যাম্পে পাঠান জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের সাথে যে অপরেশনগুলোয় অংশ নিয়েছেন সেসব অপারেশনে প্রচুর গোলাগুলি হয়েছে। এক পর্যায়ে কাঁচামাটি ক্যাম্পের অবস্থান জেনে যান এবং ধ্বংস করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। ক্যাপ্টেন মতিউর ক্যাম্প অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। অবস্থান পরিবর্তনের জন্য গাড়িতে করে রওনা হন মুদিবাড়ির দিকে। প্রথমে ক্যাপ্টেন মতিউরের গাড়ি, তার পেছনের গাড়িতে মনমোহনরা। তৃতীয় গাড়িতে আর্মস এ্যামুনেশন ও ড্রাইভারসহ পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম গাড়িটি পেরিয়ে গেল। মনমোহনদের গাড়িটিও পার হল। তৃতীয় গাড়িটি, যেটাতে আর্মস এ্যামুনেশন ছিল, সে গাড়িটির একটি চাকা ল্যান্ড মাইনের ওপর পড়ে এবং মাইনের সাথে গাড়িতে রাখা এ্যামুনিশন ও এক্সপ্লোসিভও বিস্ফুরিত হয়। শহীদ হন ওই গাড়িতে থাকা ড্রাইভারসহ পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা। ওই পাঁচজন শহীদকে মুদিবাড়ি ক্যাম্পে বস্তায় ভরে সমাহিত করা হয়।

জুনের ১৫/২০ তারিখে আঞ্চলিক ক্যাপ্টেন এজাজ আহমেদ চৌধুরীর নির্দেশে বাঘাইছড়া ক্যাম্পে কোর্স করতে যান। ক্যাপ্টেন এজাজের অধীনে নলুয়া চা বাগান, চানপুর চা বাগান, আমরুপ চা বাগানসহ কালেঙ্গা এলাকার জালাসুন্দর শায়েস্তাগঞ্জের দুর্গাপুর এলাকায় অপারেশন চালিয়েছেন। পাকসেনাদের ক্যাম্প দখল করেছেন।

কালেঙ্গা পাহাড় কমলপুর ধলাইবেলীর বাম দিক থেকে কমলগঞ্জের পাশে যে রাস্তা, তার এপাশে ৩ নম্বর সেক্টর আর ওপাশে ৪ নম্বর সেক্টর। এই দুই সেক্টর কম্বাইন্ডলি কঠিন একটি অপারেশন পরিচালনা করেছিল এখানে। সে অপারেশনে একটানা তিনদিন তিনরাত যুদ্ধ চলেছিল। যুদ্ধে ১৮/১৯ জন ভারতীয় সেনা এবং ২১/২২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। আহত হন ১১ জন। পাকেসনাদের দুটা গাড়ি মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। বেশ কয়েকজন পাকসেনাকে হত্যা করতে সমর্থ হন মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু তাদের অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা যায় নি। এটা জুলাইয়ের শেষ দিকের ঘটনা।

আগস্টে আরো একটি অপারেশন পরিচালনা করা হয় ওই জায়গা থেকে দেড়/ দুই কিলোমিটার উত্তরে। জায়গাটার নাম দলাসুন্দর। ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল। গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন কবি কারাম নীলবাবু সিংহ। পাঞ্জাবিদের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ করতে যান। ক্যাম্পের কাছে একটি লোককে লক্ষ্য করে গুলি চালান এক মুক্তিযোদ্ধা। পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প থেকে তখন বৃষ্টির মতো পাল্টা গুলি চালায়। ঘাবড়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটেন। সে যুদ্ধে মনমোহন সিংহের তলপেটে গুলি লাগে। সেই গুলিটি এখনো মনমোহন সিংহের সংগ্রহে রয়েছে।

গ্রুপ কমান্ডার কবি কারাম নীলবাবু মনমোহনকে বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে আসে। অন্য মুক্তিযোদ্ধারা গ্রুপ কমান্ডার ও মনমোহন মারা গেছে ভেবে ক্যাম্পে ফিরে যান। নীলবাবু মনমোহনকে হাসপাতালে না নিয়ে ইয়ুথ ক্যাম্পে রেখে খোয়াই চলে যান। সেখান থেকে মণিপুরী একজন ডাক্তার নিয়ে আসেন। সে ডাক্তার শরীরে বিঁধে থাকা গুলি বের করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেন। পরে খোয়াই হাসপাতালে একুশ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন মনমোহন। ক্ষত মোটামুটি শুকানোর পর ক্যাপ্টেন এজাজ মনমোহন সিংহকে বললেন 'অপারেশনে যেতে পারবে ! নয়ত রেস্টে থাক।' মনমোহন অপারেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। অপরদিকে, কবি কারাম নীলবাবু অসুস্থ হয়ে অন্য জায়গায় থাকায় তাঁর দায়িত্বটা মনমোহন সিংহকে দেয়া হয়।

এভাবে নভেম্বর এসে গেল। ক্যাপ্টেন এজাজ মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন চুনারুঘাট এলাকা দখলে নিতে। মনমোহনের দল রানিকুদ এবং তার একটি প্রাইমারি স্কুলের পাশে এক সপ্তাহ অবস্থান করে। এ সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে চেয়ে খাবার সংগ্রহ করা হত। উদ্দেশ্য ছিল– চুনারুঘাট থানা দখল করা। চুনারুঘাট রানারের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করে পাকসেনাদের অবস্থান জানতে ১৫/২০ দিন পেরিয়ে গেল। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা গিয়ে চুনারুঘাট থানার তৎকালীন ওসি নূর হোসনকে ধরে আনেন। ওসির কাছ থেকে জানা গেল থানায় পাঞ্জাবিদের অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা রেইড করল চুনারুঘাট থানা। কিন্তু পাকসেনা রেইডের খবর আগেই পেয়ে যায়। ফলে কাউকে পাওয়া যায় নি। পাকসেনারা চুনারুঘাট থানায় আসত এবং দিনে দিনেই চলে যেত। অবস্থান করত না। তাদের মূলঘাঁটি ছিল শায়েস্তাগঞ্জ। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় থাকে। থানার ওসি নূর হোসেন পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। পরপর দুদিন মুক্তিযোদ্ধারা ধান ক্ষেতে লুকিয়ে ছিলেন। ওসি নূর হোসেনই মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার পাঠাতেন।

ডিসেম্বর মাস এসে গেল। ৭ তারিখে আলোচনা করলেন ওসি নূর হোসেনের সাথে। ৯ তারিখেও আলোচনা হল। ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পুরো থানা ঘেরাও করে ও ১৫ তারিখ সকালে সরাসরি থানা আক্রমণ করে। পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। নূর হোসেন ওসিকে নিয়ে থানায় প্রবেশ করেন মনমোহন সিংহ। ওসিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন চুনারুঘাট থানায় কোনো পাকসেনা নেই। তারপর থানার সামনে টেবিলের ওপর একটি চেয়ার রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকাবাসীর সামনে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মনমোহন সিংহ চুনারুঘাট থানাকে মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন। সময়টা ১৫ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টা।

দেশ স্বাধীন হলে ১৯ বা ২০ ডিসেম্বর হবিগঞ্জে ক্যাপ্টেন এজাজের কাছে অস্ত্র জমা দেন মনমোহন সিংহ। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে যেমন আনন্দিত হয়েছেন তেমনি দুঃখও পেয়েছেন। অনেক সহযোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। অনেকে আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। সেসব মনে পড়লে এখনো খুব কষ্ট পান।

আজ সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত। যাঁরা রণাঙ্গনে প্রকৃত যুদ্ধ করেছে তাঁদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না। মনমোহন সিংহ ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পূরণ হয় নি সে স্বপ্ন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছিল। তাই আর লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। নিজে ডাক্তার হতে না পারলেও পরে ছোটো একটা ফার্মেসি দিয়ে সেখানে একজন এমবিবিএস ডাক্তার রেখে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু আয়ত্ত করেছেন। তাঁর ভাষায় এর মধ্য দিয়ে 'স্বপ্নের কিছুটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি।'

বর্তমানে মনমোহন সিংহ যুদ্ধাহত হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত। প্রতিমাসে দুই হাজার এবং চিকিৎসা ভাতা পাঁচশো মোট আড়াই হাজার টাকা পাচ্ছেন। তার মেয়ে প্রতি মাসে ষোলো শো টাকা পায় শিক্ষা ভাতা। আর মনমোহন সিংহের ট্রেন, লঞ্চ, বাস এবং অভ্যন্তরীণ বিমানে কোনো ভাড়া লাগে না। এছাড়া মেয়ের বিয়ের সময় ২০/২৫ হাজার টাকা এককালীন অনুদান পাবেন এবং তিনি মারা গেলে তার প্রাপ্য ভাতা তাঁর স্ত্রী পাবেন।

১৯৯১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে মনমোহন সিংহ সিলেট থানা সদর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সহকারী কমান্ডার। মনমোহন সিংহের দেয়া তথ্য মতে সিলেট থানা সদরে তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৫০-৬৭৫ জন। এর মধ্যে মণিপুরী সম্প্রদায়ের মাত্র ৫ জনের নাম পাওয়া যায়। অনেকের নামই তালিকাভুক্ত হয়নি। কেননা মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরী সম্প্রদায়ের শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাই প্রায় ৫০ জন।

নীলমণি সিংহ ননী

নীলমণি সিংহ ননী একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফার। '৭১ সালে তিনি ২৯ বছরের যুবক। সিলেট শহরে সে সময়ের নাম করা বর্মন স্টুডিওতে কাজ করতেন ননী। কয়েক পুরুষ ধরে বাস করছেন সিলেট শহরের লালা দিঘির পাড় এলাকায়। ২৫ মার্চের পর সিলেট শহরেও ঢুকে পড়ল পাক বাহিনীর কনভয়। ক্যাম্প করা হল বিভিন্ন জায়গায়। কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বালক-কিশোর-যুবক এমন কী নারীদেরও ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল পাক আর্মি। অন্যান্য যুবকদের মতো ননীও ভয় পেলেন। আরো বেশি ভয় পেলেন ননীর নব্বই বছর বয়সী দাদা আর

সত্তর বছরের দিদা। বাবা-মাকে আগেই হারিয়েছেন ননী। বড়ো হয়েছেন দাদা-দাদির কাছেই।

১৯৪২ সালের নভেম্বরে জন্ম ননীর। নাম রাখা হল ননী গোপাল সিংহ। লালা বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে রসময় মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ভর্তি হন। ইচ্ছে থাকলেও অষ্টম শ্রেণীতেই লেখাপড়ায় ইতি টানতে হয় অর্থনৈতিক কারণে। তারপর ফোটোগ্রাফির কাজ শিখলেন বর্মন স্টুডিওতেই এবং সেখানেই ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ নিলেন। ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল। শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ।

ননীর দাদা ননীকে নিয়েই চিন্তিত। তিনি ননীকে পরামর্শ দিলেন ভারতে পালিয়ে যেতে। দাদার নির্দেশেই ননী এপ্রিলের প্রথমদিকে বাড়ি ছেড়ে ভারত রওনা হলেন। তার সঙ্গী মণিপুরী সম্প্রদায়েরই অবণী কুমার সিংহ, আদিত্য শর্মা কংকর, গৌরাঙ্গ বাবু ভানুগাছির মন্টু সিংহসহ আরো ক'জন সীমান্ত অতিক্রম করে শিলংয়ে একরাত কাটিয়ে কমলাপুর লোয়ার বন ইকো ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং শেষ হয় ২০ মে '৭১-এ। এই ট্রেনিং সেন্টারেই ননীর নাম বদলে যায়। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ননী গোপাল সিংহকে অন্যরা ডাকতেন 'সবেধন নীলমণি' নামে। পরে ট্রেনিং সেন্টার থেকে যে সনদ দেয়া হল সেখানে নীলমণি সিংহ ননী লেখা হয়। ননী গোপাল সিংহ এখন নীলমণি সিংহ (ননী) নামেই পরিচিত।

ইকো ট্রেনিং সেন্টারে ননী থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড, ডেমুলেশন, ব্রিজ ওড়ানো ইত্যাদি রপ্ত করেন। ট্রেনিং শেষে ৪ নম্বর সেক্টরের অধীন লে. কর্নেল মীর শওকত আলীর নেতৃত্বাধীন ভোলাগঞ্জ সাব সেক্টরে যোগ দেন। ননী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে দুটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এ কোম্পানি এবং বি কোম্পানি। ননী ছিলেন বি কোম্পানির সেকশন কমান্ডার। তাঁর সহযোদ্ধা মন্টু সিংহ ছিলেন প্লাটুন কমান্ডার।

যুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অপারেশনে অংশ নেন ননী। তার মধ্যে টুকের বাজার অপারেশন উল্লেখযোগ্য। মে মাসের শেষের দিকে টুকের বাজার অপারেশন পরিচালিত হয়। এ অপারেশনে বেশ কয়েকজন পাকসেনা হতাহত হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। শুধু টুকের বাজার দখলে নেবার সময় ননীর এক সহযোদ্ধা পীযুষ কান্তি সরকার মর্টারের গুলিতে আহত হন। তাঁর হাত ও পায়ে গুলি লাগে। টুকের বাজারে হানাদার বাহিনী বর্ণনাতীত অত্যাচার করেছিল। ননীর বাহিনী টুকের বাজারকে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও দখল থেকে মুক্ত করে নিজেদের দখলে নেয়। এছাড়াও নীলমণি সিংহ ননী আরো উল্লেখযোগ্য কিছু অপারেশনে অংশ নেন। বয়সের ভারে ন্যুজ নীলমণি সিংহ অনেক ঘটনাই এখন বিস্মৃত হয়েছেন। বয়স আর অভাবের কাছে

যেন আত্মসমর্পণ করেছেন নীলমণি সিংহ ননী। লালা দিঘির পাড়ের দু'কামরার বাড়িটিতে বসে যখন বৃদ্ধ ষাটোর্ধ্ব নীলমণি সিংহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা করছিলেন, তখন বারবার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ছিলেন। তার কণ্ঠ ধরে আসছিল। বারবার ভিজে উঠছিল চোখ জোড়া। বড়ো অসহায় দেখাচ্ছিল বৃদ্ধ নীলমণি সিংহ ননীকে।

বর্তমানে লালা দিঘির পাড়ে দুই কামরার পৈত্রিক ভিটাতেই স্ত্রী প্রমিলা এবং দুই ছেলে নিতাই ও প্রবীণকে নিয়ে বড়ো অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন মুক্তিযোদ্ধা নীলমণি সিংহ ননী। এই মুক্তিযোদ্ধার দুঃসময়ে কোনো সরকারই তাঁর খোঁজ নেয়নি। অবশ্য নীলমণি সিংহও ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কথা ভাবেন না। তাঁর সরল স্বীকারোক্তি– 'মুক্তিযুদ্ধ অন্তরে আছে, মুক্তিযুদ্ধ করেছি। নাম উঠুক বা না উঠুক কিছু আসে যায় না।'

ননী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাসে পাঁচশো টাকা ভাতা পান- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এটুকুই পেয়েছেন মূল্যায়ন হিসেবে। তবে 'মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সবাই আলাদাভাবে দেখবে এই মনোভাবটা কখনোই পোষণ করি নাই।'

নীলমণি সিংহ অনেক কথা অকপটে বলেন, বলেছেন বটে। আবার বহুকথা চেপে রেখেছেন বুকের অভ্যন্তরে। তবে এটুকু বুঝতে বেগ পেতে হয়না যে বুকের ভেতর চেপে রাখা কথাগুলো নীলমণি সিংহের ক্ষোভ মিশ্রিত কষ্টের কথা। যেমন 'দেশ স্বাধীন হয়েছে শোনার পর কেমন অনুভূতি হয়েছিল !' উত্তরে 'খুব আনন্দ পেয়েছি। এটাই তো।' পাঁচটি শব্দের এক বাক্যে দায়সারা গোছের উত্তর। ওই বাক্য উচ্চারণের সময় নীলমণির কণ্ঠে কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না। বরং বিষণ্নতার এক সুর বেজেছিল যেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে কি না জানতে চাইলে ননী বললেন, 'দেশটা সত্যিকার সোনার বাংলা হয়েছে কি না সেটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা ভালো জানেন। কী পেয়েছি সেটা বড়ো কথা নয়, দেশ স্বাধীন করতে হবে সে জন্যই যুদ্ধ করেছিলাম।'

নীলমণি সিংহের উল্লেখযোগ্য একটি স্মৃতি হল মুক্তিযুদ্ধের সময় রোজার মাসে তিনি রোজা রেখেছিলেন। ঈদের জামাতে শরিক হয়েছেন। দুহাত তুলে মোনাজাত করেছেন। নীলমণি সিংহ ধর্মকে একটু অন্যভাবে দেখেন। সেটাও অকপটেই বললেন।

নীলমণি সিংহ এখন ষাট বছর পেরিয়েছেন। এখন আর আগের মতো কর্মক্ষম নন। ফোটোগ্রাফির কাজ এখন করতে পারেন না। বাড়িতে বসে ক্যামেরা মেরামতের কাজ করেন। কিন্তু প্রযুক্তির উত্তরণের কারণে দিন দিন কাজের সংখ্যাও আসছে কমে। অথচ এই ক্যামেরা মেরামতই বর্তমানে নীলমণি সিংহ ননীর প্রধান আয়ের উৎস। ক্যামেরা রিপিয়ারিংয়ের কাজ করে সংসার চলেনা।

বহু কষ্টে টেনে-টুনে চালিয়ে নেন। দুই ছেলে এখনো ছাত্র। এক ছেলে সিলেট এমসি কলেজে এইচএসসি এবং আরেক ছেলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ পড়ছে। এদের লেখাপড়াতেও তো খরচ আছে ! ছবি তোলায় দক্ষ, ক্যামেরা রিপিয়ারিংয়ে পারদর্শী মুক্তিযোদ্ধা নীলমণি সিংহ এই বয়সে বড়ো অসহায় বোধ করেন।

নীলবাবু সিংহ

মুক্তিযুদ্ধের সময় নীলবাবু সিংহ থাকতেন সিলেট শহরের সুবিদবাজার এলাকায়। এখনো পরিবার নিয়ে একই স্থানে থাকেন। একটি বেসরকারি বীমা কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নীলবাবু। নীলবাবু সিংহ হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার গাজিপুরের আবাদগাঁও গ্রামে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব-কৈশোর সেখানেই কাটিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছেন। লেখাপড়া করেন পাশের গ্রামে গোবরখোলা প্রাইমারি স্কুল এবং গাজিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন নীলবাবু সিংহ এসএসসি পরীক্ষার্থী। স্কুল ছাত্র থাকাবস্থায়ই নীলবাবু প্রগতিশীল বামধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে, এদেশের মানুষের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ প্রক্রিয়া তাঁর বোধে এক ভিন্নমাত্রার প্রতিবাদ সৃষ্টি করে। যুদ্ধ শুরু হবার পর মূলত জাতির মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ঘরছাড়া হয়ে বাড়ির পাশের সীমান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর দেশে ফিরে এসে ক'দিন থেকে অবস্থা বুঝে আবারও চলে যান ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই শহরে।

৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। খোয়াই শহরের কাছেই লালছড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। লালছড়ি ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে তাঁদের পাঠানো হয় আসাম রাজ্যের তেজপুর ট্রেনিং সেন্টারে। সেখানে প্রশিক্ষক আর. কে. সিংয়ের অধীনে এক মাসের গেরিলা ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ হয় নভেম্বরের শেষের দিকে। তাঁদের ট্রেনিং প্রোগ্রামে মোটিভেশন, থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি, নাইনএমএম ইত্যাদি চালনাসহ গ্রেনেড চার্জ ও এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার শেখানো হয়। ট্রেনিং শেষ করে মুক্তিযুদ্ধে নীলবাবু সিংহ ৪ নম্বর সেক্টরের অধীন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন সি. আর দত্ত। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে প্রায় মাসখানেক সময় লাগে। নীলবাবুর দল ট্রেনিং চলাকালীন সময়েই ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। তাঁরা আসাম থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের কয়লাশহর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। সেদিন ১৪ ডিসেম্বর। অবস্থান নেন রবির বাজারের রাখাছড়া ক্যাম্পে। সেখান থেকে শমসের নগর হয়ে মৌলভীবাজার, এরং অবশেষে শ্রীমঙ্গল পৌঁছেন।

শ্রীমঙ্গল থানায় সব মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিত করা হয়। কিন্তু সেখানে সবার স্থান সংকুলান না হওয়াতে রাতের থাকা ও খাবার ব্যবস্থা স্থানীয় একজন হোটেল মালিক অতি আগ্রহ এবং আন্তরিতার সাথে করেন।

নীলবাবু সিংহ সুন্দর, স্বাধীন একটি দেশ গড়তে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধ চলাকালীন স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রগতিশীল একটি স্বাধীন দেশ। নীলবাবুর কষ্ট– "দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই। আমরা একটা মাত্রচিত্র পেয়েছি। কিন্তু দেশের জনসাধারণ কৃষক-শ্রমিক যে আকাঙ্ক্ষা যে প্রত্যাশা নিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সে আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা এখনো পূরণ হয়নি।" নীরবাবুর মতে, মুক্তির যুদ্ধটা এখনো শেষ হয়নি। কারণ শোষক শ্রেণী কেবল পরিবর্তিত হয়েছে ; নির্মূল হয় নি। যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। নীলবাবুর ভাষায়, 'আজকে আমরা দেখছি যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাদের শাস্তি হয়নি, উল্টো তারা পুনর্বাসিত হয়েছে, হচ্ছে। তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পত পত করে উড়ছে। এটা আমাদের পুরো জাতির জন্যে দুঃখজনক।' ভেজা কণ্ঠে উচ্চারণ করছিলেন নীলবাবু সিংহ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত বলে মনে করেন নীলবাবু।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি গর্বিত কি না ! এর তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল 'অবশ্যই গর্ববোধ হয়'। অন্যদিকে, আবার কিছুটা হতাশও বটে। কেননা, মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, প্রত্যাশা কোনোকিছুরই প্রতিফলন নেই '৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে। অনেক সময়ই মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এ দেশের মানুষের সবচেয়ে বড়ো অর্জন। আগামী প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। দেশের জন্য এ দেশের মানুষের যে ত্যাগ সেটা যেন উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লেখা এবং পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করেন নীলবাবু সিংহ। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধার তালিকাসহ অবদান তো বটেই, পাকবাহিনীর অত্যাচার ও তাদের রাজাকার, আল-বদর, আল শামস বাহিনী যুদ্ধের নয়টি মাস যে অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে, সেসব কথাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার কথা বললেন নীলবাবু সিংহ।

'কিন্তু আজকের বাস্তবতা দেখেন' আক্ষেপের সুরে বলছিলেন নীলবাবু। 'এখন মুক্তিযোদ্ধারা নন, অমুক্তিযোদ্ধারাই মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। আর বঞ্চিত হচ্ছেন সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা।" তাই এখন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন নীলবাবু। এমনকি

তিনি বিশেষ কোটার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করেন না। কেননা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তো আর যুদ্ধ করেন না।

নীলবাবু সিংহের মতে, বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে দেশপ্রেম থাকাটা সবচেয়ে জরুরি। যে কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই সত্য হল প্রকৃত দেশপ্রেমিক না হলে কখনোই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে না।

একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন নীলবাবু সিংহ। প্রকৃতপক্ষে এ লজ্জা কার ! নীলবাবু মুক্তিযোদ্ধা সনদেরও প্রত্যাশী নন। তিনি দেশের অন্তিম প্রয়োজনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে গেছেন। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নিজেকে তৈরি করেছেন শত্রুর মোকাবেলায়। এমনকি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও পৌঁছেছেন। কিন্তু তার দুদিন পরই পাকবাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধের পর ট্রেনিং সেন্টার থেকে যে সনদটি দেয়া হয়েছিল সেই সনদটি নীলবাবুর কাছে রক্ষিত আছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে কোনো সনদ দেয়া হয়নি। '৯৭/'৯৮ সালে তৎকালীন সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিল। নীলবাবু সিংহ সেখানে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিয়ম করল ইন্টারভিউ দিয়ে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন, কী কী অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ইত্যাদি প্রমাণ দিতে পারলে তবে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম উঠবে। পুরো প্রক্রিয়াটি নীলবাবুর কাছে অসম্মানজনক মনে হওয়াতে তিনি আর যাননি।

নীলবাবু সিংহের মতো আরো অনেক মণিপুরী মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা অপমানজনক, জটিল ও সময়সাপেক্ষ মনে হওয়াতে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করাননি। দেশ স্বাধীন হল ৩৭ বছর পার হতে চলল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, তৈরিই করা হয়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস কবে লেখা হবে ! এ প্রশ্নটি মনে বারবার উঁকি দেয়।

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ (মণিপুরী মুসলিম) ১৯৫৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলার হালহালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া করেন হালহালি প্রাইমারি স্কুলে এবং পরে জুনিয়র হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। চলে আসেন পূর্ব পাকিস্তানে। চাকরি নেন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানিতে। পরে ভর্তি হন নারাংগিরি পাইলট হাইস্কুলে। সেখানে ছাত্রাবস্থায় যোগ দেন ছাত্র ইউনিয়নে। ২৫ মে মার্চের কাল রাত্রির পর রাজধানী ঢাকার ছাত্র-পুলিশ ও সাধারণ মানুষের উপর যখন পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণ

করে তখন চন্দঘোনায় ছাত্র-শ্রমিক সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য খাবার পাঠান। পরে প্রতিরোধ কমিটি নুরুসাদা নামে একজন শ্রমিককে কমান্ডার এবং আব্দুল হামিদকে সহকারী কমান্ডার করে একশো জনের একটি দলকে ভারতে পাঠায় ট্রেনিং নেয়ার জন্যে। সেটা ৩ এপ্রিল ১৯৭১। সেখানে ত্রিপুরার বগাফা ক্যাম্পে ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। ট্রেনিং শেষে দক্ষ ও যোগ্য ১৫ জনকে বাছাই করা হয়। ১৫ জনের মধ্যে আব্দুল হামিদ একজন।

ট্রেনিংয়ে থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এমজি, এলএমজি, এসএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি অস্ত্রচালনা শেখানো হয়। এছাড়া, ভারী অস্ত্রেরও ট্রেনিং দেয়া হয়। ট্রেনিং শেষে ৮ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিতে পাঠানো হয় তাঁদের। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের পরিচালনায় প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম বেঙ্গল নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম ব্রিগেড গঠন করা হয় যা জেড ফোর্স নামে পরিচিত।

আব্দুল হামিদ এমজি ম্যান হিসেবে জেড ফোর্সে যোগ দেন। তাদের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর আনিসুল হকের নেতৃত্বে আসাম রাজ্যের ম্যাংকাচরে ক্যাম্প করেন। সেই ক্যাম্প থেকে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয় নকসী নামক স্থানে। সে যুদ্ধে এগারো জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং কোম্পানি কমান্ডার লে. আমিন মারাত্মকভাবে আহত হন। মোহাম্মদ হামিদসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণে বেঁচে যান। লে. আমিনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে হামিদসহ আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠানো হয় রংপুরের রৌমারি অঞ্চলে। সেখানে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ না হলেও বেশকিছু ফায়ারিংয়ের ঘটনা ঘটেছিল। রংপুরের রৌমারি থেকে সিলেটের ঘানিয়া পাহাড় চা বাগানে পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যখন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, আব্দুল হামিদ তখন ভারতের ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর হয়ে সিলেটের ভানুগাছে পাক বাহিনীর সাথে আবারও সম্মুখ যুদ্ধ করছেন। একটানা ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধটা স্থায়ী হয়েছিল। সে যুদ্ধে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। নকসীর সম্মুখ যুদ্ধের পর এই ভানুগাছের যুদ্ধটাই ছিল সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বপ্ন দেখতেন দেশটা কলোনিয়ান ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এখন যে অবস্থা তাতে মনে হয় ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তনই হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্তি কেবলই একটি মানচিত্র। যে স্বপ্ন নিয়ে, যে আশা নিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন সেসবের কিছুই পূরণ হয়নি।

যুদ্ধ শেষে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ফেরার পথে শ্রীমঙ্গল ওয়াপদার হলুদ বিল্ডিংয়ে যারা অবস্থান করছিলেন সেখানে সৈনিক হিসেবে যারা থাকতে চান না

তাঁদের বিদায় জানানো হয়। আব্দুল হামিদও বিদায় নিয়ে চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী বেয়ন এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানিতে নিজ চাকরিস্থলে ফিরে যান। ১৯৭৩ সালে নারাংগিরি পাইলট হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৫ সালে রাঙনিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। একই বছরে বিয়ে করেন। গত ২৫ জুলাই ২০০২ তিনি চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে ১ মেয়ে ও ২ ছেলে নিয়ে তাঁর সংসার।

আব্দুল হামিদ মনে করেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধ তিনি কোনো খেতাব বা পুরস্কারের আশায় করেন নি। তিনি যে একজন মুক্তিযোদ্ধা এজন্য তার উত্তরাধিকারীরা গর্বিত। না, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্থানীয় কোনো প্রশাসন বা সরকার আজ পর্যন্ত খোঁজ নেয়নি কেমন আছেন মুক্তিযোদ্ধা আবুল হামিদ।

থইবাসিংহ

থইবাসিংহ একজন কাঠমিস্ত্রী। যুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সুনামগঞ্জ মহকুমা শহরে কাজ করতেন। দেশে যখন পাক সেনারা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন প্রাণ বাঁচাতে মেঘালয়ের শিলংয়ের বালা ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। সেখানে শরণার্থী হিসেবে মাস খানেক থাকার পর একদিন মাইকে ঘোষণা শুনলেন যে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীতে যারা যোগ দিতে চায় তারা যেন যোগাযোগ করে। থইবাসিংহ ভাবলেন তাদের মতো ছেলেদের বেকার থেকে কী লাভ ! তার চেয়ে দেশের জন্য কাজ করাই উত্তম। একদিকে বাড়ি ফেরার কোনো পথ নেই। অন্যদিকে বেকার, ঘোরাফেরা করা ছাড়া কোনো কিছু করার নেই। আর ওদিকে দেশে হানাদাররা বাড়িঘর জালিয়ে দিচ্ছে, নারীদের সম্ভ্রমহানি করছে। তার চেয়ে যুদ্ধ করা শ্রেয়। তার মতো হাজার হাজার ছেলে শরণার্থী ক্যাম্পে। তাদের সাথে থইবাসিংহও যোগ দিলেন। দেশের জন্য কিছু করার ইচ্ছায় নাম লেখালেন মুক্তিবাহিনীতে।

ইন্ডিয়ান আর্মিরা নিয়ে গেল শিলং ইকো ওয়ানকোর ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে একমাসের ট্রেনিং নেন তিনি। ট্রেনিংয়ে থ্রিনটথ্রি রাইফেল, এলএমজি, এমএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি অস্ত্রচালনা আয়ত্ত করেন।

তাঁদের প্রথম অপারেশন ছিল সুনামগঞ্জের বিড়াই থানায়। সেখানে দিন-রাত একটানা ৭২ ঘণ্টা লড়াই হয় পাকসেনাদের সাথে। তাঁদের এরিয়া ছিল আমিরগঞ্জ থেকে রানীরগঞ্জ হয়ে দিরাই, মার্কলি, গুডিয়ার গাঁও ইত্যাদি এলাকা। যুদ্ধের পুরো নয় মাস, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এলাকাতেই ছিলেন।

পুরো এলাকার অপারেশনগুলোর মধ্যে দিরাই থানার অপারেশন বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কেননা, থানার ভেতরে পাকসেনারা অবস্থান নিয়ে ছিল। আর তারা বাইরে থেকে আক্রমণ করতেন। পাকবাহিনীর বাংকার ধ্বংস করে দিত। রাতের

বেলা গেরিলা হামলা চালাত। বিড়াই থানা দখল নিতেই বেশি সময়, শ্রম ও শক্তি ব্যয় হয়েছে। অবশ্য দিরাই থানাটাই ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান টার্গেট।

দিরাই থানা দখলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল– দিরাই থানা এলাকার একটা জায়গা চাবনী গাঁও। সেখানে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। একটানা ৬/৭ ঘণ্টা স্থায়ী সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল। এযুদ্ধে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারাও পাক সেনাদের বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন।

তারা যে এলাকায় ছিলেন সেটা মূলত হাওড় এলাকা। চারপাশে কেবল পানি আর পানি। হাঁটার মতো কোনো জায়গা নেই বললেই চলে। একমাত্র বাহন নৌকা। ৪/৫ টা নৌকায় একসাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশনে যেতেন। প্রায় রাতেই ২০/৩০ বা কোনো কোনো রাতে ৪০ মাইল পর্যন্ত টহল দিতেন মুক্তিযোদ্ধারা। বেশিরভাগ সময় তাঁদের পানিতেই থাকতে হত। তাদের টার্গেট হল পাক সেনারা কোথায় কীভাবে আছে তার তথ্য বের করে আক্রমণ করা। অনেক সময় রানারের মাধ্যমে খবর পেয়ে কমান্ডার নির্দেশ দিতেন কোন ক্যাম্পে আক্রমণ করতে হবে, কোন বাংকার ধ্বংস করতে হবে ইত্যাদি।

যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তা পূরণ হয়নি, থইবাসিংহের। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যা চেয়েছিলেন তা পাননি। আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বা শাস্তি হওয়া উচিত কি না এ প্রসঙ্গে বললেন 'যারা রাজাকার ছিল তারা আসলে প্রাণের ভয়ে রাজাকার ছিল। কোনো লাভের আশায় নয়। আর শেখ মুজিবুর রহমান তো ক্ষমা করেই দিয়েছেন। আমি আর কী বলব !'

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে কোনো স্থানীয় প্রশাসন বা সরকার থইবাসিংহের খোঁজ নেয়নি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি আজ পর্যন্ত কোনো ভাতা পাননি। স্বাধীনতার এই ৩৭ বছরে কেউ জানতেও চায়নি মুক্তিযোদ্ধা কেমন আছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর যা পাওয়ার কথা তার কিছুই পাননি তিনি। অথচ অমুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধাদের বঞ্চিত করে লুটে নিচ্ছে সমস্ত সুবিধা। আর মানবেতর জীবনযাপন করছেন থইবাসিংহের মতো মুক্তিযোদ্ধারা।

আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে ;
বলো 'ক্ষমা করো'–
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী নারী

যুদ্ধ কেবল জীবন নয় ভূগোলও বদলে দেয়। নিরন্তর ধ্বংসের পাশাপাশি নতুন সৃষ্টি সুপ্ত থাকে সর্বাঙ্গে। তেমনি '৭১-র সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্নের সৌধ এই দেশের স্বাধীনতা। নির্দিষ্ট কোনো জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়-ভুক্ত মানুষ নয়। এই মহান অর্জনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল দেশের সর্বস্তরের নারী-পুরুষের। অথচ আমাদের প্রথাগত প্রতাপশালী আভিজাত্যপূর্ণ ইতিহাসের মূলধারার যুদ্ধে নারীর ভূমিকা ও অবদান প্রায়শ অবহেলিত অথবা কখনো-সখনো মর্যাদাহীনভাবে স্বীকৃত। কারণ, মানুষ তাদের বোধ বা চিন্তাগত প্রবণতায় যুদ্ধকে মনে করে কেবল একটি শারীরিক ও অস্ত্রসম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে। অথচ যুদ্ধ কেবল এইসব স্থূলতা নিয়েই নয়, এর পরিসীমা আরো ব্যাপৃত। আমাদের অথবা বিশ্বের যে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে সেই দেশের সকল জনগণের প্রাণপণ প্রচেষ্টার কারণে। নারীরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক। কেবল অস্ত্র হাতে নিয়ে নয়, নারীরা যুদ্ধ করেছে জীবনের সবটুকু ধন দিয়ে। তারা নিরাশ্রয় যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে। ক্ষুধায় খাদ্য জুগিয়েছে। পরম প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ করেছে যুদ্ধের ময়দানে। অন্যদিকে ৮ বছরের কন্যা শিশু থেকে ৭৫ বছরের বৃদ্ধাদের ২লক্ষ ৬৯ জন দিয়েছেন সম্ভ্রম-সম্মান। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেকেই রাষ্ট্রীয় সম্মান ও সরকারি সহায়তা পেয়েছেন। সেখানেও নারীরা অবহেলিত ও অপমানিত হয়েছেন।

বীর প্রতীক তারামন বিবি রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন স্বাধীনতার ২৪ বছর পর ১৯৯৫ সালে। আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি বলেছিলেন– 'আমি নারী তাই ছিল আমার ২৪ বছরের ব্যর্থতা'। এর থেকেও করুণ আর্তনাদ সেই সব মহান নারীদের যারা পাক সেনাদের যৌন বর্বরতার শিকার হয়েও দুর্ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। বেঁচে গিয়ে পদে পদে বিপর্যস্ত হয়েছেন সমাজের অপমানজনক দূষিত দৃষ্টিতে। আজও তাঁরা নিগৃহীত তাঁদের পবিত্র রক্তে ভেজা স্বাধীন দেশে, এমনকি নিজের পরিবারেও। ইতিহাসও তাঁদের স্থান দেয় না। মোটামুটি এ হল সভ্য জগতে নারীদের অবস্থান। আদিবাসী নারীদের অবস্থান এরও এক ধাপ নিচে। কারণ, আদিবাসী হওয়া তাঁদের আরেকটি পাপ। দিয়েছে সেই সব আদিবাসী নারীদের যাঁরা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন স্বাধীনতা অর্জনে। অবশেষে টিকে থাকা তেমন কয়েকজন আদিবাসী নারীর কথা এ সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

গারো নারী

লতিকা এন মারাক : আদিবাসী গারোদের বাস প্রধানত গারো পাহাড়সমৃদ্ধ বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায়। নেত্রকোনা বৃহত্তর ময়মনসিংহের একটি জেলা। সুসং দুর্গাপুর এবং কলমাকান্দা এরই দুটো থানা। টংক আন্দোলনসহ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে এ অঞ্চলের গারো জনসাধারণের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। এখানেই জন্ম, সময়ের এক অগ্রণী ব্যক্তিত্বের নাম লতিকা এন মারাক। মাতা রূপবতী মারাক। পিতা আমুদ চন্দ্র খসড়া। পিতা-মাতার প্রথম সন্তান লতিকা এন মারাকের পড়াশোনা বিরিশিরি মিশনারি স্কুলে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছেন তিনি। স্কুলে অধ্যয়নকালেই সমাজের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যান লতিকা। মানতে ইচ্ছে হয় না সমাজ যা মেনে চলছে। জড়িয়ে যান সমাজ-বিরোধী টংক আন্দোলনে। অবশ্য তাঁর এই মানস গঠনে পারিবারিক স্বীকৃতি ও পরবর্তী ঘটনাচক্রও ভূমিকা রেখেছে। বাবা ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। পরিবারের অন্য সবার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির স্টাডিগুলোতে যেতেন তিনি। এরপর তাঁর পরিচয় ঘটে হাজং নেত্রী কলাবতী হাজংয়ের সাথে। প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে লতিকার লব্ধ আদর্শ।

শোষণমুক্ত একটি সমাজ স্বপ্নের হাতছানি দিয়ে ডাকে তাঁকে। স্বামী গণেন্দ্র জ্যাম্বেল হয়ে গেলেন তাঁর এই স্বপ্নের সহচর। পরাধীন বাংলায় সংঘটিত পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই দম্পত্তির ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। এর পর আসে ১৯৭১। তখনো বেঁচে ছিলেন কলাবতী হাজং। তাঁর বাড়িতে মিলিত হতেন তখনকার কমিউনিস্ট নেতারা। মার্চের শুরু থেকেই আসন্ন লড়াই-এর প্রস্তুতি নিতে থাকেন তাঁরা। এপ্রিলের প্রথমদিকে উর্মিলা জ্যাম্বেল, রেণুকা ম্রিসহ প্রায় দু'শো জনের

একটি দল নিয়ে ট্রেনিংয়ের উদ্দেশে ভারতের বাঘমারায় পৌছেন লতিকা এন মারাক। সেখানে অন্যান্যদের সাথে সংগঠিত হয়ে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তথ্য আদান-প্রদানের দায়িত্ব নেন। এরপর দায়িত্ব নেন মুক্তিযোদ্ধা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে পত্রিকা বিলির। জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পাহাড়ের প্রান্তে প্রান্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যেতেন। সাথে থাকত নানা লিফলেট, প্রচারপত্র, চিঠি, কর্মসূচির খবর।

যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধাদের সাথে কলমাকান্দায় ফিরে আসেন তিনি। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার তাঁর কোনো খোঁজ নেয়নি। তখনো নেই তাঁর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট। বরঞ্চ স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সরকারের আমলে তাঁর নামে একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তাই দীর্ঘদিন গারো পাহাড়ে আত্মগোপন থেকে পরবর্তীতে কলমাকান্দাতে ফিরে আসেন তিনি। নতুন উদ্দীপনায় শুরু করেন অধিকার আদায়ের রাজনীতি। এখনো তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রকোনা জেলা শাখার সদস্য।

খাসিয়া নারী

কাঁকেট : গারো ভিন্ন বাংলাদেশে বসবাসরত আরেকটি সম্প্রদায় খাসিয়া। বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে এঁদের অবস্থান। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকেই সিলেটের সীমান্তবর্তী দোয়ারা বাজারে গড়ে উঠেছিল পাক বাহিনীর ক্যাম্প। এই দোয়ারা বাজারেই জন্ম খাসিয়া নারী কাঁকেটের।

বর্তমানে তাঁর পরিবারের কেউ সেখানে থাকে না, দেশান্তরিত হয়েছেন। জন্ম তারিখ জানা না গেলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে– মুক্তিযুদ্ধের সময় সুদর্শনা খাসিয়া নারী কাঁকেটের বয়স ছিল ২২/২৩ বছর। পারিবারিক দারিদ্র্য লাঘবে তিনি কাঁধে করে বয়ে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। সীমান্তের এপার-ওপার দুপারেই ছিল তাঁর ব্যবসার ক্রেতা। পথে চলাফেরায় বুঝতে সমর্থ হন স্বাধীনতা যুদ্ধের যৌক্তিকতা। প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন পাক সেনাদের অকথ্য অত্যাচারে। প্রতিজ্ঞা করেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের। মুক্তিযোদ্ধাদের শরণাপন্ন হলে প্রথমে তারা কাঁকেটকে প্রশ্রয় দেয় নি। কারণ, রাজাকারদের সাথেও তাঁর সখ্য ছিল। পরবর্তীতে তাঁর ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্বাস স্থাপন হলে তাঁকে খবরা-খবর সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সীমান্তের উভয় পারের মুক্তিযোদ্ধাদেরই তথ্য সরবরাহ করতেন তিনি। শত্রুর গোপন পরিকল্পনা জানতে তিনি আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভান করেন রাজাকার ও পাকসেনাদের সাথে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে কাঁকেটের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি সফল অপারেশন সম্পন্ন করে মুক্তিবাহিনী। এভাবেই দেশরক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন খাসিয়া নারী কাঁকেট। কিন্তু রক্ষা করতে পারেননি নিজেকে। ক্রমাগত সফলতার পর গোয়েন্দা

তৎপরতা আরো বাড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যান পাকিস্তানি দোসর রাজাকারদের হাতে। তারা তাকে তুলে দেয় পাক সেনাদের হাতে। নির্যাতন, নিগৃহের ৩ মাস বন্দি জীবন কেটেছে কাঁকেটের পাক সেনাদের ক্যাম্পে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম-ঠিকানা ও তথ্য উদঘাটন করতে তাঁর উপর চলেছে অত্যাচারের স্টিমরোলার। তবুও মুখ খোলেননি কাঁকেট। অসহনীয় অত্যাচারে এখানেই মৃত্যু ঘটে সাহসী আদিবাসী নারী কাঁকেটের।

কাঁকেটের মতোই একাত্তরের আরেক বীরাঙ্গনা খাসিয়া নারী কাঁকন বিবি। বাবা নেহা ও মা দামেলি নিয়তার কনিষ্ঠ সন্তান কাঁকন বিবির জন্ম ১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জের নওত্রই গ্রামে। দেড় বছর বয়সে বাবা-মা উভয়কে হারিয়ে এতিম শিশু কাঁকনের আশ্রয় হয় নানির কাছে। এরপর তার দায়িত্ব নেন বড়ো বোন কাপল নিয়তা। এক সময় আসে একাত্তর। সীমান্তরক্ষী স্বামী যুদ্ধ শুরু হবার পর সহযোদ্ধাদের সাথে সিলেটের আকালিয়া ক্যাম্পে চলে গেলে তিনি বোগলা ক্যাম্পে একা হয়ে পড়েন। একমাত্র আশ্রয় স্বামীকে হারিয়ে তখন তাঁর সময়টা কাটছিল অনিশ্চয়তায়। হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন স্বামীকে। এরপর শেষ হয় স্বামীকে খোঁজার পালা। তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় দোয়ারা বাজারের উত্তরের একটি পাকিস্তানি ক্যাম্পে। সেখানে ধর্ষণসহ নানাবিধ নির্যাতন চলে তাঁর উপর। এরপর নিয়ে যাওয়া হয় টেংরা ক্যাম্পে। সেখানেও কাঁকন বিবির ওপর চলে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। লোহার শিক গরম করে শরীরের বিভিন্ন অংশে ঢুকিয়ে দিয়েছিল পাক সেনারা। এভাবে চলতে থাকার এক পর্যায়ে যখন জানা যায়, তাঁর স্বামী পাঞ্জাবি সৈন্য এবং পাকিস্তানের হয়ে কাজ করছে তখন পাক বাহিনী কাঁকন বিবিকেও নিজেদের কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেয়। জীবন বাঁচানোর তাগিদে প্রস্তাবে রাজি হন তিনি। দায়িত্ব হল– ভিক্ষুক সেজে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ-খবর নিয়ে আসা। নিয়মিত পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে খবর সরবরাহ্ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন এদেশের নারীদের উপর পাক সেনাদের নির্যাতনের ভয়াবহতা। নিপীড়িতের আর্তনাদে জেগে ওঠে আরেক কাঁকন বিবি। সংকল্প করেন এদেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা রাখার। বহু চেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের আনুকূল্য লাভ করে তিনি। তাদের শত্রু বাহিনীঁর খোঁজখবর কৌশলে সরবরাহ্ করা শুরু করেন। এ সময় তিনি চলে আসেন ৫ নং সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলী এবং ক্যাপ্টেন হেলাল উদ্দিনের কাছে। সেখান থেকে লক্ষ্মীপুর ক্যাম্প ও শহীদ কোম্পানিতে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও অস্ত্র সরবরাহের সুযোগ পান। তখন তিনি রীতিমতো একজন মুক্তিযোদ্ধা। পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি হিসেবে ব্রিজ ধ্বংস করার (জর্ডিয়া সেতু) মতো সাহসী কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন কাঁকন বিবি। এছাড়াও তিনি মহব্বতপুর, কান্দগাঁ, বসরাই, টেংরাটিলা, বেটিরগাঁও, নুরপুর, দোয়ারা বাজার প্রভৃতি ২০টি অপারেশনে অংশগ্রহণ

করেছেন। এভাবে সংঘটিত অসংখ্য যুদ্ধে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে নভেম্বর মাসে তিনি গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে ধরা পড়েন পাক বাহিনীর হাতে। এরপর পাকসেনাদের নির্মম নির্যাতনে মৃতপ্রায় কাঁকন বিবি বেঁচে থেকেছেন শেষ পর্যন্ত।

আশ্রয়হীন এই নারীকে কেউ খোঁজেনি স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। স্থানীয় প্রশাসন, সরকার. এমনকি নিজের ভাইরাও। নিরুপায় হয়ে দোয়ারা বাজারে ফিরে এসে শুরু করেন ভিক্ষাবৃত্তি। স্বাধীনতার ২৫ বছর পর একটি মিডিয়া তাঁকে তুলে ধরলে বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে আর্থিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই টাকা দিয়ে বিয়ে দেন একমাত্র কন্যা সন্তানকে। এখন তিনি তাঁর মেয়ের জামাই'র আশ্রয়ে অতিবাহিত করছেন জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো।

রাখাইন নারী

প্রিনছা খে : বাংলাদেশে রাখাইনদের বাস মূলত বৃহত্তর বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চল এবং কক্সবাজার জেলায়। টেকনাফ এই জেলার উপকূলবর্তী রাখাইন-প্রধান অঞ্চল। এখানেই জন্মেছিলেন প্রিনছা খে, এক আত্মত্যাগী আদিবাসী নারী। বুনো লতার মতোই অবাধ্য ছিল তাঁর জীবন। পাহাড়, অরণ্য, আর সামুদ্রিক নিসর্গে তাঁর বেড়ে ওঠা। এ সময় আসে সত্তরের জলোচ্ছ্বাস। জীবনের পার্থিব সবকিছুর সাথে তিনি হারিয়ে ফেলেন নিজের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে। সবাইকে হারিয়েও ১৭ বছরের তরুণী প্রিনছা ভেঙে পড়েননি। প্রাকৃতিক বিরূপতাকে জয় করেছেন নিজের সত্তায় সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে। জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে সিদ্ধান্ত নেন আর্ত-মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। এ সময় যোগাযোগ ঘটে এক স্বেচ্ছাসেবক জাপানি দম্পতির সাথে। তাঁরা এসেছিলেন জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্তদের স্বাস্থ্য সেবায় একটি মেডিক্যাল টিম নিয়ে। এই টিমে আরো ছিলেন একটি ব্রিটিশ তরুণী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র। এঁদের সাথেই শুরু নার্স হিসেবে প্রিনছার নতুন জীবন। একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে টিমের সাথে প্রিনছা চলে যান পটুয়াখালীর সৈকত এলাকা কুয়াকাটায়।

এর পর আসে সেই উত্তাল মার্চ মাস। তখনও বরিশালে হানাদার বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তবুও পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এখানে গড়ে ওঠে সংগ্রাম পরিষদ, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। মেজর জলিলের অনুপ্রেরণায় গঠিত হয় ৮ জনের একটি আত্মঘাতী গেরিলা দল। ঘটনাক্রমে কুয়াকাটায় এই দলটির সাথে সাক্ষাৎ ঘটে মেডিক্যাল টিমটির। এ সময় গেরিলা দলের এক সদস্য সাঈদের সাথে সম্পর্ক হয় প্রিনছার। সময় তখন কেবল যুদ্ধ করার। অন্যদিকে, নির্ধারিত কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে চলে যায় প্রিনছার স্বপ্নের মেডিক্যাল টিম। এরপর প্রিনছার আশ্রয় ঘটে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কনিষ্ঠতম আসামি সুরেন বাবুর কাছে। শাসকদের

নজরবন্দিতে ছিল তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাপন। জুলাই মাসে পাথরঘাটা থানায় পাকিস্তানি পশুরা এক বর্বর উল্লাসে হত্যা করে সুরেন বাবুকে। আর প্রিনছার পরিণতি হয় তার চেয়েও ভয়াবহ। নিত্য মৃত্যুর অভিশাপে অভিভূত প্রিনছা। অসংখ্য হাতবদল হয়ে প্রিনছার শরীরটি পৌছে বাউকাঠি পাকিস্তানি ক্যাম্পে। প্রিনছা গোপন কৌশল উদঘাটনে প্রচেষ্ট হন। এ লক্ষ্যে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ভান করে শত্রু সেনাদের সাথে। তাঁর এই গোপন কর্মকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী ও সহায়তাকারী ছিলেন ক্যাম্পে জ্বালানি কাঠ সরবরাহকারী বাবুল। উপযুক্ত সুযোগ ও পরিকল্পনার অপেক্ষায় কেটে যায় তিনটি মাস।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে প্রিনছা কৌশলে অসুস্থতার বরাত দিয়ে ডাক্তার দেখাতে ঝালকাঠি যান। ডাক্তারের ছেলেও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রিনছাকে। প্রিনছা বিষ চান ডাক্তারের কাছে ; এমন বিষ যার বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, রয়েছে তীব্রতা। এমন বিষ ঝালকাঠিতে ছিল না। তাই ডাক্তার বরিশাল থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিষ এনে দেন প্রিনছাকে। পাক সেনাদের জন্য নিজ হাতে তৈরি খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেন তিনি। তাদের খাইয়ে দিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাবুলের সঙ্গে পালিয়ে যান প্রিনছা। পরের দিন জানা যায়, ক্যাম্পের ৪২ জনের মধ্যে ১৪ জন বিষক্রিয়ায় অচেতন অবস্থায় মারা গিয়েছে এবং বাকিদের সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকা পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন অবশিষ্ট দিনগুলোতে পালিয়ে বেরিয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের পর আত্মপ্রকাশ করেন রাখাইন নারী প্রিনছা।

গারো নারী

রেনুকা ম্রি : আনুমানিক ১৯২৬ সালে গারো পাহাড়ের কোলে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দায় জন্মগ্রহণ করেন রেনুকা ম্রি। বাবা শিবারাম ঘাঘরা, মা দিনামনি ম্রি। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা হেতু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা না হলেও শিক্ষিত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট শিক্ষায়। তাঁদের পরিবারের কেউ মিশনারিতে না যাওয়ায় এ নিয়ে মাঝে মধ্যে বিবাদ ঘটত। এতে দমে না গিয়ে রেনুকা বরং দ্বিগুণ উৎসাহবোধ করেন কমিউনিস্ট শিক্ষার প্রতি। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী হলেন লতিকা এন মারাক। স্টাডি সার্কেলগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ ও লতিকা এন মারাকের অনুপ্রেরণায় রেনুকা ম্রি হয়ে ওঠেন কমিউনিস্ট আদর্শে উজ্জীবিত এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ। জড়িয়ে যান ইতিহাসখ্যাত টংক আন্দোলনে। যদিও তখন তিনি ১৩ বছরের বালিকা মাত্র। এরপর আসে ১৯৭১ সাল। মার্চ মাসের শেষের দিকে একটি দল নিয়ে তিনি চলে যান ভারতের বাঘমারা ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে তিনি পার্টির নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, থাকা-খাওয়া ও সংগঠিত করে মিটিং করার দায়িত্ব পালন করেন । এছাড়াও শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে

বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলিসহ সার্বিক দায়িত্ব পালনে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন রেনুকা ম্রি।

সন্ধ্যা ম্রি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট অবদানে ভাস্বর আরেক আদিবাসী গারো নারীর নাম রেনুকা ম্রি। ১৯৫৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার জানজালিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা জামিল চ্যাম্বুগম, মা রিনমী ম্রি। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান সন্ধ্যা মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাসম্পন্ন করে ভর্তি হন জলছত্র জুনিয়র হাইস্কুলে। এই স্কুলেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন সন্ধ্যা ম্রি। এরপর ভর্তি হন হালুয়াঘাট মিশন হাসপাতালের নার্সিং বিভাগে। ১৯৭১ সালে তিনি এই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। দেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে যান পশ্চিমের বারোমারী মিশনে। রাজাকারদের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে দুই সপ্তাহ পরে এপ্রিলের সাত তারিখে ৫ হাজার মানুষের একটি বিশাল দলের সাথে তিনি চলে যান ভারতীয় সীমান্তে। সেখানে আশ্রয় নেন এক দরিদ্র মাসির কাছে।

এভাবে কেটে যায় দীর্ঘ দেড় মাস। এ সময় তাঁর যোগাযোগ ঘটে মাহেন্দ্রগঞ্জ থানার প্রেমাংকর রায়, ক্যাপ্টেন আব্দুল মান্নান, জয় রামকুমার, ডা. পিযুষ কান্তি রায় প্রমুখের সাথে। তাঁদের আহ্বানে সন্ধ্যা যোগ দেন ১১ নং সেক্টরের একটি ফিল্ড হাসপাতালে। সেখানে দুই মাস দায়িত্ব পালন করে নভেম্বরের শেষে তিনি মেডিক্যাল টিম ও মুক্তিবাহিনীসহ ১ হাজার লোকের সাথে স্থানান্তরিত হন জামালপুরে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি তিনি সে সময় কয়েকটি অপারেশনেও অংশগ্রহণ করেন। এরপর দলের সাথে শেরপুরে এসে অবস্থান করেন ২৯ দিন।

দেশ স্বাধীন হলে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন সন্ধ্যা ম্রি। ১৯৭১ সালেই বিয়ে করেছেন চার্চিল কুবীকে। ২ ছেলে ১ মেয়ের মা সন্ধ্যা বিয়ের ১০ বছরের মাথায় স্বামী হারান।

ভেরোনিকা সিমসাং : সন্ধ্যা ম্রি'র সহপাঠী ও সম্পর্কীয় বোন। স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জ্বল অবদানে বিশিষ্ট এই গারো নারীর জন্ম ১৯৪৭ সালে টাঙ্গাইলের আমরিতলা গ্রামে। ১৯৭১ সালে সন্ধ্যা ম্রি'র মতো তিনিও হালুয়াঘাট মিশন হাসপাতালের নার্সিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ববর্তী সময়গুলোতে সন্ধ্যা ম্রির সাথে একত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন ভেরোনিকা সিমসাং। তাঁর স্বামী নগেন্দ্র জিবরার। তাঁদের ১ ছেলে এবং ১ মেয়ে। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে মৃত্যুবরণ করেন বীর সেনানী ভেরোনিকা সিমসাং।

বিভা সাংমা : ১৩৪১ বঙ্গাব্দে নেত্রকোনা জেলার বিরিশিরিতে জন্ম নেন বিভা সাংমা। বিরিশিরি মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি চলে যান কলকাতায়। ১৯৫১ সালে কলকাতার সেন্ট মার্গারেট স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। সেখানে টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যোগ দেন শিক্ষকতা পেশায়। এরপর ১৯৫৬ সালে আইএ এবং ১৯৬২ সালে বিএ ডিগ্রি অর্জন করে পরবর্তীতে বিএড এবং এমএড সম্পন্ন করেন। শিক্ষার এই ব্যাপ্তি বিভা সাংমার বোধে সংক্রমিত করেছিল গারো সমাজের সামগ্রিক উন্নতির স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর শিক্ষকতা পেশায় প্রথম যোগ দেন একটি জুনিয়র স্কুলে। পরবর্তীতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে স্বীয় প্রচেষ্টায় একে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুলে পরিণত করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে তিনি ভারতে চলে যান। সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও যথাযথ ট্রেনিং গ্রহণের ব্যবস্থা করতেন বিভা সাংমা। এভাবে প্রায় ৩০/৪০ জন গারো যুবকের ট্রেনিং সমাপণের পর দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন তিনি। এভাবে বহুমুখী কর্মতৎপরতায় বিভা সাংমা এদেশের জন্যে বিজয় ছিনিয়ে আনতে অবদান রেখেছেন।

যুদ্ধ শেষেও যুদ্ধ থামাননি বিভা সাংমা। এখনো তিনি যুদ্ধ করে চলছেন গারো সমাজে প্রচলিত অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, জনবিস্ফুরণের বিরুদ্ধে। এ লক্ষ্যে নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছেন পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, আদিবাসী কালচারাল একাডেমী প্রভৃতি।

উর্মিলা জ্যাম্বেল : ১৯৪৯ সালের ১৫ মার্চ নেত্রকোনা জেলার পূর্ব নলছাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন উর্মিলা জ্যাম্বেল। মা সরোজিনী জ্যাম্বেল, বাবা অশ্বিনী নকরেক। মেয়ের পড়াশোনার প্রতি কৃষক বাবার অপরিসীম অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় উর্মিলা নলছাপড়া মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ভর্তি হন বিরিশিরি গার্লস স্কুলে। সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তিনি ভর্তি হন ময়মনসিংহ হলিফ্যামিলি স্কুলে। এখান থেকেই ১৯৬৬ সালে এসএসসি পাশ করেন উর্মিলা। এরপর ১৯৬৯ সালে মমিনুন্নেসা গার্লস কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে একই কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হন।

১৯৭১ সালে তিনি যখন ডিগ্রি পরীক্ষার্থী, শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে নিরাপত্তার আশায় তিনি অন্যান্যদের সাথে ভারতের বাঘমারা ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে আরো ৫ জন সহপাঠীর সাক্ষাৎ পান উর্মিলা। দায়িত্ব নেন শরণার্থীদের নাম লিস্ট করার। এরপর বিপ্লবী নারী লতিকা এন মারাকের হাত ধরে নামেন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে

প্রচারপত্র ও পত্রিকা বিলির কাজে। খাবারের মতোই খবরের জন্য অপেক্ষা করতেন তাঁরা। তাই এই কাজে ঝুঁকি থাকলেও উৎসাহ পেতেন উর্মিলা জ্যাম্বেল। পাশাপাশি বিভিন্ন মিছিল-মিটিং ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন তিনি।

চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়ার পর দেশে ফিরে এসে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন উর্মিলা। ১৯৭২ সালে ডিগ্রি পাশ করে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন একটি স্থানীয় হাইস্কুলে। স্বামী প্রলয় জাম্বেল এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দাম্পত্য জীবনে তাঁরা দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের বাবা-মা।

চাকমা নারী

গোমতী

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের নেতিবাচক ভূমিকার কারণে চাকমা সম্প্রদায়ের অবদানকে একপেশেভাবে বিচার করা হয়। অথচ স্বভাবগত সাহসের অধিকারী চাকমাদের একাংশ ত্রিদিব রায়ের অনুসারী হলেও বাকি দেশপ্রেমিক অংশের পূর্ণ সমর্থন ছিল ১৯৭১-র অবদান অসংখ্য চাকমা নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্ব রেখেছেন যুদ্ধে। সম্মান সম্ভ্রম ও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন অসংখ্য চাকমা নারী, ইতিহাস আজো যাঁদের বিস্মৃত রেখেছে।

তেমনি এক চাকমা নারী গোমতী (ছদ্মনাম)। জন্ম আনুমানিক ১৯৪৭ সালে রাঙামাটির মাটিরাঙায়। স্থানীয় স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ২৫/২৬ বছর, সরকারি চাকুরে। যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন রাঙামাটিতে অবস্থান করলেও মে মাসের প্রথম দিকে জন্মস্থান মাটিরাঙাতে চলে যান গোমতী। সেখানে দেড় মাস থাকার পর স্থানীয় রাজাকারদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে রাঙামাটিতে ফিরে আসার পরিকল্পনা করেন।

বিপর্যস্ত সেই সময়ে রাঙামাটিতে আসার একমাত্র বাহন ছিল লঞ্চ, তাও দিনে একটি। অন্যদিকে পথিমধ্যে পাক সেনাদের নজরে পড়ার ভয়ও ছিল তাঁর। তাই অনেক ভাবনা চিন্তা করে একটি লঞ্চে উঠলেন। কিন্তু বিধি বিরূপ। যে লঞ্চে চড়লেন গোমতী, সেই লঞ্চে বোঝাই ছিল পাকিস্তানি সৈন্য। এতদিনের আতঙ্কের মুখোমুখি গোমতী। পাক হায়েনাদের লোলুপ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যান তিনি। পথসঙ্গী মধ্যবয়স্কা আত্মীয়ের মাধ্যমে তাঁর ধরা পড়ার খবর গোমতীর বাবার কানে গেলে তিনি মেয়েকে রক্ষার জন্যে হেডকোয়ার্টারে গিয়েও বিফল হন। অবশেষে দুদিন পর সেই পাক সেনারাই রাঙামাটির একটি রাস্তায় রেখে যায়

তাঁকে। সেখান থেকে তিনি নিজেই চলে গেলেন সেই আত্মীয়ের বাড়ি। দুদিন আগে যেখানে যাওয়ার কথা ছিল। ইতোমধ্যে আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছেছিল তাঁর অপহরণের দুঃসংবাদ। তাই তারা গোমতীকে গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন না। অথচ দুদিন পূর্বে তারাই গোমতীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ক্যাম্পে কাটানো দুদিনের দুঃসহ স্মৃতি আর আত্মীয় বাড়ির প্রতিমুহূর্তের মানসিক যন্ত্রণায় মুষড়ে যেতে থাকেন গোমতী। অবশেষে অনেক কষ্টে সাতদিন পর নিজ বাড়িতে ফিরে যান তিনি। কিন্তু নিজ বাড়ির পরিবেশও রাতারাতি পাল্টে যায় তাঁর এই ঘটনায়। সবাই তাঁর দিকে তাকায় এমন এক দৃষ্টি নিয়ে যেন কোনো চরম অপরাধীকে দেখছে। অন্যদিকে তাঁর বাবা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পূর্বেই মেয়ের বিয়ে দিতে। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। বর পক্ষ ঠিকই সব জেনে যেত। এরপর যুদ্ধ শেষ হয়, গোমতীর বুকে জমাট বেঁধে থাকে একাত্তর নামক একটি অসীম কষ্ট।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি পরিবার, আত্মীয় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা থাকতে সচেষ্ট হন। অপেক্ষা করতে থাকেন নতুন কোনো স্বপ্নের। আসেও একবার সেই স্বপ্ন। সহকর্মী এক বাঙালির সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ায় গর্ভে সন্তান আসে গোমতী চাকমার। না, এই ঘটনায় কোনো ভয় ছিল না। কারণ তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন বিয়ে করতে। কিন্তু ছেলের মা 'মেলেটারির সঙ্গে থাকা' মেয়েকে পুত্রবধূর স্বীকৃতি দিতে রাজি না হওয়ায় গোমতীর বিয়ে হল না। দু'বছর আগের লাঞ্ছনা কাটতে না কাটতেই নতুন লাঞ্ছনার শিকার হয়ে জীবন্মৃত হন গোমতী। অন্যদিকে, সকল ধরনের লাঞ্ছনাকে তুচ্ছজ্ঞান করে পৃথিবীতে আসে গোমতীর সন্তান। ধর্ষিতা এবং অবৈধ মা– এই দ্বিমুখী সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও নিজ সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট তিনি। সন্তানের মুখ চেয়েই তিনি ভুলে থাকতে চান একাত্তর নামের দুঃসহ স্মৃতির অস্তিত্ব।

জ্যোতিপ্রভা লারমা

বিপ্লবী চাকমা নারী জ্যোতিপ্রভা লারমার জন্ম ১৯২৬ সালে রাঙামাটি জেলার ছোট মহাফ্রম নামক গ্রামে। পিতা চিত্তকিশোর লারমা এবং মা শুভাসিনী দেওয়ান। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি রাঙামাটিতে চলে আসেন। ১৯৫৪ সালে চাকরি নেন ক্যাথলিক মিশন স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। এরপর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ভিলেজ এইড নামক সংগঠনে যোগ দিয়ে গ্রামের মেয়েদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপাত হন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের প্লাবনে ঘরবাড়ি ভেসে গেলে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সপরিবারে স্থানান্তরিত হন জ্যোতিপ্রভা লারমা। এখানেই কেটেছিল তাঁর একাত্তরের দিনগুলি।

চাকমা এলাকায় বসবাস করায় সেখানে মুক্তিযুদ্ধের তেমন তৎপরতা ছিল না। জ্যোতিপ্রভা চাকমা যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছেন; রাজাকার ও শত্রু সেনাদের অবস্থান বলে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। কখনো আশ্রয় দিয়েছেন আশ্রয়প্রার্থী নারী-পুরুষদের, ঘর থেকে খাবার তুলে দিয়েছেন অভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের। স্বাধীন এই দেশের সমৃদ্ধির জন্যে এখনো উদারপ্রাণ এই ব্যক্তিত্ব নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে।

বসুন্ধরা দেওয়ান

আদিবাসী নারীদের মধ্যে প্রথম মহিলা হেডম্যান ও বাজার চৌধুরীর মর্যাদাপ্রাপ্ত চাকমা নারী বসুন্ধরা দেওয়ান। ১৯২৮ সালে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার ঢালা গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা ব্রজমোহন দেওয়ান ও মা চন্দ্রাননী দেওয়ানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বসুন্ধরা দেওয়ান। কমলছড়ি এমি স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি নার্সিংয়ে ডিপ্লোমায় ভর্তি হন চন্দ্রঘোনা হাসপাতালে। ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে ১৯৪৫ সালে চিত্রশিল্পী চুনীলাল দেওয়ানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বসুন্ধরা দেওয়ান। তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে বিয়ের দশ বছরের মাথায় ১৯৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন স্বামী চুনীলাল দেওয়ান। তবুও থেমে থাকেন নি বসুন্ধরা। ১৯৬৮ সালে নানিয়ারচর উপজেলার হেডম্যানের সনদপত্র লাভ করে তিনি ভূষিত হন রাজকীয় সম্মানে। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন এই এলাকার বাজার চৌধুরী। তাই পাক আর্মিরা প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিত। এসময় অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচিয়েছেন তিনি। নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন অসহায় মানুষদের। সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষার্থে এলাকার যুবতি মেয়েদের কৌশলে পাঠিয়ে দিয়েছেন দূরবর্তী নিরাপদ স্থানে। বসুন্ধরা দেওয়ানের বুদ্ধিমত্তা ও উদারতায় ধরা পড়েও বেঁচে গিয়েছেন পাকিস্তান উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরে মোকাদ্দেস মিয়া, হিন্দু ভদ্রলোক কামাক্ষা চরণ দেব নানিয়ারচর ডাকবাংলার গার্ড ভুলু চাকমা প্রমুখ। এখনো জীবনের এই ক্লান্তলগ্নে অক্লান্ত উদ্যমে দেশের কল্যাণে তিনি করে যান মানবকল্যাণ।

মাহাতো নারী

তেরেসা মাহাতো

বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম মাহাতো। উত্তরবঙ্গের সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট ও রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বসবাস। এই জনগোষ্ঠীরই এক বীর মহিয়সী নারীর নাম তেরেসা মাহাতো। ১৯৫১ সালে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটের রাজবাড়ির শীতল গ্রামে তাঁর জন্ম। কৃষক পিতা যহন গনো এবং

মাতা জলেশ্বরীর প্রথম সন্তান তেরেসার পড়াশোনা শুরু হয় দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপ্‌স স্কুলে। ১৯৭০ সালে এই স্কুল থেকেই তিনি এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল স্রোতে চরাচর বিস্তৃত, তখন তিনি দিনাজপুর পিটিআইতে ট্রেনিংরত। বচনায় তখন পিটিআই'র ছাত্রীদের নার্সিংয়ে প্রশিক্ষণের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় মিশন হাসপাতালে। ২৫ মার্চ রাতে দেশব্যাপী হায়েনাদের নির্বিচার নিধনযজ্ঞ চললে তেরেসাও তাতে আক্রান্ত হন। তাঁর হাত, পা ও মাথায় গুলি লাগে পাক সেনাদের। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তেরেসা সুস্থ হবার আগেই রত হয়ে যান যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য সেবায়। এভাবেই তেরেসা প্রাণের আবেগে জড়িয়ে যান মুক্তির মহান যুদ্ধে।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ১৯৭২ সালে মরিয়মপুর মিশন স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয় তেরেসা মাহাতোর। দীর্ঘদিন এখানেই চাকরি করে ২০০২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ ছেলে ও ১ মেয়ের জননী। তাঁর স্বামীর নাম সুভাষ মাহাতো।

চা বাগানের নারী

ব্রিটিশ শাসনামলেই বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বেশ কয়েকটি চা বাগান গড়ে ওঠে। জানা যায়, ১৮৪০ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে চা বাগান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে। ১৮৫৬ সালে সিলেট অঞ্চলে চা গাছ আবিস্কৃত হলে এই প্রচেষ্টা আরও কার্যকরী হয়ে ওঠে। তবে বাংলাদেশে চা বাগানের দ্রুত বিস্তার ঘটে মূলত উনিশ শতকের শেষদিকে। বর্তমান বাংলাদেশে মোট ১৫৯টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলার ৫ থানায় ২০টি, মৌলভীবাজারের ৬ থানায় ৯২টি, হবিগঞ্জের ৪ থানায় ২৩টি, চট্টগ্রাম জেলার ৫ থানায় ২২টি এবং রাঙামাটি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১টি করে চা বাগান রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর এসব চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয় সাধারণত সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। কারণ পুঁজিবাদী ব্রিটিশ আইনে শাসিত এসব চা বাগানে নামমাত্র মজুরিতে শ্রমদানে বাধ্য ছিল তারাই, এদেশের কতিপয় নিঃস্ব দরিদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী নৃগোষ্ঠী। এখনো বেশিরভাগ চা বাগানের শ্রমিকদের দিন কাটে নিত্য উপবাসে। তাঁদের সন্তানদের জন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই কোনো শিক্ষার সুযোগ।

বিভিন্ন ভাষাভাষীর বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠীর মানুষ এই চা বাগানগুলোতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হল– রাজগৌড়, কুর্মী, খাড়িয়া, রবিদাস, তাঁতী, নায়েক, মাহালী প্রভৃতি। কেবল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নয়, পাকিস্তান-পর্বে সংগঠিত বিভিন্ন ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন এইসব চা বাগানের শ্রমিকরা। বিশেষ করে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে ছয় দফা-এগারো দফা দাবি আদায়ের

ধ্বনিতে রাজপথ কেঁপে উঠলে সেই স্পন্দন পাহাড়ি, টিলা, অরণ্য পেরিয়ে চা শ্রমিকদের নিথর জীবনেও আঘাত হেনেছে বারবার। পাকিস্তান সরকার মনোনীত ইউনিয়ন নেতা এস. সুলেমান চা শ্রমিকদের কুঁড়েঘর প্রতি মাসিক ৬ টাকা করে ঘরভাড়া ধার্য করলে হতদরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সুরেন্দ্র চন্দ্র বুনারজি, জয় চাঁদ বুনারজি, পবনকুমার তাঁতী প্রমুখ সুলেমান-বিরোধী আন্দোলনকে একটি সংগঠিত রূপ দিতে ইউনিয়নের ভেতর একটি বিকল্প নেতৃত্ব গড়ার চেষ্টা চালান। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৩ এপ্রিল শমসের নগর ফ্যাক্টরির সামনে প্রতিবাদী চা-শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে শাসক শ্রেণীর পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান নীরা বাউরী।

এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় পার্শ্ববর্তী চা বাগানগুলোতে। আইনের নানামুখী বাঁধন ভেঙে সর্বহারা চা শ্রমিকরা আরো তীব্র হয়ে ওঠেন তাঁদের অধিকার আদায়ের দাবিতে। ১৯৭১ সালের প্রথমপর্বে পাক সেনারা চা বাগান সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধি করলে চা-শ্রমিকদের মধ্যে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। তখন থেকেই ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চলতে থাকে পরিস্থিতি মোকাবেলার। কোনো কোনো চা বাগানে সে সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'সংগ্রাম কমিটি' গড়ে ওঠে। এরপর আসে কালো রাত ২৫ মার্চ। ২৫ মার্চে পাকিস্তানিদের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চা শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনায় সংযোগ করে বাড়তি মাত্রা। ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ও ২৭ মার্চের বেতার ভাষণে উদ্বেলিত হয়ে পথে নামেন সংগ্রামী চা শ্রমিকরা। সংকল্প নেন, মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের সহায়তা প্রদানে।

কয়েকজন সংগ্রামী নারী চা-শ্রমিকের কথা

বাবনী রাজগৌড়

বাবনী রাজগৌড়ের স্বামী গৌড়া রাজগৌড় ছিলেন কমলগঞ্জের পাত্রখোলা চা বাগানের শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক। বাবনী রাজগৌড় এই বাগানেরই শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে স্বামীর ডাক পড়লে বাবনীও তাতে সংযুক্ত হন। চা বাগান ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতেন যুদ্ধে সহায়ক তথ্যাবলি। কিন্তু অচিরেই যুদ্ধের সাথে মনেপ্রাণে জড়িয়ে যাওয়া এই দম্পতি শিকার হন ষড়যন্ত্রের। স্থানীয় রাজাকারদের ইন্ধনে একদিন তাঁদের ঘরের দরজায় আঘাত হানে পাক হায়েনার দল। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় স্বামীসহ বাবনী রাজগৌড়কে। এক অপরিসীম অসহায়ত্ব নিয়ে রয়ে যায় তার দুটি শিশুকন্যা। এই ঘটনার ১ মাস পর জানা যায়, বাবনীকে তাঁর স্বামীর সাথে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীমঙ্গল আর্মি হেড কোয়ার্টারে। ক্যাম্পের সামনের বটগাছের

সাথে বেঁধে ব্রাশ ফায়ার করে মারা হয় তাঁদের। কিন্তু তাঁদের মৃতদেহ আর পাওয়া যায়নি।

এই শহীদ দম্পতির রেখে যাওয়া ২টি কন্যা সন্তানের একজন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। বর্তমানে বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তান পুতুল রাজগৌড় এখনো জানেন না তাঁর পিতামাতার নাম সরকারি শহীদদের তালিকায় উঠেছে কি না।

রাঙামা কুর্মী : মৌলভীবাজারে কমলগঞ্জ থানার একটি বাগানের নাম ধলাই চা বাগান। বহু কারণে বিশিষ্ট এই চা বাগানটির অবস্থান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছে। তাই ১৯৭১ সালে এখানে স্থাপিত হয়েছিল এক কোম্পানি পাকসেনা ও ভারী অস্ত্রসমৃদ্ধ ক্যাম্প। এখানে অপারেশন চালাতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হন মুক্তিযোদ্ধারা। পরবর্তীতে এই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাতে ভারতীয় কমান্ডারের সাথে মেজর জিয়া যুক্ত হন।

২৮ অক্টোবর ১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধের এই বিশেষ দিনটিতে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে ধলাই ক্যাম্প আক্রমণ করে। ১ নভেম্বর পর্যন্ত চলা টানা যুদ্ধে প্রাণ হারান বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন জাতীয় বীর।

রাঙামা কুর্মী এই ধলাই চা বাগানেরই মেয়ে। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ২৩ বছরের এক বিবাহিতা নারী। এই বাগানের বহু অপমানিত নারীর তিনি একজন। ১৯৭১-র জুন মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে আসে রাঙামার চরাচর। বাগানের আরো তিনজন যুবকের সাথে স্বামীকে তুলে নিয়ে মেরে ফেলে পাক হায়েনারা। স্বামীকে বাঁচাতে প্রবল কাকুতি মিনতি করেও কোনো লাভ হয়নি। বরং এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই যখন রাঙামা শাশুড়ির সাথে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে ধরা পড়ে যান পাক সেনাদের হাতে। এরপর তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কদমতলী বাংকারে। সেখানে রাতভর রাঙামার উপর চলতে থাকে বহু অমানুষের অকথ্য অত্যাচার। পরের দিন দুপুরে জ্ঞানহীন রাঙামাকে ফেলে দেওয়া হয় বাংকারের সামনের রাস্তায়। এই ঘটনার পর আর স্বাভাবিক হতে পারেননি বীরাঙ্গনা রাঙামা। কয়েকদিন পর শরণার্থী হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রাককালে হার্টফেল করে মারা যান বীরাঙ্গনা রাঙামা কুর্মী।

লক্ষ্মী সবর

ভারতীয় সীমান্ত-লাগোয়া একটি চা বাগান শ্রীমঙ্গলের খেজুড়ীছড়া চা বাগান। চতুর্দশী লক্ষ্মী সবর এই বাগানেরই চা শ্রমিক গোপাল সবরের আদরের মেয়ে। আসন্ন যুদ্ধের ঘনঘটায় থমথমে সারাদেশ। গোপাল তৎপর হন লক্ষ্মীর বিয়ে দিতে। এরই মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তা আর হয়ে ওঠে না। ক্রমান্বয়ে

যুদ্ধের রেশ চা বাগানে ছড়িয়ে পড়লে লক্ষীকে নিয়ে পিতার উদ্বিগ্নতা বেড়ে যায় আরো কয়েকগুণ। কয়েকদিন বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। পাক হায়েনার হাতে ধরা পড়ে যান লক্ষী সবর। সময়টা জুলাইয়ের মাঝামাঝি ; বর্ষাঋতুর একটি দিন। লক্ষী সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে রাজাকাররা খবর দেয় পাক সেনাদের। অতঃপর শান্ত মাটি কাঁপানো গাড়ি আর বুটের শব্দ চলে আসে লক্ষী মেয়েটির খুব কাছে। চতুর্দিকে অমানুষদের বিকৃত উল্লাস। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন লক্ষী সবর। এই অবস্থাতেই গাড়িতে তুলে নেয় পাক সেনারা। নিয়ে যায় সিন্দুর খান সেনানিবাসে। এখানেই কেটেছে তাঁর তিন মাসের নারকীয় জীবন। সীমাহীন নিপীড়নে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে গেলে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে ক্যাম্পের সামনের রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। কিছুক্ষণ বেঁচে থেকে এখানেই অসহায় মৃত্যু ঘটে লক্ষী সবরের। এরপর তাঁর শেষ অশ্রয় হয় ইপিআর ক্যাম্পের বধ্যভূমি।

বিন্দু নায়েক

বিন্দু নায়েক। চোদ্দ ছোঁয়া এক আদিবাসী কিশোরী বালিকা, পিতা দুর্গা নায়েক মৌলভীবাজার জেলার শিলুয়া চা বাগানের শ্রমিক। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সরব উপস্থিতি আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন পিতা দুর্গা নায়েক। তাঁর উদ্বিগ্নতা কিশোরী বিন্দুকে নিয়ে। একমাত্র কন্যার যাতে কোনো সর্বনাশ না হয় তাই পরামর্শ নিতে যান চা বাগানের ইংরেজ ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার সরল মনে অভয় দিলে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে থাকেন দুর্গা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে।

অন্যদিকে স্থানীয় রাজাকারদের মাধ্যমে পাক সেনাদের কাছে পৌছে যায় ঘরে বিন্দুর একা থাকার খবর। এমনি একটি অনুকূল সময়ে শেয়ালের মতো বিন্দুর ঘরে ঢোকে পাঁচ-ছয়জন পাকসেনা। বিন্দুর আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। কিন্তু কেউই প্রাণভয়ে এগিয়ে আসেনি সেদিন। ঘরের মধ্যেই দীর্ঘক্ষণ নারকীয়তা চলে বিন্দুর শরীরে। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায় হানাদাররা। মাটিতে পড়ে থাকেন রক্তাক্ত জ্ঞানহীন বিন্দু নায়েক।

পরবর্তী নিপীড়নের আশঙ্কায় সেদিন রাতের আঁধারেই বিন্দুকে নিয়ে বাবা-মা চলে যান ভারতে। কিন্তু বিন্দুকে তারা বাঁচাতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের কয়েকদিন পরে স্বাধীন দেশে তিনি অভিমানে ত্যাগ করেন এই পৃথিবী।

শান্তি ভৌমিজ/ভূমিজ

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বসবাসরত ভূমিজ আদিবাসীদের একটি অংশের বাস সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন চা বাগানে। মিতিঙ্গা চা বাগান তার মধ্যে একটি। শান্তি ভৌমিজ এই বাগানেরই চা শ্রমিক অর্জুন ভৌমিজের স্ত্রী। স্বামী অর্জুনের অস্তিত্বের

আদিগন্ত জড়িয়ে ছিল মানুষের অধিকার আদায়ের মন্ত্র। রাজপথে সংগঠিত ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানকে নিভৃত চা বাগানেও ধারণ করেছিলেন অর্জুন ভৌমিজ। অন্যদিকে, স্ত্রী শান্তি ভৌমিজ ছিলেন একেবারে অন্যরকম। শান্তস্বরে কেবল শান্তিই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। অথচ সেই শান্তির ঘরে অশান্তির বিষ নিয়ে একদিন ঢুকে পড়ে ৫ জন পাকসেনা। ঘরের মধ্যেই পাঁচ পশুর উপর্যুপরি বলাৎকারে যখন শান্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখনি চলে যায় পাকিস্তানিরা। জ্ঞানহীন অবস্থায় তাঁর নাক-মুখ দিয়েও অবিরল ধারায় রক্ত ঝরছিল। জানা যায়, স্বামী অর্জুনকে শায়েস্তা করার জন্যে স্থানীয় রাজাকারদের প্ররোচনায় ধর্ষিত হয়েছিলেন শান্তি। এই ঘটনার পর সাত দিন বেঁচে ছিলেন শান্তি ভৌমিজ। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি।

অহল্যা চাষ

সিলেটের মণিপুর চা বাগান। এই বাগানেই শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মুকুন্দ চাষা। অহল্যা ছিলেন তাঁরই স্বপ্নের সন্তান, আদুরে মেয়ে। গোলাব চাষার প্রিয়তম পত্নী। শান্তিতেই কাটছিল দিনগুলো উভয়ের। যুদ্ধ কিছু সৃষ্টি করলেও ধ্বংস করে দেয় সবকিছু। একথাই যেন সত্য হয়ে উঠেছিল সেদিন, যেদিন রাজাকারদের সহায়তায় অহল্যার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল রক্তপিপাসু পাক সেনারা। ত্রিশ বছরের এক মমতাময়ী নারীর দেহটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় তথাকথিত সভ্য জগতের বাসিন্দারা। নিয়ে যায় মণিপুর চা বাগানের রেস্ট হাউসে। তখন থেকে প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো পশুর আস্তানায় যেতে হয়েছে তাঁকে পশুদের খেদমত করার জন্যে। রাজাকার আবদুল হক তার ট্রাকটরে তুলে সন্ধ্যায় নিয়ে যেত অহল্যা চাষাকে। আর পরদিন সকালে ফিরে আসত একটি জ্যান্ত লাশ নিয়ে। শত আকুতি আর আর্তচিৎকারেও মানবতা দেখায়নি পাক পশুরা। তাঁকে না পেলে নরপশুরা তাঁর স্বজনদের মেরে ফেলবে ভয়ে কখনো আত্মহত্যা বা পালানোর চেষ্টা করেননি অহল্যা। এভাবেই জ্বলতে জ্বলতে নিভৃতে নিভে যায় একটি দীপ, অহল্যা চাষা। অবশেষে তাঁর লাশটিও পায়নি তাঁর পরিবার।

একই রকম অথবা তাঁর চেয়েও করুণ পরিণতির শিকার হয়েছেন এদেশের অসংখ্য আদিবাসী নারী। মুক্তির জন্যে তাঁদের এই আত্মোৎসর্গের কথা ইতিহাস লিখে রাখে না। সে কথা রয়ে যায় আদিবাসী নর-নারীর মুখে মুখে মহত্বের মহিমা নিয়ে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকজন বীরাঙ্গনা নারী হলেন– ডসঙ্কুর খান চা বাগানের মুরতিয়া রবিদাস, শিশের বাড়ি চা বাগানের মাহালী তাঁতী, ফাঁড়ি কাপাই চা বাগানের সাবিত্রী নায়েক, সিলুয়া চা বাগানের সুরোধনী নায়েক, চান্দপুর চা বাগানের যশোধা নায়েক, সোনারুপা চা বাগানের লক্ষ্মী রানি লামা, মণিপুর চা বাগানের ধনী কর্মকার, খাদিম নগর চা বাগানের রেবতী মাহালী, লক্ষ্মীছড়া চা বাগানের শুভদ্রা বাইরী, ছোটলেখা চা বাগানের যমুনা ভূমিজ প্রমুখ।

একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা

পাঁচ হাজার বছরের দালিলিক (Recorded) ইতিহাস সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকা আমাদের বঙ্গ ভূখণ্ড, অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশ। ভারত বার্মা আর বঙ্গোপসাগরের বেষ্টনে লাল-সবুজের স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলাদেশের সুপ্রতিভ অবস্থান। যুগে যুগে যোজন যোজন দূর থেকে আগত মনীষীরা পাগল হয়েছেন এর প্রকৃতির প্রেমে, পাগল হয়েছেন নৃতাত্ত্বিকরা এর বৈচিত্র্যময় বিন্যাসে। অন্যদিকে এর সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনায় লালায়িত হয়েছে লোভিরা, লুণ্ঠনে লুণ্ঠনে জর্জর করেছে অসংখ্যবার। যখন নিতান্তই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখনই প্রতিবাদী হয়েছে এদেশের সহজ-সরল মানুষ। অসীম ত্যাগের বিনিময়ে জন্ম দিয়েছে এক একটি মহাকাব্যের। পৃথিবীর ইতিহাসগ্রন্থে স্বর্ণের হরফে লেখা তেমনি এক মহাকাব্যের নাম ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ। মহান সেই যুদ্ধে এদেশের মানুষ তাদের রক্তের নদী বেয়ে নিয়ে এসেছে স্বাধীনতার সাম্পান। আর এত অল্প সময়ে এত বড়ো অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেই সংগ্রামে, দেশের আপামর জনসাধারণের সম্পৃক্ততার কারণেই। সম্পৃক্ততা ছিল এদেশের বাঙালি ভিন্ন আরো অর্ধশত জনগোষ্ঠীর, যারা আমাদের মূলস্রোতেরই অংশ, এই দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়। এক প্রাথমিক হিসেবে জানা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক সহস্র, যুদ্ধে শহীদ আদিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক অর্ধশত। সংখ্যাহীন এমন অনেক আদিবাসী যোদ্ধা রয়েছেন যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ চলাচলে অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব রেখে এদেশের বিজয়কে অনুকূলে এনে দিয়েছেন। অথচ স্বাধীন দেশের ক্রমাগত নিগ্রহ, বঞ্চনা ও অস্বীকৃতি তাঁদের অনেককে আজ দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছে, কুণ্ঠিত করছে মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিতে। তেমনি এক অবহেলিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বীর মুক্তিযোদ্ধা, আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত বীরবিক্রম ইউকে চিং মারমা।

মুক্তিযোদ্ধা ইউকে চিং বীরবিক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ৪৫টি আদিবাসী বা অবাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত বীরসেনার নাম। জন্ম ১৯৩৭ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর থানার লাঙ্গিপাড়া গ্রামে। মাতা হ্লাংসাউ আর পিতা বাউসাউ মারমা। স্থানীয় বোমাং

রাজা পরিচালিত স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পন্ন করে ইউকে চিং ১৯৫২ সালে ভর্তি হন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এ। দীর্ঘ ৩০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষে ১৯৮২ সালে অবসর নেন হাবিলদার মেজর হিসাবে। বর্তমানে তিনি তাঁর জন্মস্থান লাঙ্গিপাড়ায় অবসরজীবন যাপন করছেন।

'আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা' শিরোনামে পরিচালিত বর্তমান গবেষণা কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে আমরা সারাদেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাক্ষাত করি। সাক্ষাত করি ইউকে চিং মারমার সাথে পাহাড়ের দীর্ঘ প্রান্তদেশ পেরিয়ে ২০০৭ এর জুন মাসের একটি দিনে, তাঁর প্রান্তিক বসতভিটায়। চারিদিকের আরণ্যক আবহে আমরা আবিষ্কার করি ইউকে চিংকে। নড়বড়ে ঘরটিতে ঝোলানো ছিল তাঁর যৌবন ও যুদ্ধকালীন কিছু ছবি। কেবল অস্পষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রাণবন্ত তাঁর হাসি। সেদিনের সেই অন্তরঙ্গ আলাপে তিনি অকৃপণভাবে উন্মোচন করেছিলেন তাঁর জীবন ও যুদ্ধের অনেক অনুল্লিখিত কথা। নানাবিধ নিগ্রহে নিপতিত একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত আদিবাসী এই যোদ্ধা নিজেকে একরকম আড়াল করেই রেখেছেন। আড়ালে রয়েছি আমরাও তাঁর কাছ থেকে বহুদিন। বীরবিক্রম ইউকে চিং-এঁর সাথে সাক্ষাতের পুরো বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল।

ইপিআর–যে জীবন অন্য জীবন

প্রশ্ন : পাহাড়ের কোলে কেমন কাটত জীবনের প্রথম বেলা !

উত্তর : নিজের লোকালয়ের পাহাড়গুলোকে ভালোবাসতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলাম পৃথিবীর সব পাহাড়মাতাকে। বুঝতে না পারার মতো ছোটো যখন, তখন ভাবতাম– আমার আর আমাদের জন্ম বুঝি বা ঐ পাহাড়কোল ফুঁড়েই। তাই তো তারা মানুষদের আশ্রয় দেয়, আহার দেয়। সত্যিই বুঝতে পারার মতো সময়ের অনেকটা পেরুনোর পর ভাবতে পারতাম না পাহাড় ছেড়ে আমি পালাতে পারব !

প্রশ্ন : কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে পারলেন কী করে !

উত্তর : স্বভাবতই প্রকৃতিতে আমি ছিলাম এক আদর্শ দুষ্ট ছেলে। পড়াশোনা কিছুটা করেই তাতে ক্ষান্ত দিয়েছিলাম। সব ছেড়ে ছন্নছাড়া আমি কাজের চেয়ে অকাজেই লিপ্ত থাকতে পছন্দ করতাম। সেই দশা থেকে মুক্ত করার জন্যে আমার এক ভগ্নিপতি আমাকে জোর করে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ইপিআর-এ ভর্তি করে দেন। এটাকে পালানো না বলা গেলেও এটাই ছিল পলায়ন প্রক্রিয়ার শুরুর পর্ব। কেননা, কিছুদিন গত হতেই আমি আমার প্রাচীন সংস্কারকে এড়াতে পেরেছিলাম।

প্রশ্ন : ইপিআর-এ যোগ দেবার পর প্রথমপর্ব সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি তখন নিতান্তই এক পাহাড়ি কিশোর। ভেতরে সর্বদা ভয় ভয়। জন্মস্থান বান্দরবান থাকাকালে সমতলের মানুষদের সঙ্গে তেমন করে মেশার

অভিজ্ঞতাও তেমন ছিল না। তাছাড়া আমি পাহাড়ি, আমাদের খাদ্যাভাসও আলাদা। খাবারের সময়গুলো পাহাড়ি সমাজে খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। প্রথম দিকে এসব ব্যাপারে অনভ্যাসহেতু কিছু সংকোচ ও সমস্যা মানসিকভাবে পীড়া দিত বৈকি! কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা অচিরেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই ট্রেনিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ায়। ট্রেনিংয়ে শেখানো কৌশলগুলো ও শরীর গঠন করার প্রাপ্ত পদ্ধতি আমার কাছে মজার কোনো খেলার মতোই মনে হয়েছে। কারণ, আমি পাহাড়ি ছেলে, পাহাড়িদের জীবন আরো অনেক কঠিন ও কৌশলময়। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতাম। এমনকি আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, ১৯৭১ সালে এবং অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন দলকে ট্রেনিং দেওয়ারকালে আমি আমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে দেখেছি। আমার অধীনস্থরা সেগুলো ভালোভাবেই গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে পেরেছেন মুক্তির মহান যুদ্ধে।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি কোথায় অবস্থান করেছিলেন !

উত্তর : তখন আমি রংপুরের হাতিবান্ধায় ইপিআর-এর বর্ডার আউটপোস্টে নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। যুদ্ধ শুরু হলে আমাকে হাদিলদার পদে উন্নীত করা হয়।

প্রশ্ন : সে সময়ে আপনি উল্লেখযোগ্য কোন কোন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছেন ?

উত্তর : আমার অধীনস্থ দলে ৬৫ জন সৈনিক ছিল। আমি তাদের নিয়ে রংপুর, লালমনিরহাট, পাখিউড়া, কাউয়াহাগা, বাঘবান্ধা, হাতিবান্ধা, চৌধুরীহাট, ভুরুঙ্গামারী, কুলাঘাট প্রভৃতি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন : এবার, এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো অপারেশনের বর্ণনা করুন।

উত্তর : কাউয়াহাগার অপারেশন দিয়ে শুরু করা যায়। যুদ্ধ দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে কিছুদিন হল। লালমনিরহাট নদীটির ওপারে আমরা একদিন দেখতে পেলাম আগুন জ্বলছে। আমার সঙ্গে গার্ড হিসেবে ছিল দুজন সিপাই। ওদের বললাম, কোনো ফায়ার-টায়ার করার দরকার নেই, শুধু দেখতে থাক। এর আগে অবশ্য আমরা ওখানে অ্যামবুশ করেছিলাম। এক সময় দেখলাম, দুজন পাকিস্তানি প্যান্ট-সার্ট ক্লোজ করে শাড়ি পরে ঘরে ঢুকছে। ভাবলাম, যদি গুলি করি তাহলে হয়ত মারা যাবে, নয়ত পালিয়ে যাবে। ওদের জীবিত ধরতে হবে নয়ত জানা যাবে না মূল ঘটনাটা। তাই ওদের দুজনকে জীবিত ধরে আনার জন্য ৪ জনকে পাঠালাম, সঙ্গে গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে। বলে দিলাম, যদি ঘরে দুটি দরজা থাকে তাহলে দুই দরজায় দুজন দাঁড়াবে আর দুজন ঘরে ঢুকবে। আর যদি একটি দরজা থাকে তাহলে দুজন দরজায় দাঁড়াবে, আর দুজন ঘরে ঢুকবে। যেই কথা সেই কাজ। কিন্তু একজন তবুও পলিয়ে গেল, আর একজন জীবিত ধরা পড়ল। ওটা

ছিল একজন পাঞ্জাবি সেনা। সেনাটিকে ধরে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল– কী জন্য ছদ্মবেশ ধরেছে, তার দলের নেতা কে ! দলের কে কোথায় আছে ইত্যাদি। সে সবই বলে দিয়েছিল। কারণ, তাকে বলা হয়েছিল যে সে বাঁচতে চায়, নাকি মরতে চায় ! যদি বাঁচতে চায় তাহলে আমাদের সব কথা শুনতে হবে, আর মরতে চাইলে এখনই তাকে বেয়নেট চার্জ করা হবে। তাই সে বাঁচার জন্য সবই বলে দিয়েছিল।

সারারাত আগুন জ্বলল নদীর ওপারের গ্রামটায়। তবুও আমরা রাতে কোনো ফায়ার ওপেন করলাম না। কারণ, জানতে পেরেছিলাম পাকিস্তানিদের কেউ আর ওখানে নেই। তাই আমি রাতে সেনাটাকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে পৌঁছে দিতে যাই। অবশ্য ওকে বাঁচিয়ে রাখার বিরুদ্ধে আমার দলের অনেক সেনা আপত্তি তুলেছিল। আমি তখন ঠাণ্ডা মাথায় তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম– ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের স্বার্থেই। তাছাড়া পাকিস্তানিদের হাতে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বন্দি হয়ে আছে। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও ওদের জেলে বন্দি। ওকে আমরা তখনই ফিরিয়ে দেব যখন ওরা আমাদের কমপক্ষে ২০-২৫ জনকে ফিরিয়ে দেবে। তাই রাতেই আমি পাঞ্জাবি সেনাটিকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে হ্যান্ডওভার করে আসি। ওকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি আমার দুজন সেনা নিয়ে আবার নদীর ঘাটে গেলাম। কান পেতে শুনলাম, মহিলা ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। সেপাইরাও শুনল। সারা গ্রাম তো পুড়ে ছাই, বাচ্চারা আসল কীভাবে ! তাড়াতাড়ি করে মাঝিকে খুঁজে বের করে এনে বললাম, নদীর ওপারে গিয়ে তোমাকে জানতে হবে কারা ওখানে কাঁদছে, কেনইবা কাঁদছে! মাঝি তো ভয়ে অস্থির। কারণ, ওখানে পাকিস্তানিরা থাকতে পারে।

যাই হোক, তাকে অভয় দিয়ে পাঠালাম নদীর ওপারে। ফিরে এসে সে বলল, স্যার ওপারে কোনো পাকিস্তানি নাই, অনেক মাহিলা আর বাচ্চা বালির মধ্যে গর্ত করে বসে বসে কাঁদছে। তাকে বললাম, যে করেই হোক ওদেরকে এপারে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। মাঝিকে বললাম, তুমি গিয়ে বল যে, মুক্তিফৌজের হাবিলদার সাহেব আপনাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। এভাবে বারে ৩২ জন মহিলা আর তাদের সন্তানগুলোকে নদী পার করে এনে গ্রামের স্কুলে নিয়ে ওঠালাম। গ্রামের মাতুব্বর, স্কুলের শিক্ষকদের ডেকে সব বাড়ি থেকে কাঁথা, শাড়ি, চাল, ডাল তুলে ওদের সব কিছুর ব্যবস্থা করলাম। এরপর ওদের সবার নাম রেজিস্ট্রি করে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে এসে আবার নদীর ওপারে গেলাম আমার দল নিয়ে। তার আগে অবশ্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে ওখানে কোনো পাকিস্তানি নেই। গিয়ে দেখি কোনো জীবিত প্রাণীরও অস্তিত্ব নেই সেখানে। কেবলি আগুনে পুড়ে যাওয়া কালো কালো ছাইয়ের স্তূপ। এর মধ্যে আমাদের দেখে কচু ক্ষেতের মাঝ থেকে একজন বুড়ো আর একটি বাচ্চা বেরিয়ে এল। ওরা দুজন গোপনে লুকিয়ে ছিল। তাদের কাছ থেকে শুনলাম,

যত বাঙালি পুরুষ ছিল, সবাইকে ব্রাশ করে মেরে ঘরের চাল তাদের উপরে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পাকসেনারা। ওদের কথামতো টিনগুলো উঁচু করে দেখি সেই বীভৎস দৃশ্য। কাউকে চেনার উপায় নেই, কেবলি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মাংসের কালো কালো স্তূপ। ওই অবস্থায়ই গর্ত করে তাতে দুজন দুজন করে সমাহিত করে আমরা আমাদের ব্যারাকে ফিরে আসি। আমার স্মরণে এটা ছিল এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ।

প্রশ্ন : একজন স্বাধীনতাকামী যোদ্ধার কাছে নিঃসন্দেহে এটা একটা দুর্বিষহ স্মৃতি। এরকম কি আরো ঘটেছে !

উত্তর : এরকম অসংখ্য অঘটনের জন্ম দিয়েছে ঐ বেজন্মা পাকিস্তানিরা। আমার আরো মনে পড়ছে– যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে আমি তখন রংপুরে অবস্থানরত। এক সকালে সঙ্গে কয়েকজন সেপাই নিয়ে গেলাম শহরের পাশে। সেখানে একটি ছোটো ব্রিজ ছিল। দেখলাম ব্রিজের নিচে অনেক চাটাই স্তূপ করা। সঙ্গীদের নিয়ে একে একে ৭টি চাটাই তুললাম। চাটাই তুলে যা দেখলাম তা বলতে আজো আমি শিহরিত হই। সেই বীভৎস দৃশ্য ভোলার নয়– প্রতিটি চাটাইর নিচে রক্তে ভেজা ক্ষত-বিক্ষত মানুষের লাশ। সব লাশই ছিল মেয়েদের। হাতে ঘড়ি, পায়ে জুতা দেখে বুঝলাম স্কুল-কলেজের ছাত্রী। চেহারা দেখে চেনার কোনো উপায়ই ছিল না। কারণ, সবারই মুখের আর বুকের মাংস খুবলে নিয়েছে পাকিস্তানি শয়তানের বাচ্চারা। পার্শ্ববর্তী আরেকটি ব্রিজের নিচে দেখলাম কচুরিপানাগুলো কেমন যেন এলোমেলো। সন্দেহ জাগায় সেনাদের বললাম কচুরিপানাগুলো তুলে দেখতে। সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হল– বাঙালি নারীদের বীভৎস মৃতদেহ। কারোই শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আস্ত নেই। খুবলে খেয়েছে ক্ষুধার্ত হানাদাররা। হাতের ঘড়ি, পায়ের জুতা, আঙুলের আংটি সবই ঠিক আছে, শুধু দেহটা যেন শকুনের পাল্লায় পড়া মৃতগরুর। মেয়েদের লাশগুলো তুলে এনে সারা শহরে মাইকিং করলাম যে, এরকম মেয়ে কারো আছে কি না, বা ছিল কি না। কেউই সাড়া দিল না, তাই রংপুর টাউন হলের পাশে ওদের একত্রে দাফন করি।

এর কয়েকদিন পর আবার হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সময় একদিন দেখলাম কাঁচা মাটির তৈরি হালকা উঁচু ঢিবি। কেমন যেন সন্দেহ হল আমার। সেপাইদের বললাম, মাটির উপর ঘা দিয়ে দেখতে। ওরা ঘা দিয়ে দেখল নরম নরম লাগে। মাটি খুঁড়তে বললাম। দেখতে পেলাম ২টি করে লাশ একেকটি গর্তে হাত-পা বাঁধা। এরকম ৩-৪টি গর্ত খুঁড়লাম– একই অবস্থা। লাশগুলোর চেহারা দেখে বুঝলাম ওরা হয়ত উচ্চবিত্তসম্পন্ন পরিবারের মানুষ ছিলেন। আর না খুঁড়ে সেনাদের বললাম, পুনরায় মাটি চাপা দিয়ে রাখতে, অনর্থক মৃতদের কষ্ট দিলে পাপ হবে।

প্রশ্ন : অন্য কোনো এলাকায় ?

উত্তর : এছাড়াও দিনাজপুর এলাকায় দেখেছিলাম বিহারিদের অকথ্য নৃশংসতা। ওরা ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে পানির মধ্যে চুবিয়ে মারত। প্রথমে গলার উপরে পা দিয়ে পানির মধ্যে চেপে ধরে রাখত। যখন বাচ্চাগুলোর ছোটো ছোটো শরীর নড়াচড়া করত না, ঠিক তখনই ছেড়ে দিত। অর্থাৎ মরে যাওয়ার পর ছেড়ে দিত পানির মধ্যে। এভাবে অসংখ্য শিশুকে মেরেছে বিহারিরা। এই বিহারিরাই আবার কোথাও নদীর ধারে নারীদের লম্বা লাইন করে দাঁড় করিয়ে ইচ্ছেমতো বেঘোরে পেটাত। যখন মহিলারা অজ্ঞান হয়ে যেত বা মারা যেত তখন ধাক্কা মেরে নদীতে ফেলে দিত। এমনি করে নৃশংসভাবে অসংখ্য মহিলাকে খুন করেছে বিহারিরা।

প্রশ্ন : কোনো প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন কি এইসব ঘটনার !

উত্তর : হ্যাঁ পেরেছিলাম। একবার দিনাজপুরেই স্বামী-স্ত্রী আর দুটি মেয়ে মোট ৪ জন বিহারিকে ধরলাম। ১টি মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ত, আরেকটি ক্লাস নাইনে। খুবই মায়াবি চেহারার মেয়ে দুটো। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে স্বামী-স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের বড়ো মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখুন। ওকে আপনারা বিয়ে করতে পারেন, সে খুবই ভালো মেয়ে। আমাদের তিন জনের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমার এ মেয়েটিকে বাঁচান। আমার স্মৃতিতে তখন ভাসছে পাকিস্তানিদের নৃশংসতার দৃশ্য। তাই কান দিলাম না ওদের আবদারে। প্রথমে বাচ্চা দুটো মেরে পরে মারলাম স্বামী-স্ত্রীকে। চারজনকে একটি গর্তের মধ্যে মাটিচাপা দিয়ে একটি প্রতিশোধের শান্তি পেয়েছিলাম সেদিন।

প্রশ্ন ; এমন কি হয়েছে– কাউকে কাউকে বাগে পেয়েও মেরে ফেলেননি বা প্রতিশোধ নেননি !

উত্তর : হ্যাঁ ঘটেছে। কাউকে কাউকে হাতের কাছে পেয়েও মারতে পারিনি। কারণ যুদ্ধ শুরুর আগে আমরা একই সঙ্গে থেকেছি, খেয়েছি, গান করেছি। ওদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তাদের আমি মারতে পারিনি। কিন্তু যাদের নামে আমার কানে অভিযোগ এসেছে তাদের ক্ষমা করিনি, তারা যতই পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ হোক। তারপরও কোনো কোনো পাকিস্তানি অফিসারকে মারার সময় সেনাদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি করত, কাঁদত। আমি তখন ওদের পাকিস্তানিদের অমানবিক অত্যাচারের কথা শুনিয়ে শান্ত করলাম।

সহযোদ্ধা হারানোর বেদনা

প্রশ্ন : যুদ্ধ চলাকালে হারানো কোনো সহযোদ্ধার স্মৃতি কি আপনাকে কাতর করে কখনো !

উত্তর : যুদ্ধ যখন চলে তখন সহযোদ্ধাদের সবার প্রাণ এক প্রাণে পরিণত হয়। তাই সে সময়ে হারানো কোনো বন্ধুর কথা মানুষ সহজে ভুলতে পারে না।

আমিও পারিনি। বাঘবান্ধায় অবস্থানকালে আমার ডিফেন্সে দুজন আনসার ছিলেন–আপন দুই ভাই। যুদ্ধের মাঝখানেই বড়ো ভাই এক ডেলিভারি কেস থাকায় বাড়িতে যায়। বাড়ি থেকে ফেরার সময় সে খাওয়ার জন্যে একটি মুরগি নিয়ে আসে। বহুদিন পর বাড়ির সবাইকে দেখতে পেয়ে সে তখন খুব উৎফুল্ল। মুরগিটি জবাই করার জন্য বাংকারের সামনে যায় ছোটো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। ওদিকে পাকিস্তানিরা অদূরেই তাদের ক্যাম্প থেকে সব সময় আমাদের বাংকারে নজর রাখত। আমি বুঝতে পেরে ওদের দুই ভাইকে বকাঝকা করে বাংকারে ঢুকতে বললাম। ঠিক তখুনি বোমা নিক্ষেপ করে পাকবাহিনী। প্রথম বোমাটি পড়ল ওদের ২৫ গজ ডানে, দ্বিতীয়টি ২৫ গজ বামে। এই অবস্থা দেখে ওরা ভয় পেয়ে বাংকারের মুখের দিকে দৌড় দিল। তবুও শেষ রক্ষা হল না ভাই দুটির। তৃতীয় বোমাটি পড়ল ঠিক বাংকারের মুখ বরাবর। ঘটনাস্থলেই দুই ভাই শহীদ হন সেদিন। আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম সেই সহোদরদের মৃত্যুতে। এরপর ভুরুঙ্গামারীতে হারিয়েছিলাম একজন সৈনিক। এক পাকিস্তানিকে সে নিজ হাতে মেরে খুশিমনে লাশ আনতে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেও লাশ হয়ে ফিরে আসে।

তবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম চৌধুরীরহাট অপারেশনের সময়। সেই অপারেশনে আমাদের সঙ্গে এক লেফটেন্যান্ট ছিলেন। খুবই সুদর্শন, বিএ পাস একজন যুবক। বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের কারণে ভারত থেকে তাকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিল। তো রাতের বেলা আমরা পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানি ঘাঁটিতে অ্যাটাক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দিলেন ডান দিকে, আর নিজে নিলেন বাম দিক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাম দিকে কয়েক গজ এগুতে না এগুতেই একটি বোমা এসে পড়ে তাঁর ওপর, সঙ্গে সঙ্গে মারা যান তিনি। কতটা কষ্ট যে সেদিন মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়েছিল সেই রাতের আঁধারে, তা আর বলে বুঝানো যাবে না। তাঁর নাম ছিল আব্দুস সামাদ। ভুরুঙ্গামারী বাজারের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। আজো সেই অঞ্চলে সামাদনগর নামে একটি এলাকার পরিচিতি রয়েছে। লেফটেন্যান্ট সামাদ সাহেব আজো বেঁচে আছেন ওই এলাকার মানুষের মুখে মুখে।

অপ্রীতিকর ঘটনা

প্রশ্ন : যুদ্ধ চলাকালে কি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে আপনাকে !

উ : মনে পড়ছে, আমি আমার দল নিয়ে তখন অবস্থান করছি কুলাঘাটে। অতি সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছি। অন্যদিকে নিকটবর্তী পাকিস্তানি টিম একের এর এক উপর্যুপরি গুলি ছুড়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা ভারতীয় ফৌজ আসল। জিজ্ঞাসা করল, হালচাল কী, ওদের অবস্থান এখান থেকে কতদূরে (...)

ইত্যাদি। আমি তাঁদের অভয় দিয়ে বললাম, শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের মতো নিরাপদ দূরত্বে আছি এবং আরো গুছিয়ে নিচ্ছি। এরপর সকাল তখন ১০-১১টা হবে। মেশিনগান বসালাম একটি গাছের ওপর। ব্রাশ মারলাম পর পর কয়েকটা। দেখলাম সব নিশ্চুপ, সাড়াশব্দ নেই। সেদিন সারাদিন আমরা বাংকারে অবস্থান নিয়ে থাকলাম। রাত ৯টার দিকে ওরা প্রথমে ফায়ার ওপেন করল, এরপর শুরু করল বোম্বিং। এই অবস্থায় আমি সেনাদের প্রস্তুত হতে বলার জন্য বাংকারে যাই। গিয়ে দেখি বাংকারে কেউ নেই, সবাই হেড কোয়ার্টারে চলে গেছে। সারারাত একাই ওদের রেসপন্স করে সকালে গেলাম হেড কোয়ার্টারে। দেখলাম, সবাই খোশ-গল্পে মেতে চা-নাস্তা খাচ্ছে। রাগে-ক্ষোভে তখন আমার সারা শরীর কাঁপছে। রাগের মাথায় কয়েকজনকে লাথি মেরে জিজ্ঞাসা করলাম যুদ্ধ করতে এসেছ, নাকি পেট পুরতে এসেছ। আমাকে একা বাংকারে ফেলে রেখে তোমরা কীভাবে আসতে পারলে ! যুদ্ধের ময়দানে এত ভয় পেলে চলবে কী করে ! আমি তো মরিনি, এখনো বেঁচে আছি। এক সিলেটি হাবিলদার ছিলেন আমার দলে। দেখি তিনি রিসিভার হাতে নিয়ে আরামে চা খাচ্ছেন। টেলিফোনের রিসিভারটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে বললাম, যতদিন এখানে আছেন ততদিন আপনি আর রিসিভার ধরবেন না, সেই যোগ্যতা আপনি আজ থেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

প্রশ্ন : এরপর ?

উত্তর : আমি তখন রিসিভারটা নিয়ে ভারতে কল করলাম। ধরলেন এক মেজর। তাঁর বাড়ি ছিল পাবনায়, এক হিন্দু অফিসার। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, ঠিক আছে কমান্ডার সাহেব আমি এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সবাই হাতিয়ার রেখে গাড়িতে উঠে চলে আসেন। মেজর সাহেবের কথামতো গাড়ি আসলে আমরা সবাই বেডিংসহ গাড়িতে উঠে ভারতে চলে গেলাম। গিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম, সেখানে ১টি অফিস ও ১টি ক্যান্টিন আছে, আর আছে 'একটি বিশালাকার গোডাউন'। প্রথমে ভেবেছিলাম, খাবারের গোডাউন হবে। কিন্তু না, পুরো গুদামভর্তি হাতিয়ার। রাশিয়ান অস্ত্র। মেজর সাহেবের নির্দেশমতো সবাই যে যার ইচ্ছেমতো হাতিয়ার নিয়ে আমরা চলে এলাম ভুরুঙ্গামারী ও বাঘবাজার মাঝামাঝি একটি জায়গায়। সেখানে ডিফেন্স নিয়ে আমরা পাকা রোডের ওপর দুটি এলএমজি বসালাম। বাংকার বানালাম গাছের আড়ালে। সেখানে খাট পাতা, খাটের ওপর মশারি ও হারিকেন। বাংকার থেকে ৫০ গজ দূরে রোড ব্লক দিলাম যাতে পাকিস্তানিরা গাড়ি নিয়ে আসলে রাস্তা ক্রস করতে না পারে। পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পের পাকিস্তানিদের দুটি আর্টিলারি ছিল। রাতে খুব আর্টিলারি মারল। ওদের অটোমেটিক ভালো ছিল– বোমাগুলো সব আশপাশে পড়ত। আমি আমার সেনাদের বললাম, ফায়ার ওপেন করার দরকার নেই। ওরা যদি সামনাসামনি আসে তবেই আমরা যুদ্ধ করব। তবুও তোমরা সব সময় প্রস্তুত

থাকবে। সেই রাতে পাকিস্তানিরা আমাদের একটানা খুব ফায়ার করল। আমরা চুপচাপ রাত কাটিয়ে দিলাম। সকালবেলা ভারতীয় ফৌজ নিয়ে মেজর সাহেব আসলেন। পাক সেনাদের অবস্থান জানতে চাইলে বললাম, ভুরুঙ্গামারী বাজারের পাশে আছে ওরা। মেজর ওদের দেখতে চাইলে তাঁকে নিয়ে একটি ঢালু জায়গা থেকে বাইনোকুলার দিয়ে দেখালাম পাকিস্তানিদের। সকালবেলা ওদের চা-নাস্তা খাওয়াচ্ছে এক বাঙালি মহিলা। দেখে-শুনে মেজর বললেন, যে করেই হোক ওদের খতম করতে হবে। এরপর তিনি আমাদের বাংকার দেখতে গেলেন। বাংকার দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আজ রাতেই শুরু হবে আখেরি অপারেশন। তোমরা ততক্ষণ নিশ্চিন্তে বসে থাক। রাতের বেলা আমরা ১০-১২টা থ্রি ইঞ্চি মর্টার, ১০-১২টা ফোর ইঞ্চি মর্টার, আর মেশিনগান নিয়ে তৈরি হলাম। এরপর সারা রাত ধরে চলল ফায়ারিং, বোম্বিং।

সকালে আসলেন জেনারেল অরোরা। আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, শুনলাম ভুরুঙ্গামারী অঞ্চল ক্লিয়ার, তাই না ! আমারও সে রকম মনে হয়েছিল তাই মাথা নাড়ালাম। রাস্তার ওপর দেয়া বাঁধটি খুলে দিলাম জেনারেলের গাড়ি যাওয়ার জন্য। যেই উনি বাঁধটি ক্রস করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারের উপর ফায়ার। জিপের ওপর দিয়ে, অরোরা সাহেবের মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুটে চলল একের পর এক। ভাগ্য নিতান্তই ভালো যে গাড়ির চাকা এবং ওনার মাথায় কোনো গুলি লাগেনি। তড়িঘড়ি করে জিপ থেকে নেমে এসে জেনারেল বললেন– ইউকে, তোমার সন্দেহই বোধহয় ঠিক। ওরা এখনো স্ট্রং আছে। এরপর আমরা পাকিস্তানিদের লক্ষ্য করে পর পর ৩০টি বোমা মারলাম। দেখি কোনো সাড়াশব্দ নেই আর। শেষে যখন ওখানে গেলাম, দেখি ৪টি লাশ ছাড়া আর কিছু নেই। ৪ জনই ছিল সেখানে।

আরেকটি অপারেশনের কথা মনে পড়ছে। ওই পাকিস্তানি দলটিরও দুটি আর্টিলারি ছিল। খুবই নিরাপদ স্থানে থেকে আমাদের ফায়ার করত একের পর এক। ভারতীয় ফৌজের মেজর এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ওদের অবস্থান কোথায় ! ওদের অবস্থান জানার পর বললেন, ৩ মাইল দূর দিয়ে ঘুরে গিয়ে ওদের কাউন্টার-অ্যাটাক করতে হবে, সামনাসামনি নয়। তাঁর কথা অনুযায়ী কয়েকজন সাহসী রাজপুত সেনা নিয়ে ৩ মাইল ঘুরে ওদের বাংকারের কাছাকাছি গেলাম। রেল লাইনের স্লিপারের নিচে গর্ত করে বাংকার বানিয়েছিল ওরা। সেই গর্ত থেকেই ফায়ার ও বোম্বিং করত। আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই রাজপুত সেনারা একেবারে বাংকারের মুখে গিয়ে বলল, হ্যান্ডস্আপ। হাতিয়ার রেখে একে একে বেরিয়ে এল সাতজন। একজন কমান্ডার, ছয়জন সেপাই। ওই সাতজনকে আমরা গুলি করে মারি নি। মেরেছিলাম বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে। একটি ইনজেকশনই যথেষ্ট। এভাবে সাতজনকে মেরে রাস্তার ওপর লাইন করে শুইয়ে দিয়েছিলাম আমরা।

গ্রামবাসীর সহযোগিতা

প্রশ্ন : যুদ্ধ চলাকালে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কেমন সহায়তা পেয়েছেন !

উত্তর : অবশ্যই। সম্ভবপর সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন তাঁরা। কেননা, যুদ্ধের সময় শত্রু ছাড়া বাকি সবাই একে অন্যের মিত্র। আমরা যেমন গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা দেয়ার চেষ্টা করেছি। পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি। গ্রামবাসীরা আমাদের জন্য তার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। চাল, ডাল, কাঁথা, কাপড়, আশ্রয়– সবকিছু দিয়েই পাশে থেকেছে তারা। ভাত না থাকলে ভাতের ফেন দিয়েছে, ঘরে চাল না থাকলে গ্রামের সবার থেকে চাল উঠিয়ে আমাদের দিয়েছে। এমনকি গরু, হাঁস, মুরগি, ছাগল এগুলোও দিয়েছে। তবে আমাদের দলটি যেহেতু ইপিআর-এর সৈনিকদের নিয়ে, ফলে আমরা খাবার-দাবারের ব্যাপারে তেমন চিন্তা-ভাবনা করতাম না। এমনকি আমি যেখানেই আমার দল নিয়ে গেছি, সেখানেই টেলিফোন পর্যন্ত চলে গেছে।

প্রশ্ন : আর সাধারণ মুক্তিবাহিনী !

উত্তর : যখন পেট্রলে যেতাম, চোখে পড়ত অসহায় ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ। আমাকে দেখে আবদার করত, অভাব-অভিযোগ জানাত। বলত, বাবা আমরা মুক্তিযোদ্ধা, না খেয়ে লড়ছি। আমাদের ভাত নেই, তরকারি নেই, শুধু গুলি-বোমা আছে। আমি তখন আমার দলের তরফ থেকে, গ্রামের মুরব্বিদের থেকে চেয়ে নিয়ে ওদের খেতে দিতাম।

স্বপ্ন শুধু স্বাধীনতা

প্রশ্ন : তখন নিশ্চয়ই কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণা কাজ করত !

উত্তর : স্বপ্ন তখন একটাই ছিল– দেশটা কেমন করে আজাদ হবে, মানে স্বাধীন হবে। কেননা, এই দেশকে আমরা নিজের দেশই মনে করতাম, করেই যাব আমৃত্যু। এখানেই আমার তিন পুরুষের নাড়ি পোঁতা। তাই দেশ আমাকে যাই মনে করুক, আমি নিজেকে এই দেশের বাইরের ভাবতে পারি না। মায়ের মতোই ভালোবাসি এই মাতৃভূমিকে। আর এই ভালোবাসা থেকেই আমি প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। আমার স্মরণে ১৯৭১-র ভয়াবহ যুদ্ধের উত্তাল সময়গুলোতে কখনোই ভাবতে পারিনি আগামীকাল আমি বেঁচে থাকব। প্রত্যেকটি দিন জীবনের বোনাস টাইম মনে হত। তাই যত বিপদেই পড়েছি ঘাবড়ে যাইনি, ভয় পাইনি। আমার সেক্টর কমান্ডার আবুল বাশার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইউকে আপনি কি মনে করেন দেশটা স্বাধীন হবে ! জবাবে বলেছিলাম, অস্ত্র যখন হাতে নিয়েছি স্যার, যতক্ষণ আমার অস্ত্র ধরে রাখার শক্তি থাকবে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সাহস আছে তো লড়ে যাওয়ার ! বলেছিলাম, আমাকে সাহস দেয়া না দেয়ার ব্যাপার আমার সৃষ্টিকর্তার। তবে স্যার এখনো আমি কিছুতে সাহস হারাইনি,

ভয়ও পাইনি। এভাবেই আমি আমার দেশমাতার মুক্তির স্বপ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছি সব ভয়-ভীতি বাধা-বিপত্তিকে পেছনে ফেলে। কেননা, মুক্তির প্রশ্নে ভীতি কখনো সাফল্য আনতে পারে না। স্বপ্নের মূল্যায়ন করতে হয় সাহস দিয়ে।

বিজয় বাংলাদেশ

প্রশ্ন : ডিসেম্বর মাসের বিজয়পর্বে কোথায় অবস্থান করেছিলেন !

উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর থেকে আমি আমার গ্রুপ নিয়ে তিস্তা ব্রিজ এলাকায় অবস্থান করছিলাম। টানা দুদিন হালকা-পাতলা গোলাগুলি হল। এরপর ১৬ ডিসেম্বর সকালে হঠাৎ করে আমাদের জানানো হল ৯টা পর্যন্ত সময়, আর ফায়ার করা যাবে না। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, বিজয় ঘোষিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা সকাল ৯টার আগেই ছোটো একটি অপারেশন সারলাম। চারজন পাকিস্তানি একটি বাংকারের সামনে বসে চা খাচ্ছিল। সবকিছু পজিশন করে দিলাম ব্রাশ। চারজনের মধ্যে দুজন মারা গেল আর দুজন পালিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর ৯টা বাজলে আশপাশের পাকিস্তানিরা সাদা পতাকা টানিয়ে দেয়।

প্রশ্ন : সেই সময়কার অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলুন !

উত্তর : 'দেশ স্বাধীন হয়েছে'– এই কথাটুকুর তাৎপর্য যে কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তখনও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝতে পারলাম যখন আমরা তিস্তার ব্রিজ পার হয়ে রেল স্টেশনে গেলাম। গিয়ে দেখি রেল স্টাফরা আনন্দে কথা বলতে না পারার মতো সময়ের সন্ধিক্ষণেও গরু-খাশি জবাই করে আমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। চারদিকে তখন বিজয়ের সুগন্ধি সমীরণের সন্তরণ। পৃথিবীর দরিদ্রতম এই দেশটির মানুষের আনন্দের কত ধরনের প্রকাশ যে থাকতে পারে সেদিন দেখেছিলাম।

প্রশ্ন : এরপর অবস্থান গ্রহণ করেন কোথায় !

উত্তর : স্টেশনে খাওয়া সম্পন্ন করে দুটি গরুর গাড়িতে আমাদের সব বেডিং আর অস্ত্র নিয়ে আমি রংপুরে রওয়ানা হলাম, বাকিরাই সবাই বিজরে উৎসবে যোগ দিল।

প্রশ্ন : সেই সময়ের কোনো স্মরণীয় স্মৃতি !

উত্তর : হ্যাঁ, স্মরণীয় বটে। রাতেই জানতে পেরেছিলাম, আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনাদের অনেকে কলেজ গেটে অবস্থান করছে। সকালে সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পারলাম। কেননা, যুদ্ধের আগে আমরা একসঙ্গে থেকেছি, খেয়েছি, খেলেছি । আমাকে দেখেই তাদের কয়েকজন হাসিমুখে এগিয়ে আসল। অনেকদিন পরে ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয়। তেমনিভাবে বলে উঠল, শালা ইউকে, তুমি এখনো, রোনি দেখছি। জবাবে আমি বললাম, শালা আমি এখনো বেঁচে আছি বলেই তোমাদের জীবিত দেখছি। এভাবে

কিছুক্ষণ বাকযুদ্ধ করে হাত মেলালাম। ওরা বলল, ভাই তোমাদের দেশ তোমাদেরই থাক। সবকিছু ভুলে যাও, যা হয়েছে হয়ত বা ভালোই হয়েছে। তোমরা তো যাই হোক খেতে পেরেছ। আর আমরা না খেয়ে মরেছি। যাই হোক, এসব শেষ হয়েছে ভালো হয়েছে। তোমাদের শুভ হোক। আমিও ওদের কল্যাণ কামনা করে বিদায় নিলাম।

প্রশ্ন : সেই সময়ের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা কি মনে পড়ে যা তাৎক্ষণিকভাবে আপনাকে পীড়া দিয়েছিল !

উত্তর : যুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অনভিপ্রেত নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। এমন অনেক মুক্তিযুদ্ধা ছিল যারা আদৌ যুদ্ধ করার ইচ্ছায় যায় নি, প্রাণ বাঁচাতে অথবা লুটপাটের সুযোগ নিতে গিয়েছে। তেমনি একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। সেটা অবশ্য বাংলাদেশীরা করেনি, মিত্রবাহিনীর সদস্যরা করেছিল। ঘটনাটা ঘটে ১৬ ডিসেম্বর রাতে। বাংলাদেশ তখন আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। তবুও লোকজন অনেকেই ঘর থেকে বেরুতে ভয় পেত। শহরগুলোর সব প্রায় ফাঁকাই ছিল। বেশিরভাগ মানুষ তখনও গ্রামাঞ্চলে, নিরাপদ আশ্রয়ে। যাই হোক, ১৬ ডিসেম্বর যখন আমি আমাদের দলের বেডিং ও অস্ত্র নিয়ে দুটি গরুর গাড়ি বোঝাই করে রংপুর শহরে আসি। যখন শহর ক্রস করে কলেজে যাব এমন সময় দেখি বড়ো রাস্তার উপর ৪-৫টি আর্মির গাড়ি লাইন করে দাঁড়ানো। গাড়িগুলো দাঁড়ানো ছিল শহরের বড়ো দোকানগুলোর সামনে, যেগুলোতে দামি দামি জিনিসপত্র বিক্রি হত। দেখলাম দোকানগুলোর ঝাপ খুলে ইচ্ছেমতো গাড়িতে মালামাল লুট করে ভরে নিচ্ছে ভারতীয় আর্মিরা। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, শেষে আগুনটা যেন লাগাবেন না। অন্তত এই অনুরোধটা রাখতে বলে আমি মনের কষ্ট মনে নিয়েই চলে আসি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভাবনা

প্রশ্ন : স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশ নিয়ে কী ভেবেছেন !

উত্তর : ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করতে পারলেই আমাদের দেশটাকে আমরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেব। আমরা দেশের সবাই এক সঙ্গে গড়ে তুলব আমাদের ভবিষ্যৎ। সুখে থাকার জন্যই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভেবেছি এবার সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখ নিশ্চিত হবে। আমি মনে করি, আমি যে আজো বেঁচে আছি এটা আমার বোনাস লাইফ। শুধু আমি নই যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসা সব যোদ্ধারই বোধ হয় একই অনুভূতি আমার মতো। স্বপ্ন জন্ম দেয় সম্ভাবনা, আর সম্ভাবনা রূপ পায় বাস্তবে। আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা শুধু একটি যুদ্ধ নয়, সব ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তি। নিপীড়ন, অত্যাচার, লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি। আমরা চেয়েছি, এমন একটি দেশ যে দেশ তার সব নাগরিককে যোগ্য মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে দেবে,

ক্ষুধা-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবে, সুশাসন কায়েম করবে, আইন-কানুন প্রণয়ন করবে, যার পরিণতি একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

প্রশ্ন : ভাবনা আর বাস্তবতার সমন্বয় ঘটেছে কি !

উত্তর : না। সাধারণ মানুষের সেই সুখ যেন অচিন পাখি। দেশের সাধারণ মানুষ আজো তার নাগাল পায়নি। আজো তারা অসহায়, জিম্মি কতিপয় অসাধারণ মানুষের কাছে, যারা স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে দুর্নীতি, খুন ও চাঁদাবাজির মধ্য দিয়ে। ভেবেছিলাম, দেশটা স্বাধীন হলে সংসদের সব মন্ত্রী-এমপি হবে এদেশের মানুষ। ডিসি-এসপি, বড়ো বড়ো অফিসার হবে এদেশের মানুষ। তারা সবাই এদেশের উন্নতির কথা ভাববেন। কিন্তু যা দেখার কথা তা এখনো দেখিনি। এখন দেখছি, যাদের হাতে দেশ তার পরিচালনার ভার দেয়, তারাই তাকে লুটেপুটে খায়। কোনো লাভই হল না এত রক্তের বিনিময়ে কেনা স্বাধীনতায়।

প্রশ্ন : নিজের পক্ষ থেকে আপনার এ ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক প্রচেষ্টা ছিল !

ইউকে চিং : চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমি এ দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্যে অবহেলা করিনি। যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম ইপিআর-এ। যুদ্ধের পরে তার নাম হয় বিডিআর। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– আমি আর্মিতে যাব, নাকি বিডিআর-এ থাকব। আমি বলেছি, যেহেতু এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমি যুদ্ধ করেছি, সেহেতু আমার মেধা-শ্রম সবই এই ডিপার্টমেন্টকে দিতে চাই। তাই যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আমি আমার ফোর্সকে গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অসংখ্য নতুন নতুন সেনাকে ভর্তি করিয়ে নিজ হাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আর এসব করেছি একজন নাগরিক হিসেবে দেশের ও পেশার প্রতি কর্তব্যের সুবাদে।

অতঃপর অন্ধকার

প্রশ্ন : কী পেলেন বিনিময়ে !

উত্তর : অনেক পেয়েছি। বাঙালির জন্যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুন্দর পতাকা, নিজের দেশের বড়ো বড়ো মন্ত্রি, এমপি, অফিসার, সবই তো পেয়েছি। এমনকি দেশ আমাকে বীরত্বের জন্য একটি উপাধিও দিয়েছে। আমার নাম এখন ইউকে চিং বীরবিক্রম। বাহ্ কী সুন্দর নাম ! আদিবাসী শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত ইউকে চিং মারমা। অথচ তার পেটে এখন ইঁদুর দৌড়ায়, বাইরে বৃষ্টি নামার আগে ঘরে পানি পড়ে। তার কোনো জায়গা-জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। তার সন্তানদের কোনো চাকরি-বাকরি নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো তাদের কোনো আয়ের উৎসও নেই। তার সন্তানরা এখন দিনমজুর। এই হল একটি স্বাধীন দেশের একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হাল-হকিকত। প্রাণবাজি রেখে যুদ্ধ করার বিনিময়ে এইত পেয়েছি।

প্রশ্ন : কখনো কি আপনাকে কোনো ধরনের আশ্বাস দিয়েছিল সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন !

উত্তর : সরকার থেকে একবার বলা হয়েছিল, যাঁরা খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের একটি ঘর করে দেবে। জায়গা-জমি দেবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য টাকা দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সেসব অঙ্গীকার এখনো অঙ্গীকারের জায়গাতেই রয়ে গেছে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি সম্মানী ভাতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে কি জ্ঞাত আছেন !

উত্তর : হ্যাঁ জানি, সম্প্রতি গরিব অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে মাসিক ৫০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা চালু হয়েছে। চাকরি-বাকরিসহ আরো কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। আর এটাও জানি, এই সুযোগের আশায় প্রতিবছর বেড়ে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা। যারা এদের মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে নিচ্ছে, তারাই আবার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছে। আর আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর, আমি আমার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যের জন্য হাহাকার করে মরছি। আমাকে কেউ দেখে না। জঙ্গলে থাকি বলে কেউ খোঁজও নেয় না। সচ্ছল হলে তো কখনোই চাইতে যেতাম না ৫০০ টাকার সম্মানী ভাতা। অসচ্ছল বলেই চাইতে গিয়েছি। আমাকে সম্মানী ভাতা দেয়ার জন্য বই-খাতা সব প্রস্তুতও হয়েছে। এরই মধ্যে শঙ্কর কুমার চৌধুরী নামক এক অফিসার আমার ছবি দেখে বললেন, উনি তো পেনশন পান, সম্মানী ভাতা তাকে দেয়া যাবে না। আমি বললাম, দেখুন স্যার, আমি চাকরি করেছি বলে পেনশন পাই। দীর্ঘ নয় মাস যে রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করলাম, তার জন্য কি এই সামান্য সম্মানটা পেতে পারি না ! সরকার কেন এই অসহায়, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে তা দেবে না ! যুদ্ধের সময় তো মাটি আর গাছ ছাড়া একটি কাকও দেখতে পাইনি। আর আজ কত দাবিদার, শুধু আমি ঠাঁই পাই না।

ইউকে চিং ৬ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর আবুল বাশার এবং সাব-সেক্টর কমান্ডার সুবেদার আরব আলী, সুবেদার বোরহান উদ্দিনের অধীনে নিজে দলীয় কমান্ডার হিসেবে পরিচালনা করেছেন অসংখ্য অপারেশন। অধিকাংশ অপারেশনেই স্বীয় মেধা, কৌশল এবং বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে অর্জন করেছেন সফলতা, ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা। পেয়েছেন বীরবিক্রম খেতাব। কিন্তু পাননি এখনো ভালোভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন, সামান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা। চরম আর্থিক দুর্দশায় হতাশ বীর মুক্তিযোদ্ধার এই কি যথাযথ সম্মান !

প্রবাসী সরকারের একটি চিঠি

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতাকামী বাঙালি অনেক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করে প্রবাসী সরকারে যোগ দেন। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তারা একে একে কলকাতার থিয়েটার রোডে অবস্থিত প্রবাসী সরকারের দপ্তরে সমবেত হন। প্রবাসী সরকার তাদের দায়িত্ব বণ্টন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে।

প্রবাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে আদিবাসী বা উপজাতীয় অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রবাসী সরকারে যোগ দেন। সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তৎকালীন সচিব এইচ. টি. ইমামের সাথেও এমন কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন যারা একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসে সীমান্ত অতিক্রম করেন। পার্বত্যবাসীদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য কর্মকর্তাদের সক্রিয় তৎপরতায় নিয়োজনের জন্য প্রবাসী সরকার এক পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়। এই প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচ. টি. ইমাম প্রতিরক্ষা সচিবকে একটি চিঠি লেখেন। গোপনীয় সতর্কতা নির্দেশিত এই চিঠিটি লেখা হয় ২৩ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে। চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ :

SECRET
October 23, 1971

A number of my tribal officers and staff crossed the border with me in the months of April/May 1971. Since then we have been able to utilize the services of only very few of them. There are quite a few available now whose services can be very well utilized in our war effort.

I have always maintained that no move toward Chittagong is possible without the assistance and co-operation of the tribal people of Chittagong Hill tracts

district. Special efforts should, therefore, be made to win the friendship of as many this people as possible and neutralize those who are hostile. Given this background, I very strongly fell that we should direct our propaganda towards the Hill tribes also.

I came to know the other day this Ministry of Defense was looking for persons who write scripts in Chakma language. I do not know whether this is in pursuance of the policy recommended by me above. In any case, I would like to emphasize that there are a number of tribal officers and staff who served under me and who can be utilized for this type of work. In case the Secretary, Defense, wants their services, they can engaged.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary
23.10.1971
M. O. No----------
Defense Secretary

সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি

ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও শেরপুর এলাকায় বাস করেন গারো জনগোষ্ঠী। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে বিপুল সংখ্যক গারো জনতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেন। তারা ত্রিপুরার মেঘালয়, তুরাসহ কয়েকটি এলাকায় শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই নেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার গারো শরণার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শরণার্থী ছাড়াও ত্রিপুরায় গারো তরুণরা কয়েকটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। গারো শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তার জন্য রাজ্য কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধিকে একটি স্মারকলিপি দেন। বাংলাদেশের গারো সমাজের সহমর্মী ও একাত্ম ত্রিপুরার গারো নেতৃবৃন্দের এই স্মারকলিপি সেই সঙ্কটকালে এক উল্লেখযোগ্য উদযোগ বলেই মনে করা যায়।

গারো পাহাড়ের কেন্দ্রীয় ত্রাণ সংস্থা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশকৃত স্মারকলিপি

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE PRIME
MINISTER OF INDIA BY THE CENTRAL RELIEF
COMMITTEE OF GARO HILLS.

SRIMATI INDIRA GANDHI
Prime Minister of India

Respected Prime Minster,

We, on behalf of the people of the Garo Hills, welcome you first visit to the district. Perhaps never before have we looked forward and eagerly awaited your visit to the

district as today when your presence among us on this strategic border is so keenly needed and awaited.

Together with our brothers and sisters all over the country we share in the legitimate pride and proud hope in your brave and progressive leadership of the country and wholeheartedly pledge our cooperation in your efforts to give our country a new image of strength and social justice to our people. You have again and again demonstrated your genuine concern friendship and solicitude for the people of this region. We pray that your special care for the people of this area will ever grow.

Today however owing to the aggressive acts of the Army of West Pakistan of oppression and wanton outrage on the unarmed civil population of East Bengal and of naked aggression on our own borers, more recently, a difficult situation has arisen in our district. All along the one hundred and forty four miles of international border, people have been crossing into our district since the start of the Pak army depredation on the 25th March, 1971. The influx is still continuing and to date about two lakhs of evacuees have entered into this district, thereby swelling its population of about four lakhs to six.

Coming in the wake of the mass influx of evacuees in 1964 some of whom are still in comps within the district this has imposed a severe strain on the people and the administration owing to the long and tenuous lines of communication.

As it is, the district is almost entirely covered by hills with only small patches of flat land in the border areas. Most of which is under cultivation. This committee has been grappling with the problem of finding enough suitable land for pitching tents of purring of temporary shelters for the evacuees.

We believe our Chief Minister, Captain Williamson Sangma, has already apprised your Government of the critical situation now prevailing in the district the lack of flat land, the difficult communications posed by a poor road system, the fact that district is deficit in food requiring a very large part of its normal requirements to be brought form outside and the occurrance of floods and landslides in the monsoon cutting off communications

makes presence of and evacuees population equal to half the population of the district and immensely difficult problem. We cannot therefore but stress the need to move the bulk of evacuees from the district as the continued temporary stay of such a large number of evacuees has created many social, economic and other problems.

Besides, the influx of many evacuees into the border areas has brought about great dislocation in the lives of the people living there. To this was added the repeated aggression by the Pak army into our territory forcing our border villagers to flee abandoning their cultivation and other means of livelihood and making them evacuees in their own land. For our unfortunate brothers and sisters who have been uprooted from the border villages we would request the special consideration of your Government for relief and other assistance.

We humbly reiterate our support to your stand on the problem as stated in your speeches on the floor of the Parliament and from public platforms. The evil motives of the rulers of Pakistan has thrown this unwanted burden on every part of India's body politic to thwart our development by imposing on our limited resources the mass influx of evacuees and aggressive intrusions on our borders. We reiterate our support to your efforts to find our a political remedy, your repeated messages to the major power and your addresses to conscience of the world.

This is no time to emphasize local issues however important they may be Nevertheless taking advantage of our visit, we would like it draw your kind attention to the vital need for strengthening security arrangements along the border as well as ensuring facilities for building up a sound infrastructure for agro-industry in order to accelerate development of this economically backward areas which has had to bear the brunt of the consequences of partition in 1947, including stoppage of border trade, repeated influx of evacuees and a dislocation of social and cultural life.

We pray to the Almighty that you may be vouchsafed with long stewardship of our country and that under your leadership it will grow from strength to strength and peace and prosperity.

JA Jai Hind.
TURA, GARO HILLS,
the 12th June 1971.
Your in Servce,
GROHONSING A. MARK,
Deputy Speaker, Meghalaya Legislative Assembly & Chairman,
Central Relief Committee, Tura.
MODY MARAK,
Chief Executive Member, Garo Hills District Council, Tura.
Singjan D. Sangma, M.L.A,
President, Garo Hills District Congress committee & Vice Chairman, Central Relief Committee, Tura.
ALBINSTONE M. SANGMA,
Member of Executive Committee, Garo Hills District Council & Vice Chairman, Central Relief Committee, Tura.

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৮

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী : কতিপয় মন্তব্য

ডা. মফিজুর রহমান
জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

আদিবাসীদের মধ্যে চাক্‌মা সম্প্রদায়ের একটি অংশের নেতিবাচক ভূমিকা বাদ দিলে অন্যান্য যারা আছেন যেমন- মারমা, ত্রিপুরা এদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আদিবাসীদের মধ্যে চাক্‌মা রাজা ত্রিদিব রায় তার ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে পাকিস্তানিদের দোসর হয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। এই তিন পার্বত্য জেলার সকল মানুষ ত্রিদিব রায়ের এই ভূমিকা ঘৃণাভরে ধিক্কার জানায় এবং সেই সময়ে চাক্‌মাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষেরা তার সাথে সহযোগিতায় অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে পাহাড়ি-বাঙালি সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। তাই কোনো গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং কোনো গোষ্ঠীকে অবহেলা করা স্পষ্টভাবে মানাবাধিকার লংঘন করার শামিল। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এখানে যে সমস্যা বিরাজমান, তার শান্তিপূর্ণ ও যথার্থ সমাধান হওয়া দরকার। এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন– এ এলাকার ভূমি সংস্কারের। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো পর্যন্ত ১০ লক্ষ মানুষের বসবাস করার জন্যে ঘাস ভূমি রয়ে গেছে। এসব স্থান এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।

প্রতিবার সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের নাম বিক্রি করে খেয়েছে আর জন্ম দিয়েছে অসংখ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সুবিধা দিয়েছে কেবল ঐ ভুয়াদেরই। অথচ প্রকৃতরা এখনো লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত। স্বাধীনতার ৩৭ বছরের কোনো সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি পূরণে এগিয়ে আসে নি। যখন যেই সরকার আসে সেই-ই দখল করে নেয় মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসগুলো।

শান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে ওঠার পেছনে কেবল কতিপয় পাহাড়ি আর কতিপয় বাঙালির ভূমিকাই যথেষ্ট। বিশাল এক রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার ওরা এবং তারা নিজেরাও তা বোঝে না।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

আমরা ৬ আনা দিস্তা কাগজ কিনতাম। আমরা জানতাম, কাগজগুলো করাচিতে গিয়ে সিল হত। অথচ কাপ্তাই পেপার মিলে তা উৎপন্ন হত। করাচিতে সিল হয়ে সেটা আবার বাংলাদেশে এনে বিক্রি করা হত। আমরা প্রতিবাদ করলাম- কাগজ কেন করাচিতে সিল হবে ? এগুলো যদি সরাসরি এদেশে বিক্রি হত, তাহলে এর মূল্য হত ৪ (চার) আনা। তাই চার আনার কাগজ কেন ৬ আনায় বিক্রি হচ্ছে এবং দেশটা কেন ২২ পরিবারের হাতে ! এটা ছিল আমাদের প্রাথমিক উৎকণ্ঠা। এর সাথে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ দফা। এগুলোকে কেন্দ্র করেই এই মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র আগরতলা মামলা, ১৯৬৯-গণ অভ্যুত্থান, '৭০র নির্বাচন এরপর '৭১ র মুক্তিযুদ্ধ।

রাজাকাররা ঠাণ্ডা মাথায় ১৯৭১-এ বাঙালি ও বাংলাদেশকে ঠকিয়েছে, আবার '৭১র পর ঠাণ্ডা মাথায়ই সবকিছু গুছিয়ে উন্নত হয়েছে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা কেন তা পারলাম না ? কারণ, আমাদের মাথা খুব গরম। আমাদের মেজাজ খুব উগ্র, খিটখিটে। বেশিরভাগ বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলে আপনি কোনো সন্তোষজনক জবাব পাবেন না। কারণ, তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ, ব্যথা-বেদনা রয়ে গেছে।

পাকিস্তানকে না ভাঙার জন্যে ৭০% লোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল না, পক্ষে ছিল ৩০%। কিন্তু আওয়ামী লীগ বেশি ভোট পেয়ে বেশি আসন দখল করতে পেরেছিল বলে সম্ভব হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের। বঙ্গবন্ধুর ৭ দফা আন্দোলনের পাশাপাশি ২৬ মার্চে যদি নির্মম হত্যাযজ্ঞ না হত, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি হত না।

অনেকে বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রথমপর্বে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর ও শহরে প্রবলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হত, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের এত ক্ষতির দিকে এগুত না। এর জবাবে বলা যায়,

যখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৈনিকরা বের হয়ে আসেন, তখন তাদের কেউ ছিলেন উলঙ্গ, কেউ জাইঙ্গা পরে, কেউ লুঙ্গি পরে আবার কেউ এসেছেন আধমরা হয়ে। কেউ-ই অস্ত্র নিয়ে বের হতে পারেন নি। ৭-৮ দিন যুদ্ধ চলার পরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যখন মেজর জিয়া বললেন– অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু– বঙ্গবন্ধুর পরিবর্তে আমি মেজর জিয়াউর রহমান বলছি– আপনারা সবাই যার যা আছে তা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এটা যদি না বলা হত– তাহলে

সাধারণ মানুষ ও সৈনিকরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেত না। আমরা একত্রিত হতে পেরেছি, কিন্তু আমার তো একটি রাইফেল, এসএলআর কিছুই ছিল না। আমি কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব ? আমি যারা সৈনিক, যাদের কাছে দু-একটি অস্ত্র আছে তাদেরকে সাহায্য করেছি, খাদ্য-রসদ জোগান দিয়েছি। তাদের অস্ত্রের মজুদ যখন শেষ হয়ে গেছে তখন পাকিস্তানিরা আমিরাবাদ পর্যন্ত বোম্বিং করে শুক্রবার ক্লিয়ারেন্স নেয়। ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার পরে শনিবার থেকে এমনভাবে স্টার্ট করল– মুক্তিযোদ্ধাদের আর সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকল না। তাই তখন তাদের ভারতে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

ভারত আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিল বলে এবং ২৪ ঘণ্টা আমাদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নিয়েছিল বলে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হত না। তিনি ১৩ জানুয়ারি রাশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন। সেদিন তিনি ইন্দিরাকে বলেছিলেন– ইন্দিরা, কবে আপনি আমার দেশ থেকে আপনার সৈন্য সরিয়ে নিবেন..., সেদিনের সেই ইন্দিরাকে মানসিক আঘাত দেওয়ার ফলাফল-ই ১৫ আগষ্ট তার মৃত্যু। আবার ইন্দিরার মৃত্যুর কারণ একাত্তরের বাংলাদেশ, রাজিব গান্ধির মৃত্যুর কারণ শ্রীলঙ্কা। এঁদের মৃত্যু খুবই ঠাণ্ডা মাথায় সম্পন্ন হয়েছিল, খুবই টাস্টফুক্টলি হয়েছিল।

ঠাণ্ডা মাথাতেই দেশ আজ অধিকৃত হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির দ্বারা। মনে হয় সহসা দেশ মুক্ত হবেও না। কারণ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদের লোকজন অধিষ্টিত।

যে অসাম্প্রদায়িকতার আকাঙ্ক্ষায় এদেশের জন্ম, দেশ আজ সেই অসাম্প্রদায়িকতার উল্টো পথে চালিত হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা এখন পরাজিত, তাই ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মতোও কেউ নেই। আমাদের প্রজন্মটা গত হলে ওরা যা বলবে তাই হবে ইতিহাস, তাই সত্য।

চীন আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকলেও চীনপন্থী কম্যুনিস্টরা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে সবকিছু করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা-ই তাদেরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। তাঁর উদার মানসিকতাই এসবের জন্যে দায়ী। খালেদাকে তিনি মেয়ে বলতেন আর জিয়াকে জামাই। এটা যদি না করতেন তাহলে তারা পরবর্তীতে এরকম ফিগার হতে পারতেন না। বঙ্গবন্ধুর আকুতির কারণে বীরাঙ্গনা খালেদা জিয়া আশ্রয় পেয়েছিলেন সেদিন।

দেশের আজ যে করুণ অবস্থা, সবাই জানে এর জন্যে দায়ী প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু তাদের ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নই। দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দুটো দলই তাদের বিস্তার ঘটাতে পেরেছে। অন্য কোনো দল পারে নাই। এটাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যর্থতা। প্রগতিশীল দলগুলো তাদের

কর্মকাণ্ড শহরের কিছু কিছু ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। তাই জনগণ একটি ৩য় পথ চাইলেও পাচ্ছে না। তখন উঠে আসছে জামাত, স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি। এই কুচক্রী দলটি প্রধান দলগুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার মানে দেশের ভবিষ্যত কোথায় যাচ্ছে ?

মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ও সংখ্যা নিয়ে যে বিভ্রান্তি ও ভুল-চুকের সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে দায়ী সরকারগুলোই। তারা এ কাজের জন্যে আলাদা কোনো ফোর্স নিয়োগ না করে যারা এগুলো করার উপযুক্ত নয় তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে করিয়েছে। তাই দেখা গেছে, এরশাদের আমলে, খালেদার আমলে, মুক্তিবার্তার মাধ্যমে এবং সাম্প্রতিক সময়ে করা তালিকাতেও বড়ো ধরনের গড়মিল থেকে যাচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় হওয়ার আগে ২ মাস অন্তর অন্তর জেলা কমান্ডারদের সম্মেলন হত, সেখানে সবাই যাঁর যাঁর জেলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারত। কিন্তু মন্ত্রণালয় হওয়ার পর সেই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। মন্ত্রণালয় এখন পরিণত হয়েছে যন্ত্রণালয়ে। এখন কেউ খোঁজই নেয় না।

আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের পর যাঁরা (মুক্তিযোদ্ধারা) মারা গেছেন তাঁরা ভাগ্যবান। কেননা, তাঁরা অন্তত নিজেদের অর্জিত পতাকাটা দেখে মরতে পেরেছেন। কিন্তু আমি তো আজ অনিশ্চয়তায় ভুগছি যে শ্মশানে যাবার কালে আমি আমার পতাকাটা দেখতে পাবো কিনা ! কারণ, দেশের ক্ষমতা তো আজ দেশের মানুষের কাছে নেই, রয়েছে যারা এদেশের নয়, এদেশকে নিজের বলে ভাবেনা।

পতাকাটা আছে বলেই আজও আমি নিজের পরিচয় দিতে পারি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। পতাকা না থাকলে তো আমার পরিচয়ই বিপন্ন হবে।

লক্ষ লক্ষ বাঙালি নিধনকারীর হাতে আজ শোভা পায় বাংলার পতাকা। সেই পতাকা কি আমার থাকতে পারে ? কতদিন পারবে আর ?

চৌধুরী মাহবুবুল আলম

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

১৯৭১ সালে অত্র এলাকায় চাক্মা সার্কেলের প্রধান বা রাজা ছিলেন ত্রিদিব রায়। তিনি স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না। ছিলেন স্বাধীনতার বিপক্ষে। তার নির্দেশের কারণে পাহাড়িরা বিশেষ করে চাক্মা সম্প্রদায় মুক্তিযুদ্ধে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে নি। এদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ও বাস্তববাদী ছিলেন তারা স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন। পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মারমা, টিপ্রা রা এক্ষেত্রে

আরো বেশি ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের ভূমিকার মতো সর্বত্রই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য ও কার্যক্রম বিভ্রান্তিকর।

আমার পূর্বে লুৎফর রহমান একটানা ২২ বছর যাবৎ আমার জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। অথচ -'৭১-এ উনি ভারতে পালিয়েছিলেন এবং কোনো যুদ্ধ করেননি। সম্প্রতি তিনি যাচাই-বাছাইয়ের পর ধরা পড়েন এবং অব্যাহতি পান। তেমনিভাবে তৎকালীন সময়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ তো করেইনি বরং বিপক্ষে কাজ করেছে, রাজাকারী করেছে, যুদ্ধ শেষে তারা মুক্তিযোদ্ধা সেজে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে এবং নিচ্ছে। আমার জেলার গেজেটে এমন রয়েছেন কেউ কেউ। তাদের মধ্যে অন্যতম ফরিদ উদ্দিন। উনি তালেবান ফরিদ নামে পরিচিত। আবার এমন কেউ কেউ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। শহীদদের মধ্যে ৪ জন আমার জানা মতে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এখনো সম্পূরক গেজেট ছাপা হয়ে আসে নি। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতাকে পূর্বে অসহায় ভাতা বলা হত। আমি রেজোয়ান চৌধুরীকে এ ব্যাপারে অবহিত করি যে, মুক্তিযোদ্ধাদের অসহায় বলা যাবে না। আর তাই এই ভাতার নাম অসহায় ভাতা হওয়া উচিত নয়। জাতি যদি তাঁদের সম্মান দেয়, তবে এর নাম হওয়া উচিত সম্মানী ভাতা পরবর্তীতে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

পাশাপাশি আমি আরেকটি প্রস্তাব করেছিলাম যে, তৎকালীন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদী তার কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ভাতা নিতে পারে না। কারণ, উনি একজন স্বীকৃত রাজাকার এবং দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে তার অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের ভাতা এই মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করতে চায়। জবাবে রেজোয়ান সাহেব বলেছিলেন- স্বাধীনতার ৩২ বছর পর কে রাজাকার এটা নিয়ে আর বিভেদ থাকা উচিত না। তাদের রাজাকার না বলে স্বাধীনতা-বিরোধী বলা যেতে পারে। তাছাড়া আমি রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে রাজাকার বলতে পারি না। আমি তখন বলেছি– আমি মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল আলমের এক ফোটা রক্ত থাকতে কোনো রাজাকারের সাথে আপোষ করব না। আমি ওদেরকে যতদিন বাঁচি রাজাকারই বলব।

মুক্তিযোদ্ধা এমন কারও কারও নাম রয়েছে যাদের বয়সই হয়ত কাভার করবে না। অর্থাৎ ৩৭ বছর বয়সও তার হয় নাই। অথচ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তারা সুবিধা নিচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছায়ের প্রক্রিয়ায় আমরা বিরোধিতা করেছিলাম যে, বাছাই প্রক্রিয়ায় যেন TNO বা ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব না দেয়া হয়। কারণ, তাঁদের বেশিরভাগই মুক্তিযুদ্ধের সাথে অভিজ্ঞতা-বর্জিত।

ক্যাথিং,
অধ্যক্ষ কক্সবাজার সিটি কলেজ, সাবেক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ

আমাদের এখানে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের মধ্যে যেমন– ওসমান সরওয়ার, আলম, রামু কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোস্তাক আহমদ, আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল– ওনারা সবাই বার্মায় চলে গিয়েছিলেন, মার্চের শেষের দিকে। আর আমরা যারা অমুক্তিযোদ্ধা আমরা যাই আরও পড়ে। ওনারা সবাই ছিলেন রেসকিউ ক্যাম্পে, আমরা ছিলাম মূল ভূখণ্ডে। আমরা এখানে চলে আসি স্বাধীনতার অনেক আগে। কিন্তু বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধারা আসেন স্বাধীনতার পরে, বীর বেশে। এই সুবিধাবাদী চরিত্রের মানুষদের সুবিধা পাওয়াটাই আমার কাছে আপসোস লাগে। তারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধটাকে একটি ব্যবসায়িক বুলিতে পরিণত করেছেন।

আমাদের রাখাইন পল্লীগুলো ছিল মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। আমাদের প্রতিটি ঘরে মুক্তি বাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের যতরকমের সাপোর্ট দেওয়া প্রয়োজন ছিল, সবগুলো আমরা দিয়েছি। আমরা কোনো স্বীকৃতির জন্য তা করিনি। করেছি সচেতনতা থেকে। আমাদের এটাকে কর্তব্য মনে হয়েছিল। কারণ, বৈষম্য-নিপীড়ন যার ওপরেই হোক না কেন এটা মেনে নেয়া যায় না।

যখন এদেশ থেকে হিন্দু পরিবারগুলো পালিয়ে যাচ্ছিল, তারা স্বর্ণের কলসি ভর্তি করে রেখে যেত রাখাইনদের ঘরে ঘরে, সেগুলো মেপে রাখারও সুযোগ ছিল না। যখন স্বাধীনতার পর তারা ফিরে আসে তাদেরকে ঠিক সেভাবেই ওগুলো ফেরত দেওয়া হয়। চুরির অভ্যাস আমাদের রাখাইনদের ভেতর নেই।

আমাদের মধ্যকার অনেকেই নিজেদের প্রকাশ করতে চান না। তারা কোনো ধরনের স্বীকৃতির জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসে এসে ঘোরাঘুরি করেন নি। এমনকি বর্তমান বিভিন্ন ক্ষোভের কারণে তাঁরা অনেক সময় স্বীকারও করেন না যে তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বার্মায় স্থানান্তরিত হয়েছেন।

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমরা আমাদের ভাষায় লেখাপড়া করতে পারতাম। এরপর আর এটা বহাল থাকে নি। এখন যা আছে তা আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এবং তা সরকারি কোনো কাজে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ খুবই জরুরি শিশুদের জন্য।

বাংলাদেশের সৃষ্টি ভাষাভিত্তিক আন্দোলন থেকে। এটাই পরবর্তীতে একটি দেশের জন্ম দেয়। সেই দেশে সকল ভাষার মর্যাদা স্থাপন করা দরকার। সেটা যে কোনো জাতিগোষ্ঠীর ভাষাই হোক। আমরা রাখাইনরা এই এলাকার এখনো

বাসিন্দা, অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কখনো লেখাপড়া করতে পারছি না।

আমার মা পাকিস্তান আমলে যখন পাসপোর্ট করতে যান তখন সেখানে রাখাইন ভাষায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা হত। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে এটা গ্রহণ করা হয় না। আর আমার মা এবং তার মতো অধিকাংশ মা এই ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় লিখতে জানেন না। তাদেরকে এখন টিপসই দিয়ে কাজ চালাতে হয়। এটা আমাদেরকে অবমূল্যায়ন করার শামিল। এমনকি বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে আদিবাসী বলে স্বীকৃতি তো দেয় নি, এমনকি উপজাতিও বলে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে তারা বলেন, এদেশে কোনো আদিবাসী নাই।

আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হোক, তাহলে আমরা দেশ গঠনে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে পারব। আমরা এই দেশকে অন্য দেশ বা পরের দেশ হিসেবে কখনোই ভাবতে পারিনা। কারণ আমার পূর্ব পুরুষদের জন্ম এখানে, আমার জন্ম এখানে। এখানেই আমার নাড়ি পোঁতা। সেই দেশ আমাকে স্বীকৃতি দেয় না। সেই দেশকে আমি কি দিতে পারব না, দেশ যদি আমাকে তার অদিবাসীর অধিকারও না দেয় ?

মংরীপ্রু
ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, মহেশখালী দ্বীপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাখাইনদের ভূমিকা যে নেই তা বলা যাবে না। মহেশখালী দ্বীপের যে ছোটো রাখাইন পাড়া, সেখানেই প্রথম পাকিস্তানিরা ক্যাং-এ আগুন লাগিয়ে দেয়। তবে এটা পাকিস্তানিরা ইচ্ছা করে লাগায় নি। রাজাকারের ইন্ধনে তা সম্ভব হয়েছিল। এবং এটা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত আলোচিত হয়। ফলে, স্বাধীন হওয়ার আগেই পাকিস্তান এর ক্ষতিপূরণ দেয়। পুরোপুরি না হলেও তা যথেষ্ট ছিল। পাকিস্তানিরা প্রথমে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রাজাকাররা তাদের আবার নিয়ে এসে এই ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কিন্তু সেই রাজাকাররাই আবার দেশের কর্ণধার হতে পেরেছে। শেখ মুজিব তাদের সাধারণ ক্ষমাটা করেই ভুল করেছে, এবং আমার মনে হয় সেই অভিশাপেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

তবে এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দুরা। তাদের সবই চলে গিয়েছিল এই যুদ্ধে। কিন্তু তারা তাদের মেধা ও পরিশ্রমের কারণে আবার সেই উন্নত অবস্থায় উঠে আসতে পেরেছে। এখন বাংলাদেশে যেসব হিন্দু আছেন, তারা বেশিরভাগই বেশ ভালো আছেন অন্যদের থেকে, রাখাইনরা এটা পারত না। যুদ্ধের সময় বেশিরভাগ রাখাইন বার্মায় চলে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই আবার যুদ্ধ শেষে ফিরে এসেছে। এখনো যে কোনো কিছু উপলক্ষেই বার্মা রাখাইনদের

বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও নির্ভরতায় আশ্বাস দিয়ে বার্মাতে চলে যেতে বলে। ব্রিটিশ আমলেই রাখাইনরা সবচেয়ে বেশি স্থানান্তরিত হয়। পরে পাকিস্তান আমলেও হয় এবং বাংলাদেশ আমলেও হয়েছে-হচ্ছে।

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে ও রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে ওখানে গেলে ওরা আমাদের চলে যেতে বলে ওদের দেশে। কিন্তু আমরা এদেশকে ভালোবাসি এ দেশে রয়েছি।

(সুকল) রতন বড়ুয়া

ডেপুটি জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসীদেরকে তেমন বিশ্বাসও করা হত না। যারা ইপিআর-এ ছিলেন তাদেরকেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত এবং ছোটো ছোটো কাজকর্মে নিয়োজিত করা হত।

আদিবাসীদের অনেকে বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। কারণ, পাকিস্তানিরাও তাদের শোষণ করত এবং বাঙালিরাও করত। তাই যারা ভাবত দেশ স্বাধীন হলে এসব বন্ধ হবে, তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

যারা অস্ত্র হাতে নেয় একবার, তারা অস্ত্র ধরার পর অস্বাভাবিক হয়ে যায়। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কোনো কিছু মানতে ইচ্ছে হয় না। দেশে এখন অনেক উল্টো কাজ হচ্ছে– তাই আমরা আমাদের কড়া মেজাজ নিয়ে বসে বসে চুল ছিঁড়ি। সাংগঠনিক বা বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে কোনো পথ বের করার কথা ভাবতে পারি না।

তথ্যসূত্র

১. India Wins Freedom : Moulana Abul Kalam Azad, Calcutta
২. পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭
৩. A Tale of Millitans : Major (Rtd.) Rafiqul Islam. Dhaka, 1974
৪. রাষ্ট্রের মালিকানা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭
৫. The Liberation of Bangladesh : Major Gn. Khusawant Singh.
৬. নানকার বিদ্রোহ (তৃতীয় খণ্ড) : অজয় ভট্টাচার্য, ঢাকা, ১৯৭৩
৭. জীবন সংগ্রাম : মণি সিংহ, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০০৩
৮. রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন : ধনঞ্জয় রায়, ১৯৮৬
৯. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা : প্রদীপ্ত খীসা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬
১০. মুক্তিযুদ্ধে আমরা : সম্পাদনা–সুনীল পেরেরা ও অন্যান্য, প্রতিবেশি প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫
১১. বাংলাদেশে বিপন্ন আদিবাস : সঞ্জীব দ্রং, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ২০০১
১২. মং রাজার মুক্তিযুদ্ধ : লে.ক. এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা
১৩. Santal Rebellion: Tarapada Ray, Subarra Yellha, 1988
১৪. মৈরা, এ কে সেরাম সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধ উদযাপন স্মরণিকা, সিলেট ১৯৯৬
১৫. আদিম, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন প্রকাশিত বুলেটিন, সিলেট ১৯৯৮
১৬. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ঢাকা ১৯৯৭
১৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ; তৃতীয়, একাদশ ও পঞ্চদশ খণ্ড, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮২
১৮. স্মৃতি জাগরুক : বিরিশিরি আদিবাসী কালচারাল একাডেমী, নেত্রকোনা
১৯. মুক্তিযুদ্ধে আমরা : খৃষ্টানদের অবদান : আমাদের ইতিহাস প্রকল্প, ঢাকা
২০. মুক্তি-সংগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ : আদিবাসী প্রপঞ্চ (সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ) : অধ্যাপক গনেশ সরেন
২১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজঃ রনজিত সিংহ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
২২. আবহমান বাংলা : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯৩
২৩. আরেক বাংলাদেশ : আতিউর রহমান, প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

২৪. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার মূলভিত্তি: খুরশীদ আলম সাগর, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪
২৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস : সুগত চাকমা
২৬. হাজার বছরের চট্টগ্রাম : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দৈনিক আজাদী-র ৩৫ বৎসর পূর্তি বিশেষ সংকলন, ১৯৯৫
২৭. The Politics of Nationalism/The Case of the Chittagong Hill Tracts/Bangladesh, UPL, Dhaka.
২৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৩০ এপ্রিল ১৯৯৬ পর্যন্ত সংশোধিত
২৯. The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold Story, Mijanur Rahman Selley, Center for Development Research, Bangladesh, 1999.
৩০. আহা পর্বত ! আহা চট্টগ্রাম !!: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক, অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭
৩১. Tribal Freedom Fighter of India: A R N Srivastava; Publication Division, MIB, Govt of India, 1999
৩২. জাতীয়তাবাদ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, ড. হাসান মোহাম্মদ, ২০০১
৩৩. The World Book Encyclopedia, Vol. 14, 1998
৩৪. নৃবিজ্ঞান, সৈয়দ আলী নকী মুহম্মদ হাবিবুর রহমান
৩৫. Anthropology, E. A. Hobel
৩৬. নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ, মানস চৌধুরী ও রেহনুমা আহমেদ
৩৭. Changing society in India, Pakistan and Bangladesh, Dr. A. K. Nazmul Karim, 1996
৩৮. বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, রামকান্ত সিংহ, ২০০১
৩৯. Essays on Nationalism, J. H. Hayes, 1926
৪০. অরণ্য জনপদে, আব্দুস সাত্তার
৪১. বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি, ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, ১৯৯১
৪২. ভাষা বনাম জাতিসত্তা, আবদুল মান্নান তালিব, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংকলন, ভাষা দিবস সংখ্যা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ
৪৩. নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪
৪৪. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ : অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট, আহম্মেদ মুসা সম্পাদিত
৪৫. বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার
৪৬. সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, রজনীকান্ত গুপ্ত, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২
৪৭. বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত
৪৮. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, বুকওয়ার্ল্ড, ১৯৯৬
